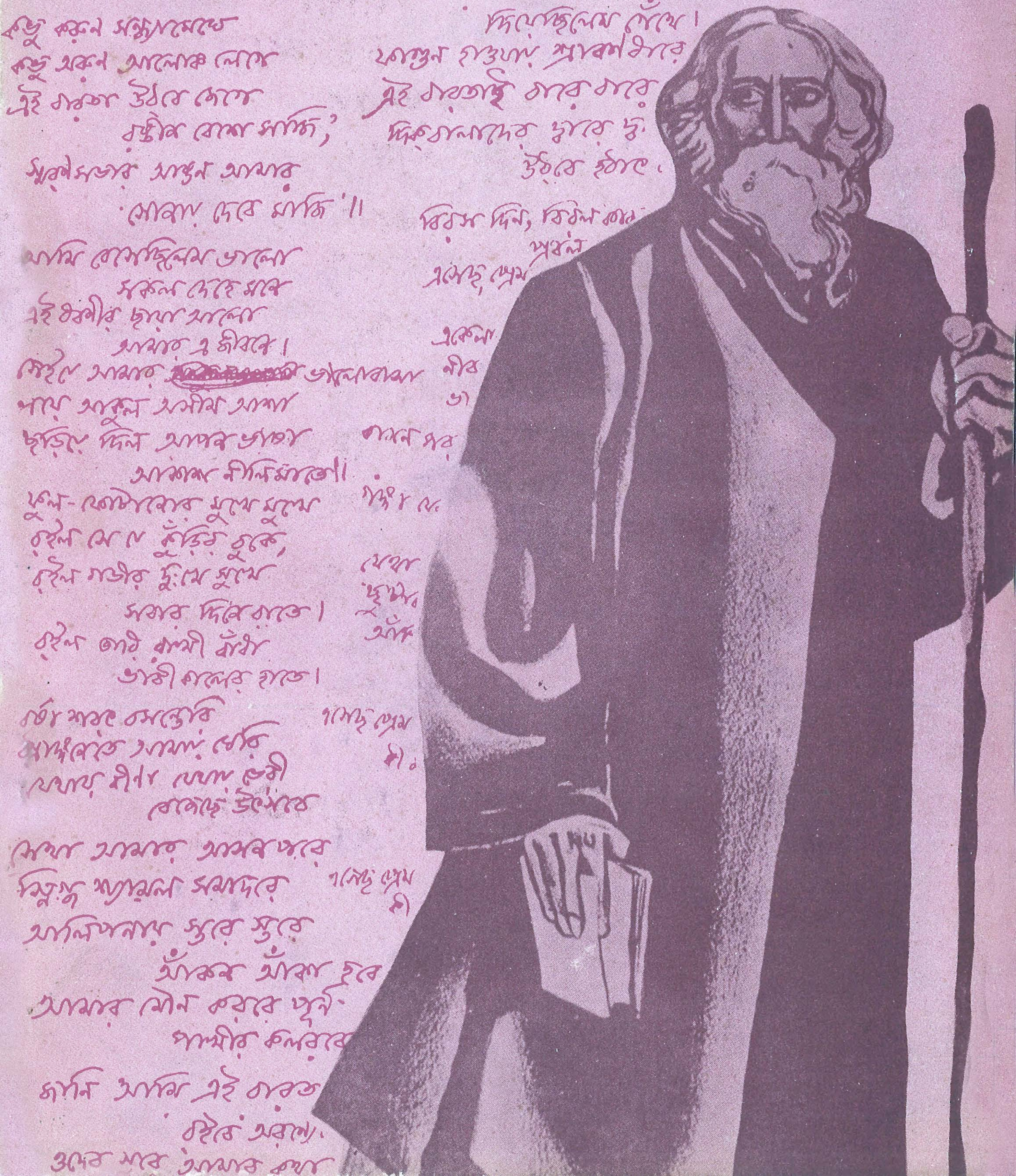
পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৭





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ বিজয় বাসফোর

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমার স্মৃতি থাকুক গাঁথা
আমার গীতিমাঝে।
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলি-তলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঢুলে ঢলে
আলো-কিরণমালী।
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের ছলে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়া
ভরে রূপের ডালি।।

২৫ বৈশাখ
১৩৩৩
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২৩ ॥ সংখ্যা ৪২ ও ৪৩ ॥
৪ ও ১১ মে ১৯৯০ ॥
২০ ও ২৭ বৈশাখ ১৩৯৭

বিজনেস ম্যানেজার

বিপুল চৌধুরী
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৮-৪৫৫৮

এই সংখ্যার দাম ৪ টাকা



বিষয়সূচি

প্রচ্ছদ	ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ জি পোপলাভস্কি। লিথোগ্রাফ, ১৯৮৫
চতুর্থ প্রচ্ছদ	ঃ রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯। অতুল বসু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	ঃ প্রতাপ সিংহ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি, ছবি, আত্ম-প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, অশোক ঘোষ, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার বাগচী ও সুবিমল লাহিড়ির সৌজন্যে

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিভবে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ।
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাস পাশায়;
নাইবা হোল নানা ভাষায়
আহা, উহু, ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ॥

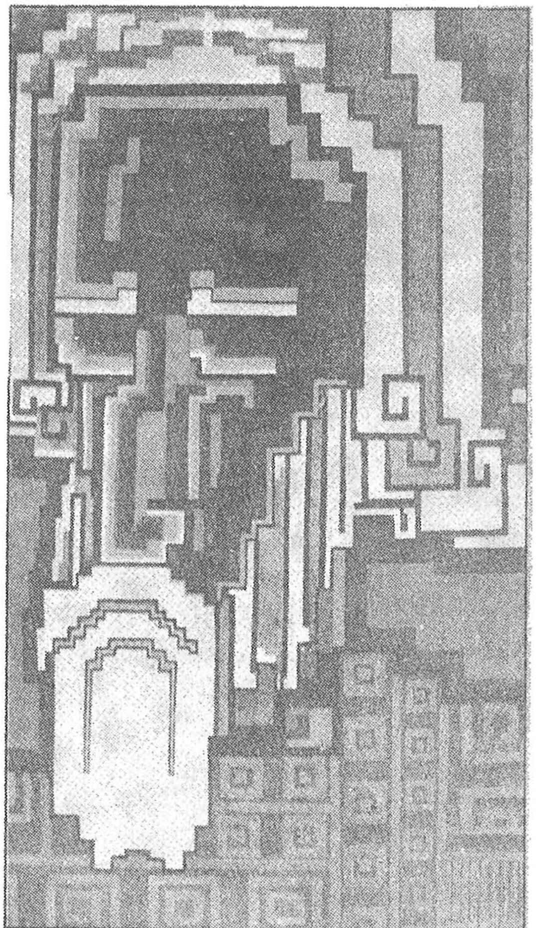
আমি জানি মনে মনে, —
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।



মাতৃভাষা-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুদিরাম দাস

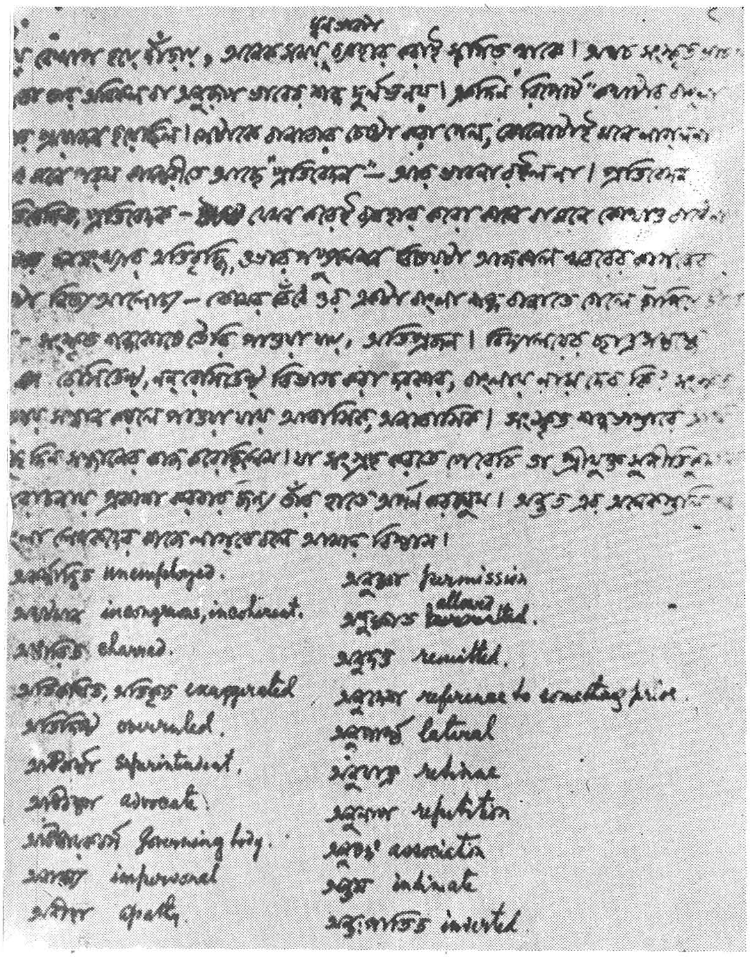
মানুষের ভাষা স্থিতিশীল জড়ধর্মী নয়, নদীর প্রবাহের মতই অথবা মানুষের জীবনধারার মতই গতিশীল, সদাচঞ্চল। নদীর সঙ্গে পার্থক্য এই যে ভাষাপ্রবাহের আদি-অন্ত চিহ্নিত করা যায় না। মানুষের আদিতম অবস্থায় পরস্পর-বোধ্য ধ্বনি-সংকেত দিয়ে হয়ত বা এর প্রারম্ভ (সংস্কৃত বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার ধাতু ও প্রত্যয় স্মরণীয়), কিন্তু এর অন্ত্যতম, এমনকি বর্তমানের পরবর্তী অবস্থাও অনির্ণেয়। কারণ, এতে যোগ বিয়োগ প্রভাব মিশ্রণ প্রভৃতি ঘটছে অহরহ এবং আমাদের লক্ষ্যের অগোচরেই। বেশ কিছুকাল কেটে না গেলে সাময়িকভাবে স্থায়ী ঐ সব পরিবর্তন শ্রোতা ও দ্রষ্টার কাছে ধরা দেয় না। ভাষাবিষয়ক আলোচনার একটা দিক হল তা যেমনটি আছে বা সেকালে যেভাবে চলছে তার প্রকৃতি নির্ধারণ। বলা যেতে পারে, তাৎকালিক ভাষার রূপচর্চা বা অবয়বের বিশ্লেষণ। নদীর উপমা ধরে বলা যায়, প্রবাহের স্রোত-পথ, বাঁক নেওয়া, আবর্তসৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্য করা এবং লক্ষ্য ক'রে একটা নিয়মনীতি উপস্থাপিত করা, যাতে বক্তা ও লেখক উল্টো-পাল্টা ও ভুলভাল না করে। কারণ, ভাষায় যথেচ্ছাচার ঘটলে লোকযাত্রা বিঘ্নিত হয়। বলা যায়, এটি ভাষার পরিচিতি ও ব্যাকরণের দিক। এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। কিন্তু ভাষার অন্য একটি দিকও আছে। কৌতূহলী ব্যক্তি কেবল রূপচর্চা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তিনি ভাষার প্রচলিত রূপগুলো কীভাবে এল, তার আগেকার অধ্যায়ে কী ছিল, কী ছিল তারও আদিতে—এসব ইতিবৃত্তের সন্ধানে শ্রম নিয়োগ করেন। এটি হ'ল মৌল তত্ত্বের দিক, ভাষার বিবর্তনের অধ্যয়ন। এরই ফলে সংস্কৃতের সঙ্গে ইরানীয় তথা ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির বিস্ময়কর সগোত্রতা নির্ণীত হয়েছে। আমাদের ব্যাকরণে রূপচর্চার দিকটাই যদিচ বেশী প্রয়োজনীয়, তবু স্থানবিশেষে ঐতিহাসিক বোধ চলিত বাস্তবের বোধকে আরও পরিপুষ্ট ও সঠিক করতে পারে, এই কারণে বাস্তব স্বরূপের বিশ্লেষণেও স্থানে স্থানে ইতিহাস-অনুগত ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন বলা যায়, কোনো উৎসুক ব্যক্তি বলতে পারেন যে, ক্রিয়াপদে পুরুষবাচক পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তি থাকাই সঠিক এবং সেই অনুসারে নিয়ম পাচ্ছি—সামান্য বর্তমানে করি, কর, করে; অনুজ্ঞায় করি, করো, করুক; সামান্য অতীতে করিলাম, করিলে করিল; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভবিষ্যতে কেন এর ব্যতিক্রম? কেন করিব, করিবে, করিবে? তখন এর আগেকার রূপে যেতেই হয় এবং দেখাতে হয় যে কিছুকাল আগেও ছিল করিব, করিবা-করিবে এবং করিবেক। দ্রুতগামী এবং সহজিয়া কলকাতার ভাষা এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। প্রয়োজনে আরও পিছনে যেতে হবে এবং দেখাতে হবে যে অতীত-বোধক এবং ভবিষ্যৎ-বোধক ইল্ল-অল্ল এবং ইব্ব-অব্ব প্রত্যয়জাত ক্রিয়াগুলি বাঙলা ভাষার প্রারম্ভে কর্মবাচ্যের ও বিশেষণধর্মী ছিল। যার ফলে তিন পুরুষেই রূপ ছিল করিল-করল এবং করিব-করব। লোকভাষা নিজ প্রয়োজনবশে আপনা থেকেই পুরুষগত পার্থক্য চিহ্নিত করে নিয়েছে। করিলেক করিবেক প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি নয়, কোনো বৈয়াকরণেরও নয়, তা লোকমুখে সৃষ্ট। কালক্রমে যদি অতীত ও ভবিষ্যতের দুই পুরুষে ক্রিয়ারূপের



রবীন্দ্রনাথ : সুভো ঠাকুর

একীকরণ হয়ে পড়ে এবং তাতেও যদি অর্থবোধের বাধা না ঘটে তাহলে আপাতত তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যেমনটা হচ্ছে সংবাদপাত্রিকদের শৈথিল্যে করলে, দিলে, পেলে (প্রভৃতি সকর্মক) এবং গেল, চলল, নাচ্‌ল (প্রভৃতি অকর্মক) ক্রিয়ারূপের একীকরণে। বর্তমানের পরিস্থিতি ঠিকমত বোঝাতে গেলে কখনো-সখনো ইতিবৃত্তে যাওয়া আবশ্যক হতেই পারে। আবার, কোনো প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন টলটল এবং টলমল, চকচক এবং চকমক, খিটখিট এবং খিটমিট এসব ক্ষেত্রে শব্দের দ্বিত্বকরণে মাত্র একটি ব্যঞ্জনের রূপান্তরে অর্থের পরিবর্তন কেমন করে সম্ভবপর হল, কেমন করে চটপট এবং ঝটপট এই দুই প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার চলে, ঝকঝক এবং ঝরঝর-এ একটা ব্যঞ্জন বদল করে নিতেই মানে একেবারে উল্টো হয়ে গেল—তখন তাঁকে একথা বোঝাতেই হয় যে ঐগুলি দুই শব্দের যোগও নয়, আর আমাদের সৃষ্টিও নয়। এগুলি

বাঙালীর জন্মলগ্ন থেকে অনার্য অর্থাৎ কোলমুণ্ডা-সূত্রে গোটাগুটি পাওয়া শব্দ, আমরা মিলিয়ে জোড়া গাঁথিনি। ঐগুলি এবং ঐরকম হাজার অনুকার-জাতীয় শব্দ কোল-মুণ্ডাদের ব্যবহারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের দ্যোতনা করত এবং হয়ত বা তাদের আদিম ব্যবহারের অধ্যায়ে ঐগুলি খাঁটি জোড়-শব্দ এবং ধ্বনিবাহিত অর্থবোধকই ছিল, কিন্তু আজ আর তা ধরবার কোনো পথই নেই। সুতরাং যাবতীয় ব্যাকরণেরও মূলে রয়েছে গতিশীল ভাষার একটা ইতিবৃত্ত। ঐসব বিচিত্র ভাববহ ধ্বনি-শব্দগুলি আমাদের অনার্য জন্মসূত্রে আমরা সরাসরি পেয়ে গেছি এবং আমাদের রূপান্তরিত করে নেওয়ার অনুকরণাত্মক প্রয়াস দু'চারটে ক্ষেত্রে লক্ষণীয়



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংগ্রহভুক্ত

হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নয়। সুতরাং ব্যাকরণ-নির্মাণে আমরা প্রচলিত রূপটারই চর্চা করব, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে সঞ্চরণও আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠবে। উদারণে প্রকৃতিতে, প্রত্যয়ে, বিভক্তিতে যেসব অসামঞ্জস্য বাইরে দেখা যায়, মর্ম অনুসন্ধানে তার সুসমাধান পাওয়ারই সম্ভাবনা। এই কারণে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতকুমারই আজ পর্যন্ত বাঙ্লা ব্যাকরণের সব থেকে উল্লেখ্য রচয়িতা এমন মনে করা যায়, যদিচ একথাও ঠিক যে নোতুনতর অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতার অবসরও এরই মধ্যে ঘটে চলেছে।

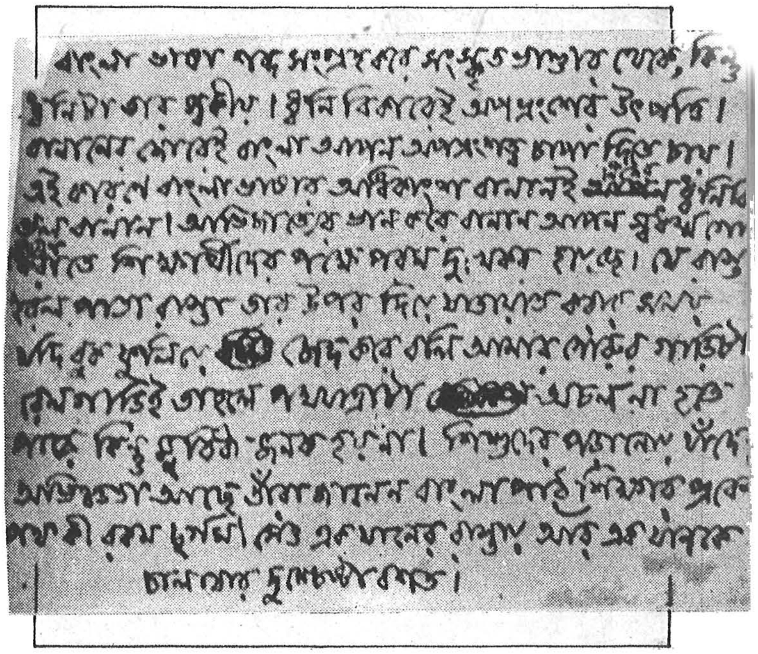
শব্দাসক্তি কবিচরিত্রের সাধারণ ব্যাপার। অনুমান করা যেতে পারে যে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার সময় থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই ব্রজবুলির সুমধুর অথচ আধা-স্পষ্ট শব্দগুলির উপর কবির আসক্তি ঘটে। পরে যখন তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগীতায় পদরত্নাবলী নামে বৈষ্ণব পদ-সংকলন প্রকাশ করেন (১৮৮৫) তখন ব্রজবুলিতে তথা মধ্যযুগের অন্যান্য কবিতায় প্রযুক্ত কয়েকটি শব্দের অর্থ ও উদ্ভব বিষয়ে সমুৎসুক হন। এদিকে প্রথম বিলাতযাত্রার সময় থেকে ইংরেজি ও বাঙ্লার উচ্চারণের সঙ্গে লিখনের ও বানানের পার্থক্য তাঁকে প্রশ্নাকুল করে তোলে। এইভাবে ক্রমে লৌকিক বা চলিত বাঙ্লার ধ্বনি, উচ্চারণ, শব্দাবলী ও প্রত্যয় প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সংস্কৃতরীতি থেকে পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসব বিষয়ে তাঁকে গভীর চিন্তায় নিয়োজিত করে, যার ফল সাধনা পত্রিকায় স্বরব্যঞ্জনের উচ্চারণ ও শব্দের রূপতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা (খ্রীঃ ১৮৯২ থেকে)। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি সেখানকার সভায় এসব বিষয়ে বেশ কয়েকটি ভাষণও দেন, যেগুলি পরে শব্দতত্ত্ব নামক পুস্তিকায় গ্রথিত হয়ে প্রকাশ পায়। এ কালের এই সব অধ্যয়ন মনে রেখে এবং তার উপর সংগৃহীত আরও কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি শেষ বয়সে লেখেন 'বাঙ্লা ভাষা পরিচয়' নামে একটি অসামান্য পুস্তিকা। যে মনস্তত্ত্ব কবিকে লৌকিক অর্থাৎ অ-সংস্কৃত বাঙ্লার ব্যাকরণ ও স্টাইলের দিকে আকর্ষণ করে তা হ'ল লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির যাবতীয় সম্পদ সমাহরণ করে লৌকিক বাঙ্লার স্বকীয় রীতির মধ্যে উক্ত অভিজাত সম্পদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশই তাঁর সাহিত্যিক কৃতীত্ব। তাঁর বাঙলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত উপাদান প্রত্যক্ষ করা গেলেও লৌকিক ভাষারীতিকে তিনি কুত্রাপি-লঙ্ঘন করেন নি এবং সেই কারণে অন্তত ভাষার দিক দিয়ে তিনি কুত্রাপি দুর্বোধ্য নন। আর এও লক্ষণীয় যে কৃষক ও বাউল-সংসর্গের অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে পরিণামী কবি-মনীষীর অন্তর্জীবন সাধারণ জনের অভিমুখেই এগিয়েছে। সুতরাং বাঙ্লা ভাষার শিল্পীকরণে সংস্কৃতের সহায়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেও কবি লৌকিক বাঙ্লার শক্তিসামর্থ্য সংরক্ষণে আগ্রহী হয়েছেন।

শব্দতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাগুলিতে দেখা যায়, লৌকিক বাঙ্লায় লেখা পদাবলীতে ও কবিতায়, ঘরোয়া ভাষায় অন্তরঙ্গ আলাপে আমরা যে সব স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি ও শব্দ ব্যবহার করি তার নিরূপক ব্যাকরণ তখনও লেখা হয়নি। তিনি স্পষ্টভাবেই জানালেন যে বহু স্বর-ব্যঞ্জনের সংস্কৃত থেকে পৃথক্ উচ্চারণ বাংলার মৌল চারিত্র্য। বহু শব্দের গঠন ও প্রয়োগভঙ্গি বাঙ্লার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বললেন—"প্রকৃত বাঙ্লা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙ্লা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।" অন্য আর এক স্থানেও জোর দিয়ে বললেন—"কেবল তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ যাঁরা বাঙ্লা ব্যাকরণকে সংস্কৃতের সগোত্র ব'লে মনে করেন) এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্লা ভাষা বাঙ্লা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা শাসিত নহে।" রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পূর্বে যা লিখে গেছেন তার মূল্য আজকের দিনে আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি এবং সেইসঙ্গে মনে করি যে বাঙ্লায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ শতকরা চল্লিশ ভাগও হয় কিনা সন্দেহ। কতকগুলি ধাতু, প্রত্যয়, শব্দনির্মাণ, ণত্ব-ষত্ব এবং সমাসবন্ধনের মধ্যেই তা পর্যাপ্ত। কারকে বিভক্তিতে, বচনে, লিঙ্গ নির্মাণে, অব্যয়াদির ব্যবহারে নূতনতর প্রত্যয় ও উপসর্গাদির ব্যবহারে এবং সর্বোপরি বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্যে বাঙ্লা তথা হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে বহু আগে থেকেই। এর কারণ নিঃসন্দেহে এই যে মূল ভারতবাসীরা অনার্যগোত্রের মানুষ। আর্যদের রাষ্ট্রিক বিজয়ের সঙ্গে ভাষাবিজয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুসিদ্ধান্তরূপে ঘটলেও উত্তরভারতের মানুষের ভাষাভঙ্গিমায় ও সাংস্কৃতিক আচরণে কোল-মুণ্ডা সংস্কার বহুল পরিমাণে থেকেই গেছে, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীদের মধ্যে সংস্কৃতের কমবেশী প্রভাব সংলগ্ন হয়েছে মাত্র। উত্তরভারতে মূল আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের

মিশ্রণে যাঁরা আর্যগোত্রের হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যিক কীর্তি অবশ্য বিস্ময়কর এবং ভারতবর্ষকে তা অসামান্য গৌরবের অধিকারী করেছে, আর বাঙলা হিন্দী প্রভৃতির ভিত-কাঠামোয় সংস্কৃত-বাক্ এর মৌলতা অবশ্য স্বীকার্য হলেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে পরভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বলশালী হলেও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মানস-প্রকৃতিতে ও দৈহিক সজ্জায় তার অনার্যতা এখনও বেশ ভালোভাবেই পরিস্ফুট রয়েছে। বস্তুতঃ বাঙলা-হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা প্রচুর অনার্য সম্পদ বহন করেই আত্মপরিচয় ঘোষণা ক'রে চলেছে, স্বগোত্রতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়নি।

বাঙলা ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের গ্রন্থে আমরা সংস্কৃত ভাষারীতির বিশ্লেষণ যে-পরিমাণে পেয়ে থাকি সে-পরিমাণ স্বকীয় ভাষাগোত্রের পরিচয় যে পাই না তার কারণ, ঐ কোল-মুণ্ডা গোত্রের বহুশাখায়িত আদিম ভাষাগুলির কোনো লিখিত অথবা সংরক্ষিত উপাদান নেই, আর, দ্বিতীয় কারণ, এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমাদের প্রবল ঔদাসীন্য। মানুষ তার সাধারণ স্বভাবে রক্ষণশীল, এমন কি শিক্ষিতেরাও নূতন কোনো ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। নতুবা কোল-মুণ্ডাদের অধুনা প্রচলিত ভাষার পরিচয় স্মরণীয় মিশনারি সাহেবদের উদ্যোগে ও আয়াসে, অভিধান ব্যাকরণ অনুবাদ প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে পরিস্ফুট হলেও আমরা ও-বিষয়ে আগ্রহশীল হইনি। কারণ, যে-যে বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাঙলা ব্যাকরণের ভিন্নতা, সেগুলির মূল অনুসন্ধান করতে গেলেই কোল-মুণ্ডা শাখার ভাষাগুলির দিকে নজর দিতেই হয়। তার অভাবে যা ঘটেছে ও ঘটছে তা হ'ল কাল্পনিকভাবে দেশজ শব্দ ও প্রত্যয়াদির সংস্কৃতমূল নির্ধারণের প্রয়াস। এর হাস্যকরতা বর্তমানে আমাদের কাছে অল্পস্বল্প পরিস্ফুট হচ্ছে বটে, কিন্তু কোলমুণ্ডারী ভাষাগুলির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের অভাবে ঠিকমত কৃতকার্য হওয়া যাচ্ছে না। সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে ভাষার বিভিন্ন দিকে বাঙলার মৌলিকতার দিকটি ধরিয়ে দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ করার জন্য তাত্ত্বিকদের কাছে আবেদন জানালেন। এর মর্যাদা রক্ষা করতে এখনও আমরা সচেষ্ট হলাম না। এখনও আমাদের রক্ষণশীল মস্তিষ্ক খাঁটি বাঙলা অর্থাৎ অনার্যমূল শব্দ প্রত্যয় বাগভঙ্গিমাগুলিকে টেনেবুনে সংস্কৃতের সঙ্গে আবদ্ধ করাতেই নিয়োজিত থাকছে। এর প্রতিকার না হলে বাঙলা ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ আমরা পাব না। ভুল ধারণা নিয়েই তৃপ্ত থাকব। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমারের মত স্মরণীয় ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যদিচ বাঙলায় মৌল সংস্কৃতির অধিকারের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট অনার্য অধিকারের বিষয়টিও অনুমান করলেন, তবু অনেক কিছুই যে তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল না তার কারণও বোধহয় ঐ একটাই, কোলমুণ্ডা ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের অভাব। তবু একমাত্র তিনিই নানাক্ষেত্রে এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে গেছেন, ভূমিকা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন। প্রত্যন্ত পূর্ব-উত্তরবঙ্গে কিরাত অর্থাৎ ভোট-বর্মী ভাষায় প্রভাবের বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়াও তাঁর উল্লেখ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরই পরিচয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে [illegible]টি আজও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা[illegible]নের ডিগ্রি নিয়ে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন তাঁরা আজও রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের প্রারম্ভ সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হচ্ছেন না। বাঙলা মৌলভাবে সংস্কৃতজাত হলেও সর্বাঙ্গে নয়, এতে অনার্যমিশ্রণ যেমন যথেষ্ট তেমনি রাষ্ট্রপরিবর্তনের সূত্রে আরবী-ফারসী, পোর্তুগীজ-ইংরেজি প্রভৃতির উপাদানও কিছু রয়েছে। আর আমাদের আধুনিক গদ্যরচনায় বিশেষভাবে ইংরেজি বাগভঙ্গিমার প্রভাবও সুস্পষ্ট। এসব দিক মনে রেখে বাঙলা ব্যাকরণকে কেবল সংস্কৃতের নিয়মের অধীন দেখলেই চলবে না। ভাষা-বিমিশ্রণের ফলাফলের দিকটিও সমভাবে বিচার্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের একাধিকবারের বক্তব্যে ও ভাষাচিত্র গ্রন্থনে বাঙলার মৌলিকতার অনুকূলেরই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হয়েছে। এখন বাঙলা ব্যাকরণের মুখ্য যে ক'টি বৈশিষ্ট্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

শব্দতত্ত্বের প্রথম নিবন্ধে তিনি দেখালেন যে ইংরেজির মতই বাঙলায় আমরা যা উচ্চারণ করি, বানানে সর্বত্র তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙলার 'অ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃত থেকে ভিন্ন তাছাড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই, বিশেষে ই, উ বা য-ফলা পরে থাকলে এই 'অ' উচ্চারণে 'ও'-এর মত হয়ে দাঁড়ায়। শব্দান্তেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অ 'ও'-এর দিকে টান রাখে। অথচ অভাব-বোধক আদি 'অ' কোনো কারণেই ও-এর মূর্তি নেয় না। এক্ষেত্রে প্রবলতর অর্থ-সংস্কার উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তিনি আরও অনুভব করেছেন যে বাঙলা উচ্চারণে ই এবং উ এই দুটি স্বরের প্রতাপ এত বেশী যে পরবর্তী অ, আ-কেও বদলে দিতে সক্ষম। অন্য একটি নিবন্ধে তিনি দেখালেন যে বাঙলা বানানের আদ্যক্ষরে 'এ' থাকলে তার উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রেই 'এ্যা' হয়ে পড়ে। যেমন, এ্যাক, এ্যাখন। আধা-ও এর মত এই এ্যাও বাঙলায় ব্যবহৃত নোতুন স্বর।


বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু [illegible]
[illegible] তার [illegible]। ধ্বনি বিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি।
বানানের জোরেই বাংলা [illegible] চাপা দিতে চায়।
এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই [illegible]
[illegible] বানান। [illegible] বানান [illegible]
[illegible] শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরম দুঃখকর হচ্ছে। [illegible]
[illegible] তার উপর দিয়ে যাতায়াত [illegible]
যদি বুক ফুলিয়ে [illegible] জেদ করে বলি আমার [illegible]
[illegible] তাহলে পথযাত্রী [illegible] অচল না হয়ে
পারে কিন্তু [illegible] হয় না। শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের
অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা [illegible] শিক্ষার প্রবেশ
পথে কী রকম [illegible] এক ধারের [illegible] আর এক ধারকে
[illegible]

এমনতর ব্যাপার কী ক'রে হচ্ছে পরবর্তী সময়ে আচার্য সুনীতিকুমার তার সমাধান ক'রে দিয়েছেন। শব্দতত্ত্ব পুস্তকের এক অধ্যায়ে বাঙলা বহুবচন নিয়ে আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বী হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির সঙ্গে বাঙলা সম্বন্ধের বিভক্তির তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে সম্বন্ধ পদের 'র' বিভক্তির সঙ্গে বহুবচনের 'রা'-এর যোগ রয়েছে। এছাড়া বাঙলায় বহুবচনে রা-যুক্ত 'সব' ও রা-হীন 'সব' শব্দের ব্যবহার ও তার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন। কবি-প্রদর্শিত তুলনামূলক বিষয়টি অবশ্য পরিশুদ্ধ আকারে সুনীতিকুমারের আলোচনায় একটি সামগ্রিক রূপ নিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথমে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামে 'রা' আশ্রয় পেয়েছে, পরে মানুষ থেকে ইতর প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু তরুলতা পর্যন্ত এগোয় নি। আর সম্বন্ধ থেকে ক্রমে বহুবচনে যাওয়ার মূলে এর দুর্বলতা থাকায় এর সঙ্গে বহুত্বজ্ঞাপক 'সব' শব্দের যোগও প্রথমের দিকে প্রয়োজনীয় হয়েছে। বাঙলার সম্বন্ধ কারকে এর, র বিভক্তি ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে—'কার' শব্দাংশের প্রয়োগ লক্ষ্য ক'রেও রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধ লিখেছেন। সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি পড়েছে [illegible] হিসাবে সংস্কৃত থেকে বাঙলায় মৌলিকতার উপর।

বাঙ্ ১২৯৯ সালে 'সাধনা' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় মনীষী কবি বাঙলায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ও ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক আলোচনা করেন। স্বকীয় অনুসন্ধান, তালিকা প্রণয়ন ও সামান্য ইতরবিশেষের কারণে একই রকমের শব্দের ভাবগত পার্থক্যের বিষয়ে তিনিই প্রথম আমাদের চক্ষুরুন্মীলন ঘটান। ঐ সব শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতময়তার ব্যাপারটি তাঁকে বিস্ময়ের সঙ্গে আকর্ষণ করেছে দেখতে পাই। এইসব দ্বৈতের শব্দাবলীকে তিনি বিভিন্ন কোঠায় ভাগ করে সেগুলির বাচকতার ভিন্ন ভিন্ন দিক ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমন—বারে বারে, পরে পরে, কথায় কথায় প্রভৃতির পুনরাবৃত্তিবাচকতা; মুখে মুখে, চোখে চোখে প্রভৃতির পারস্পরিকতা; মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে প্রভৃতির নিয়ত-সংলগ্নতা; লম্বা লম্বা, নূতন নূতন প্রভৃতি বিশেষণের ক্ষেত্রে ভাগ-ভাগ করা বহুলতা; জ্বর জ্বর, শীত শীত, মেঘ মেঘ, যাব যাব প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বল্পতা, মৃদুতা, দ্বিধা প্রভৃতি; আবার কেঁদেকেটে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, বকেঝকে, চাষাভুসো, খাবার-দাবার, ছুতো-নাতা ইত্যাদির দ্বিতীয়াংশের নিরর্থকতার সঙ্গে প্রথমটির মিলনে অর্থবহতা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এতসব বৈচিত্র্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ্য অবদান হ'ল বাঙলার ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ছন্দে ভাষায় কাব্যিক ইশারা-ইঙ্গিত নির্মাণের শ্রেষ্ঠ কবি মাতৃভাষার এই বিশেষ ক্ষেত্রটি সহজেই আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদেরও চিনিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের ধ্বনি-শব্দের পরিস্ফুট অর্থ ব্যক্ত করা যায় না, অথচ এগুলির অন্তর্নিহিত ইশারা-শক্তির বলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার বোধগম্য হয়, যেমন—করকর, কনকন, কিচকিচ, কিচমিচ, কুলকুল, কলকল, খচখচ, খিটখিট, খিটমিট, খিটিমিটি, চকচক, চকমক, উসখুস, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ছটফট, টুপটাপ, চোঁচোঁ, ঠুংঠাং, ধূ ধূ, ঝাঁ ঝাঁ, খাঁ খাঁ ইত্যাদি শতাধিক। আবার মাঝখানে স্বরের পরিবর্তন ক'রে চুপচাপ, ফিসফাস, ফিটফাট, প্রভৃতিও। 'ভাষার ইঙ্গিত নিবন্ধে' এই শ্রেণীর শব্দগুলির উচ্চারণ ও রূপের বৈচিত্র্য ধ'রে তিনি মূল দুটি বিভাগ পেয়েছেন। চকচক, কনকন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেগুলির মাঝখানে কোনো ধ্বনিপরিবর্তন নেই সেগুলিকে বলতে চেয়েছেন 'ধ্বনিদ্বৈত', আর ফিটফাট, চুপচাপ, ধুপধাপ, উসখুস, চকমক প্রভৃতিতে মাঝখানে ধ্বনির পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে ধ'রে সেগুলির নাম দিয়েছেন 'ধ্বনিদ্বৈধ'। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"এই যতপ্রকার জোড়া শব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে-অর্থ, তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা।" অর্থাৎ এ শব্দগুলিকে ভেঙে সমাস ও ব্যাসবাক্যের অধীন কোনোমতেই করা যায় না। প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যেমন দেখা যায়—বন ও জঙ্গল, ঝোপ ও ঝাড়, কেঁদে ও কেটে, সেজে ও গুজে, চেয়ে ও চিন্তে, জিনিস ও পত্র, লোহা ও লক্কড় প্রভৃতি তা অবিবেচনা-প্রসূত। এগুলি গোটাগুটিভাবে উৎপন্ন শব্দ এবং ভাঙতে গেলে বহুক্ষেত্রেই বিপাকের সম্মুখীন হতে হবে। এখানে আমাদের একটা বক্তব্য পেশ করছি। রবীন্দ্রনাথ, এমনকি পরবর্তী সুনীতিকুমারের সামনেও তখন সাঁওতালী বা মুণ্ডারী অভিধান ব্যাকরণ ছিল না, তাই তাঁরা ঐ রকম ধ্বনিমূলক বা অন্যবিধ শব্দদ্বৈতগুলির সূত্র ধরিয়ে দিয়ে যাননি। পরে দেখা গেছে সাঁওতালী ও মুণ্ডারী অভিধানে এসব দ্বৈত ও দ্বৈধের সামান্য এদিক ওদিক নিয়ে বাঙলায় প্রায় সবই মিলে যাচ্ছে, আর সেখানে দ্বৈতরূপে প্রতিভাত শব্দগুলি একই শব্দ, দুয়ের মিশ্রণ নয়। তবে কোলমুণ্ডা ভাষার আদিমূলে ওগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক দুই শব্দ ছিল কিনা তা এখন কোনমতে বলার কিছু উপায় নেই। বাঙলায় আমরা অনুকার দ্বৈতের যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তাছাড়া হাজার ঐ ধরনের শব্দ আদিবাসীদের ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। আমরা স্বল্প কিছু গ্রহণ করেছি, কিছু কিছু ঐ আদর্শে সৃষ্টি করে নিয়েছি। আবার অনেক নিইও নি। কোনো কোনো শব্দ আগে পিছে বদলে নিয়ে আমাদের উচ্চারণ সহজ করে নিয়েছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থেও পরিবর্তন এনেছি এমন দু'-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, আমরা বলি ফিসফাস বা ফুসফাস, অর্থাৎ নিচুস্বরে উষ্ণ উচ্চারণে কথা বলা, সাঁওতালীতে 'ফাসফুস'। অর্থ একই। তেমনি আমরা ব্যবহার করি চুপচাপ, সাঁওতালী মূলে রয়েছে চাপচুপ, যার ইঙ্গিত হল কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা। 'টলটল' শব্দটি বাঙলায় জানাচ্ছে তারল্য এবং পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু সাঁওতালীতে এর দ্যোতনা হল 'অনেকটা বিস্তারযুক্ত।' ঠনঠন্ শব্দে মুণ্ডারীতে বুঝায় শুষ্কতা, যা থেকে 'ঠনঠনিয়া', কিন্তু আমাদের কাছে তা শূন্য কলসীর আওয়াজ দ্যোতনায় নিযুক্ত হয়েছে। তেমনি চড়চড় শব্দের মূল অর্থে বোঝায় তীব্রতা রুক্ষতা, আমাদের কাছে 'শক্ত জিনিসের ফেটে যাওয়া'। 'ছমছম'-এর সঙ্গে ঝমঝম-এর সম্পর্ক। 'ঝমঝম'-এর মৌল দ্যোতনা মূর্চ্ছার মত অবস্থা (ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে যা হয়)। আমরা কেবল ভয় পাওয়ার মানসিক অনুভব ব্যক্ত করছি। এ রকম পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তবু এসব অনুকার-শব্দের মূল ভাণ্ডার যে আদিবাসীদের মধ্যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে দ্বিত্বের মত প্রতিভাত শব্দগুলির ক্ষেত্রেই নয়, এককরূপে ব্যবহৃত, মূলে অনার্য ও অর্থবান্ এবং আমাদের কাছে অনুকারবৎ প্রতীয়মান শব্দগুলিতেও ঐভাবে ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যেমন—কোঁচ্কা, ফচ্কে, চ্যাংড়া, চট্কা, ছল্কা, চপ্সা, ফুট্কি, মুটকী, ধুমসী প্রভৃতি। এগুলির ধাতু-প্রত্যয় নির্ণয় অসম্ভব। আবার দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বীকৃত পারস্পরিক ক্রিয়াবাচক ও দুইপক্ষ-নির্দেশক কানাকানি, হাতাহাতি, চুলোচুলি প্রভৃতি শব্দের কোনো-কোনোটি বাঙলায় কেবল একপক্ষ দ্যোতক হয়ে পড়েছে, যেমন—ছুটোছুটি করে তো গেলে, তারপর? টানাটানির সময়। কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়ই। নাচানাচি ক'রে কী হবে? (লেখালেখি ক'রেও কিছু হ'ল না। এবার কবির শব্দতত্ত্ব-সংলগ্ন আলোচনা সম্পর্কে দু'-একটা কথার উত্থাপন ক'রে কবির 'বাঙলাভাষা-পরিচয়' পুস্তিকায় আসছি।

একটা কথা হ'ল শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত-বাংলার মত দেখায় এমন 'পত্র' শব্দের ব্যবহার, যেমন—জিনিসপত্র, মালপত্র, গহনাপত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি। প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণগুলিতে দেখি সংস্কৃত 'পত্র' শব্দের অর্থসংগতি এসব জায়গায় হচ্ছে কিনা তা না ভেবেই জিনিসপত্র, মাল ও পত্র, গহনা ও পত্র এরকমভাবে দ্বন্দ্বসমাসের বিধান দিয়ে লেখক ও শিক্ষকেরা নিশ্চিন্ত থাকেন। এখন আমরা দেখছি যে উক্ত জোড়শব্দগুলি মূল ধ'রে অবিভাজ্যরূপে আমাদের কাছে এসেছে। এবং দ্বন্দ্বসমাসের ক্ষেত্রে যদি ফেলাও যায়, ব্যাসবাক্য রাখতে হবে গহনা ও গহনার মত আনুষঙ্গিক বস্তু, মাল ও মাল সংলগ্ন শাখা-বস্তু ইত্যাদি। কারণ, সংস্কৃতের মূর্তি পরিগ্রহ করা ঐ 'পত্র' শব্দটির আসল রূপ হল সাঁওতালী 'পত্রংক্' যার অর্থ প্রশাখা, ফেঁকড়ি। 'গহনাপাটি' শব্দেও ঐ একই অর্থ এবং পাটি অংশের 'প' লেখা বা ছাপার ভুলে 'গ' হয়ে দাঁড়িয়েছে 'গহনাগা[illegible] কেনাকাটা, কান্নাকাটি, কেঁদেকেটে প্রভৃতি শব্দেও দ্বন্দ্বের আভাস আ[illegible] ঠিকই। কিন্তু ওখানে 'কাটা' ক্রিয়ার অর্থ বেঁচেবর্তে থাকা বা কাল কাটানো[illegible] যাপন করা। এসব শব্দ এমনভাবে গঠিত যে ভেঙে ফেলে অর্থ বোঝানো যায় না।

আজকালকার ব্যাকরণগুলিতে প্রচলিত নামের কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলিকে তিনভাবে বিভক্ত করে দেখানোর রেওয়াজ দেখা যায়, যেমন—সংস্কৃত, খাঁটি বাঙলা, বিদেশী। কতকগুলি প্রত্যয় যে সংস্কৃতের নয়, খাঁটি বাঙলার, তা রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এই প্রত্যয়গুলির কোনটিতে বিশেষণ, কোনটিতে ভাব-বিশেষ্য, কোনোটিতে বা ক্রিয়া-বিশেষ্য এইসব দ্যোতিত হয়ে থাকে। কোথায় সংস্কৃতের ণ্যৎ-যৎ-ক্যপ্, ঠক্-ঠঞ্-বুঞ্ আর কোথায় বাঙলার অ, আ,

অনা, ই, উ, টা, টে, পনা, তর, নি, নী প্রভৃতি। লৌকিক বাঙলার শব্দগুলি এই শক্তিতেই চলে, গ্রাম-বাঙলায় এইসব প্রত্যয়জাত শব্দ নিয়েই মানুষের লোকব্যবহার আজও সচল। পাঠ্য এবং অধ্যবসায় সহ শিক্ষণীয় কেতাবী ভাষায় প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ জীবনে তা না হলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত খাঁটি বাঙলা প্রত্যয়ের পরিচিতি সহ তালিকাটি পরবর্তী ব্যাকরণকারদের কাজে লেগেছে। ওগুলির মধ্যে আ, টা, তর, (তরহ্) নিঃসন্দেহে অনার্যমূল।

মাতৃভাষাচর্চা বিষয়ে রবীন্দ্রের দ্বিতীয় আলোচনা পুস্তক হ'ল 'বাঙলা ভাষা পরিচয়'। এই পুস্তিকাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার প্রৌঢ় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখতে গেলে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারের বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধীয় প্রখ্যাত গ্রন্থ ও অন্য বহু আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরও বাঙলার প্রকাশভঙ্গির স্বকীয় বহু দিক কেবল বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের দ্রষ্টা কবি অনুভব করেছিলেন। প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ নয়, তাত্ত্বিকতা তো নয়ই, আগ্রহশীল পথিকের চোখে আকর্ষণযোগ্য যা যা ঠেকেছে তা সাধারণেও দেখুক ও বাঙলাভাষার লুকানো শক্তি উপলব্ধি করুক এই আন্তরিক প্রেরণাবশেই তিনি উক্ত পুস্তকের বাইশ-তেইশটি অধ্যায়ের বিন্যাস করেছেন। দেখা যায়, এসবের মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম নিবদ্ধ করার দিকে কবির কোন আগ্রহ নেই, শুধু রূপদর্শীর প্রেরণাবশে যেসব সাম্য ও বৈচিত্র্য আপনা থেকে চোখে পড়েছে তা দেখিয়ে দিয়েই যেন তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করেছেন। গ্রন্থটির প্রাথমিক কয়েকটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষার দর্শন অর্থাৎ ফিলজফি উপস্থাপিত করেছেন। ভাষা কেন, ভাষা কিভাবে গড়ে ওঠে, ভাষা প্রতীকের কাজ ক'রে কিভাবে মানুষের অনির্দিষ্ট ভাবনাকে বাঁধে, ভাষার ইঙ্গিত-ইশারা দেওয়ার শক্তি ভাষার সাহিত্যিক মূর্তি ও সামাজিক ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি নিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে এবং চলিত বাংলার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বিষয় বুঝিয়ে চলিত বাঙলার সপক্ষতা করে পর তিনি ব্যাকরণের দিকে এসেছেন। আগেকার "শব্দতত্ত্বে'র কয়েকটি বিষয়ের অনুবৃত্তি করে বাঙলার মৌল স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে বাঙলা শব্দের গঠনে ও ব্যবহারে ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমার প্রাধান্য নির্দেশ করেছেন। কয়েকটি অধ্যায়ে সাধারণ বাঙলা প্রত্যয়, স্ত্রী-প্রত্যয়, বহুবচন, সম্মানবাচী শব্দ ও সর্বনামের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের মধ্যে এসেছেন এবং কারক-বিভক্তি প্রয়োগে সংস্কৃত থেকে বাঙলার পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে বহুবিচিত্র ক্রিয়ারূপের শক্তির বিচার করেছেন। তারপর শব্দে ও বাক্যে সংলগ্ন অব্যয়গুলি ভাষার প্রকাশ-শক্তি কতদূর বাড়িয়ে তুলেছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। সর্বত্র লক্ষ্য রেখেছেন বাঙলার খেয়ালী স্বকীয়তার দিকে এবং সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে বিভক্তি-প্রত্যয় লিঙ্গ-বচন প্রভৃতিতে যেমন পাকা নিয়ম আছে বাঙলায় তা নেই। কোনো নিয়ম বাঁধতে গেলেই ব্যতিক্রম এসে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। নিয়মের যুক্তি এবং অনিয়মের যুক্তিকে যিনি এককোঠায় বাঁধতে পারবেন তিনিই হবেন এই চলন্ত ভাষার প্রকৃত বৈয়াকরণ। দেখতে গেলে বাঙলায় পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বড়রকমের বিভেদ কিছু নেই। সর্বনামে তো নেইই, বিশেষণেও নেই, যেটুকু হয়ে থাকে তা সংস্কৃতের অনুকরণে। স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃতের 'আ' বাঙলায় চলে না, ঈ চলে, কিন্তু নী-ইনীর দিকে থাকে প্রবল ঝোঁক। বহুবচনেও তেমনি, নবসৃষ্ট -রা অথবা গুলি-গুলা। তাছাড়া আছে 'সব-সকলে'র যোগ বা বিশেষণের বিশেষ্যের দ্বিত্ব। কারকের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে কর্তায় বিভক্তি না থাকাই নিয়ম, ক্রিয়ার আধিপত্যে কারক দুর্বল হয়ে পড়ে ব'লে কর্তায় যদিবা একটা 'এ' লাগানো যায়, সবক্ষেত্রে পারা যায় না। একথা বলা যায় না যে গোপালে সন্দেশ খায়, কি, রহিমে গাছে চড়ে। যদি বলা যায় যে বিশেষ নামের ক্ষেত্রে 'এ' অচল, তখনই দেখানো যায়, 'রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে।' এই কারণে অবশ্য সুনীতিকুমার কর্তার 'এ'টাকে করণের 'এন'-জাত 'এ' ধরেছেন, যেহেতু বহু বাঙলা বাক্যের গঠন মৌলিকভাবে কর্মবাচ্যের। কর্মকারকে আগেকার 'রে' ছেড়ে 'কে' ব্যবহারই নিয়ম, কিন্তু সেখানেও বিভক্তি না দেওয়াই বড় নিয়ম।

সর্বনামের একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আত্মবাচক 'আপন' এবং মধ্যমপুরুষের মানবাচী 'আপনি' শব্দে এসেছেন। অর্থে ও প্রয়োগে অত্যন্ত পৃথক হলেও এই দু'টি শব্দের উদ্ভবের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত একই মূল দেখা হয়েছে। সেটা হ'ল সংস্কৃতের 'আত্মন্' অর্থ নিজ, স্ব। হিন্দীতেও অপনা, কিন্তু মানের ক্ষেত্রে 'নি' ছাড়াই 'আপ'। ফলে শব্দ দুটির একই মূল হতে পারে না, আমাদের এই ধারণা। এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণও মিলছে। নিজ অর্থে আপন, আপনা 'আত্মন্' থেকে নিঃসংশয়ে। কিন্তু মানবাচী আপ, আপনির মূল হ'ল কোল-মুণ্ডা মধ্যম পুরুষের বহুবচনের 'আপে' এবং আপে+হুনি। 'হুনি' হ'ল ঐ মধ্যম পুরুষেরই জোর-দেওয়া নির্দেশক কোলমুণ্ডা শব্দ। বাঙলা ঐ শব্দটাও 'আপে'র সঙ্গে নিয়েছে, হিন্দী নেয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঙলা-ভাষা-পরিচয়ে আমাদের বাক্যের খেয়ালী রীতি-প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। তা হ'ল প্রত্যয় ও অব্যয়নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি শব্দাণুর বহু বিচিত্র অর্থে প্রয়োগের দিক। বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সেগুলি বিভিন্ন মনোভাব ইঙ্গিতে জানানোর ক্ষমতা রাখে। এগুলি প্রতীকী শক্তি-সম্পন্ন শব্দাণু, যেমন—ই, ও, ক, কী, তো, গো, গে, যে, না। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে এ ধরনের অব্যয়শব্দের প্রতাপ সংস্কৃত বাগ্ভঙ্গিতে সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। প্রয়োগের উদাহরণ দিচ্ছেন—হ'লই বা, গেলই বা, নাই বা গেলে, না গেলেই বা কী, কী-ই বা এমন রূপ, যাবে তো, কর তো, নয়তো কী, সেও, তুমিও, সে এলে তো, তুমি তো এখন আসই না, তাই তো, কী যে বকছ, সে যে আসবে না তা জানি, করুক গে, মরুক গে, না গ, ওমা কী হবে গো, সে কি গো, দাও না গো, যাবনাক ইত্যাদি। এগুলির কোথাও বিকল্প, কোথাও অনুনয়, কোথাও জোর, কোথাও প্রত্যাশা, কোথাও বিস্ময়, প্রভৃতি নানান সূক্ষ্ম ভাব দ্যোতিত হচ্ছে। এরকম নানা কারণে আমাদের মাতৃভাষাকে রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গিপ্রধান ভাষা ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

ঐ সব বিচিত্র অব্যয়গুলির মূল নির্ণয় করতে একটু বেগ পেতে হয়। কয়েকটি সংস্কৃত পাওয়া যাচ্ছে, যেমন বা, যে (যদ্) ই (=হি), কি-কী (কিম্), না (ন, নাম), কিন্তু ও, ত-তো, গ-গো, এগুলি অনার্য অর্থাৎ কোলমুণ্ডা থেকে পাওয়া। আমিও, তুমিও, সেও, ইত্যাদির 'ও' মধ্যযুগের বাঙলায় পাওয়া যাচ্ছে আমিহ, তুমিহো, সেহ রূপে। এ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছেন। এই হ-এর অনিবার্য মূল হ'ল সাঁওতালীতে ব্যবহৃত হঁ যার অর্থ তা ছাড়া, -শুদ্ধ এবং। ত-তো হ'ল সাঁওতালীর প্রায় প্রতি বাক্যে ব্যবহৃত 'দ' যার বাচকতা হচ্ছে একটু কিন্তু, একটু অনুনয়, একটু নিশ্চয়। গ-গো এর ক্ষেত্রও অনুরূপ, একটু জোর, নিশ্চয়, প্রতিবাদের ইঙ্গিত। তা ছাড়া আক্ষেপবাচকতাও বটে। এজন্য গানে ও লিরিক কবিতায় কেবল 'গো'-এর দেখা পাওয়া যায়। বাঙলার খাঁটি এবং বাচক 'ও' এবং বিশেষণ-জ্ঞাপক বা সম্বন্ধদ্যোতক 'ই' অবশ্য ফারসী মূল থেকে। এবং এর অর্থ ও সংস্কৃত থেকে পৃথক।

ব্যাকরণ ও তার মূলীভূত ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হলেই ঠিক হয়। কিন্তু পরিসরের স্বল্পতায় আত্মসংবরণ করছি।





আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে

ভবতোষ দত্ত

'ক্ষণিকা' কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতার নাম 'ক্ষতিপূরণ'। ঠিক কোন সময়ে কবিতা লেখা হয়েছিল বলা যাচ্ছে না। তবে ক্ষণিকা বইটি ১৩০৭ সালে বেরিয়েছিল। তাই ধরে নেওয়া যায় ওই বছরের আগে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে দু'-এক বছরের মধ্যে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। কবিতা হিসাবে এটি অত্যন্ত উপভোগ্য, কিন্তু তার চেয়েও এই কবিতাটির মধ্যে যে কবির মনের কথা প্রচ্ছন্ন আছে সেটি বিশ্লেষণ করে দেখলে এর গুরুত্ব অন্য দিক দিয়ে বোঝা যাবে।

ক্ষণিকা কাব্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। চিত্রা সোনার তরী চৈতালি থেকে সেই ভঙ্গিটি ভিন্ন। আগের কাব্যে কবির কণ্ঠ গম্ভীর, আত্মমগ্ন। অন্তরে তিনি কোন অতল রহস্যের সন্ধান পেয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। এই প্রকৃতি মানুষ জীবন জগতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে কোন সৌন্দর্য-সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। সেই অনুভূতিটিকে তিনি নানাভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বর্ণাঢ্য ভাষায়, মুখর ছন্দে, অবিস্মরণীয় চিত্রকল্পে। সেই গভীর চেতনার পূর্ণ রূপ ফুটেছে ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাব্য চৈতালিতে—

আজ মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি লভিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

দ্রাক্ষাকুঞ্জবন আমাদের নিত্যদৃষ্ট বস্তু নয়। তবু একে কবি রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে ফলে উঠতে দেখেছেন। অর্থাৎ এ বর্ণনা নিছক বস্তু বর্ণনা নয়। কবির অন্তরের কোনো পরিপূর্ণ ভাবের প্রতীক। সে-ভাবটা কী তার ব্যাখ্যার দরকার নেই। সৌন্দর্যের অনুভূতি হতে পারে। জীবনের পরিণাম চিন্তা হতে পারে। মানবসংসারের সুখদুঃখ বেদনাবোধ হতে পারে। জীবন সম্পর্কে কবির ধ্যান যে এক অটল গভীরতায় পৌঁছেছে তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রকাশের ভাষাও গম্ভীর আবেগপূর্ণ।

ক্ষণিকায় দেখছি এই গভীরতা নেই। বরং সেখানে সচেতনভাবেই কবি বলেছেন—

গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তারে
সাহস নাহি পাই।

ক্ষণিকার কবিতা হালকা চালের লঘু চপলতার কবিতা। হাসির সুরে সকৌতুকে জীবনকে নিয়ে রসিকতা করেছেন। মৃত্যুকে নিয়ে, প্রেমকে নিয়ে, বৈরাগ্য সাধনা নিয়ে কবির কৌতুকের অন্ত নেই। এর ভাষাও ভাবেরই অনুরূপ। চল্‌তি ভাষায় লেখা এই কবিতাগুলি সেদিন বাংলা সাহিত্যেই ছিল অভিনব। ক্ষণিকার আগে কবিতায় চলতি ভাষার ব্যবহার প্রায় চোখেই পড়ে না, তেমনি দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও প্রায় ছিল না। মধ্যযুগে এই ছন্দ এই ভাষা ব্যবহৃত হত ছড়ায়। তাই ছড়ার ছন্দ নামেও এ

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সদ্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন-'পরে।
পরম গাম্ভীর্যে যুগে যুগে
ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য-মাঝে,
অভ্রভেদী সুদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া
দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে
উদয়-অস্তের চক্রপথে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকাজ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
সকাল

ছন্দ পরিচিত হয়ে এসেছে। ছড়ার ভাষাতেও একটি সরল লঘুতা আছে যা তাদের ভাবেরই যোগ্য। এই ভাষা এবং এই ছন্দকে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাংলা ভাষার স্বাভাবিকরূপ। এই স্বাভাবিক ছন্দ এবং ভাষাকে এতকাল পর রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন ক্ষণিকায়।

ভাষায় এবং ছন্দে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে প্রচলিত পূর্বতন প্রথা থেকে সরে এলেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ বৈরতক কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি সেকালের স্মরণীয় কাব্যগুলি সংস্কৃত 'শব্দের' সাধু ছন্দে লেখা। তাদের ভাষার গাম্ভীর্য বিষয়ের গাম্ভীর্যেরই অনুরূপ। ক্ষণিকার কাব্য বিষয়, কাব্যভাষা ও কাব্যছন্দ উনিশ শতকের এই তিন প্রসঙ্গেই আলাদা। এই বিভিন্নতা অসচেতন নয় বরং অত্যন্ত সচেতনভাবেই কবি উনিশ শতকের কাব্যরীতি থেকে ভিন্ন হয়েছেন। 'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটি তার প্রমাণ। নূতন ছন্দে নূতন ভঙ্গিতে কবি পরিহাসের সুরে যা বললেন তাতে শুধু তার কবিতার ভিন্ন গতির কথা নয়। বাংলা কবিতারই নতুন যুগ ও নতুন প্রবণতার কথা প্রকাশিত। কবি তাঁর প্রেয়সী কাব্যদেবীকে সম্বোধন করে বলছেন, বাংলা পাঠকরা কবির প্রতি দোষারোপ করছে এই বলে যে কবি মহাকাব্য রচনা ভুলে নিরত হয়েছেন প্রেমের লিরিক কবিতা রচনায়। সমালোচকেরা দিচ্ছেন ধিক্কার। যখন মহাকাব্য রচনাই রীতি, কবিও যখন মহাকাব্য লিখবেন বলে তৈরি হচ্ছেন, তখন তাঁর কাব্যদেবীর কঙ্কণের লিরিক ধ্বনিতে মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—

ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

মহাকাব্যের কল্পনা ভেঙ্গে তৈরি হল লিরিক কবিতার রমণীয় গীতিজগৎ। কোথায় গেল সেই পৌরাণিক যুদ্ধের কাহিনী। সেইসব অসাধারণ বীরের কীর্তি বর্ণনা করে আট সর্গের বিপুলকায় কাব্য। কবি লিখলেন দুই হৃদয়ের নিভৃত প্রেমের গুঞ্জন কথা,—

রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ।
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
কীর্তিকলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্ন-মতো।

কিন্তু সে জন্য কবির বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। মহাকাব্য লিখে লোকের মনে অমর হবার দাবী করেন না তিনি।—

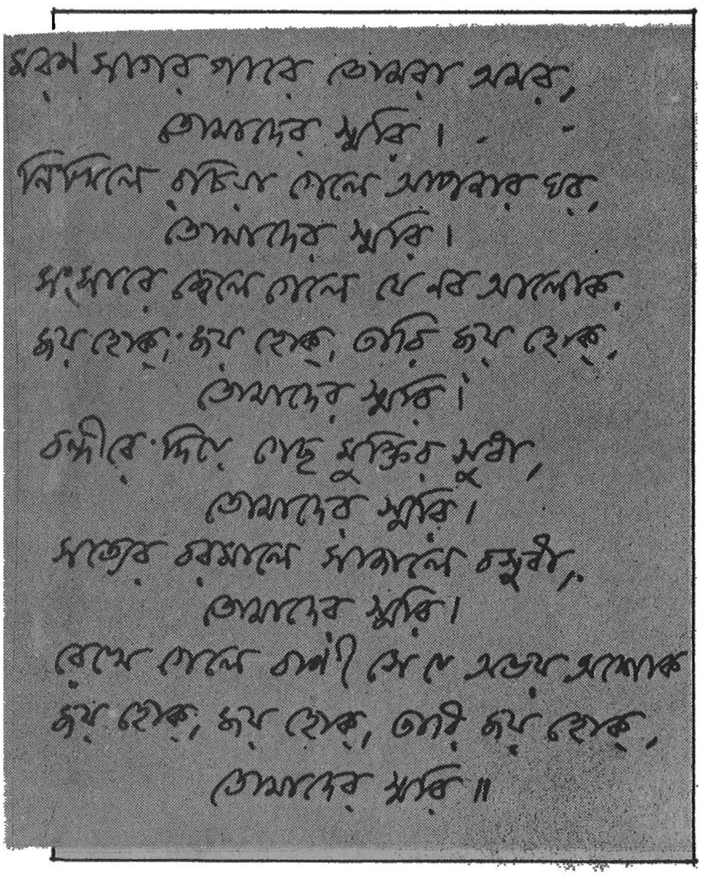
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার শ্রোতে

'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটি ছোট, লঘুভঙ্গিতে লেখা একটি খাঁটি লিরিক। কিন্তু ছোট হলেও এই কবিতার তাৎপর্য যথেষ্ট ব্যাপক। একে শুধু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বাগত ভাষণ বলতে পারি না। এই কবিতা বাংলা কাব্যের পালাবদলের ইঙ্গিত বহন করছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং বাংলা কবিতার সাধারণ প্রবণতা দুটিই একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার ইতিহাসকে অনুসরণ করে এলে



একাধিকবার এ রকমের সংযোগ ঘটতে দেখা যাবে। এর প্রথম নিদর্শন ছিল ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তো শুধু একটা ঝর্ণার উল্লসিত আত্মপ্রকাশ নয়। কবিচেতনারই আত্মউৎসার। সেকালের সমাজ, জীবন, নীতি আদর্শের কঠিন বদ্ধতা থেকে কবিহৃদয়ের একান্ত আনন্দের স্বাধীন অভিব্যক্তি। আবার এই অভিব্যক্তির সঙ্গে মুক্তি ঘটেছে বাংলা কবিতারও। বাংলা কবিতায় এমন আত্মকেন্দ্রিকতার অবাধ উৎসারেই নতুন গীতিকবিতার সূচনা হয়েছিল। হেমচন্দ্রীয় যুগের সমাজকেন্দ্রিক কাব্যরচনার জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাব্যকল্পনার রমনীয়তা, যার আরম্ভ হয়েছিল বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যে।

কিন্তু বিহারীলাল তখনও বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি সেভাবে আকর্ষণ করতে পারেননি। তাঁর সারদামঙ্গল রচনার পরে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য বেরিয়েছে। তারাই বাঙালি পাঠকের উচ্চ আদর্শকে জাগিয়ে রেখেছিল। মহাকাব্যিক উদাত্ততায়, নানা ঘটনায় চঞ্চল জীবন কাহিনীতে তখন আত্মকেন্দ্রিক লিরিক কণ্ঠটি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন বঙ্কিম যুগ চলেছে তখনও বাংলা সাহিত্যাকাশে রাজসিক কল্পনার প্রভা অমলিন। গিরিশচন্দ্রের-দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের মতো উপন্যাস আমদের মনে জাগিয়ে রেখেছে মহাকাব্যের ব্যাপ্ত বিস্তৃত জীবনের প্রতি আমাদের সম্ভ্রমপূর্ণ অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লেখেননি কিন্তু চিত্রা সোনার তরীর বর্ণাঢ্য কল্পনা এবং কথা ও কাহিনীর অতীত চারিতা এবং তার নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ আমাদের রসপিপাসাকে গভীরতার সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন। এ-সময়ে ক্ষণিকার কবিতাগুলি একেবারেই অন্য একটি সুর বাজিয়ে তুলল। এ-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্কোচ আত্মভাষণ তাঁর নিজের কাব্যধারায় যেমন, বাংলা কাব্যধারাতেও ভিন্ন গতিপথ নির্দেশ করল।


মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি॥

নানাভাবে কবি তাঁর আত্মমুক্তির ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন। বালককাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য নামক সাহিত্য বস্তুটির প্রতি প্রীত ছিলেন না। মেঘনাদবধ কাব্যকে আক্রমণ করে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন একথা সুবিদিত। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব যে তেমন অনুকূল ছিল না। তাঁর নানা লেখায় আভাসে ইঙ্গিতে তা প্রকাশ পেয়েছে।* রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যকে আমাদের সাহিত্যে কৃত্রিম বলে মনে করতেন। মহাকাব্যতে যে বিষয় ও কাহিনী অবলম্বন করা হয়। বাঙালির শান্ত নিরুদ্যম জীবনে তা স্বাভাবিক নয়। মহাকাব্যে চরিত্র হয় অসাধারণ সমুন্নত মহিমার মানুষ। তাদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ, অসাধারণ ঘটনা সমাবেশ, ত্যাগ ও বীর্যের আদর্শ। তাদের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আমাদের বাঙালি সমাজে একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাহিত্যের আদিকাল থেকেই এ নিয়ে বোধহয় কেউ প্রশ্ন তোলেনি। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে বা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য নাটক চিরন্তনতা লাভ করেছে। যারা এ সাহিত্য আস্বাদন করেছে। তারা অবশ্যই সাধারণ সমাজের সহজ মানুষ। মহাকাব্যে নাটকে সাধারণ মানুষের কথা কোনোকালেই থাকে না। ক্ষণিকের সুখদুঃখ হাসিকান্না প্রেম ভালোবাসা মহাকাব্যের বিষয়ই হয় না। তবু মহাকাব্য অসাধারণ মানুষের অসাধারণ কাহিনী নিয়ে চিরকাল পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে এসেছে। কিন্তু এ ধরনের কাহিনী ও বিষয় রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগত বলে মনে হয় না। তার বহু প্রমাণ আছে। সোনার তরীর ‘পুরস্কার’ কবিতাটিকে রবীন্দ্রকবিমানসের স্পষ্ট আত্মঘোষণা লক্ষ্য করবার বিষয়। এই কবিতার কবি রাজার কাছে গিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের গান গাইল বটে কিন্তু তার আত্মচরিতার্থতা অন্য বিষয়ের গানে—

জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

সুতরাং এসব বিষয়ে বৃথা মগ্ন না হয়ে

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মতো রবে।

ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের লিরিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে মহাকাব্যে বা উপন্যাস-ছোটগল্পে নাটকীয় চমকপ্রদ কল্পনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগই ছিল। শেক্সপীয়রের নাটকে মানবচরিত্র সৃষ্টির মহত্ত্বকে স্বীকার করেও ওইসব কাহিনীর দ্বন্দ্বসংঘাত এবং তীব্রতা, হৃদয়-জ্বালার আতিশয্য যে তার রুচিতে সায় পায়নি জীবনস্মৃতির ‘ভগ্নহৃদয়’ অধ্যায়ে যথেষ্ট সংযমের সঙ্গেই তিনি তা জানিয়েছেন। ছিন্নপত্রাবলীতে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

Anna Karenina পড়তে গেলুম। এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।’

এই চিঠিটা ১৮৮৯-র জুন মাসে লেখা। যে-যুগে ‘পুরস্কার’ কবিতাটি লেখা। এই চিঠিও সেই সময়ের। আন্না কারেনিনা উপন্যাস। এর মধ্যে

* বাল্যকালে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বৃত্রসংহারকে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন।

আছে সম্ভ্রান্ত সমাজের ঘটনার জটিলতা। তীব্র অন্তর্দাহ, মানবচরিত্রের আকস্মিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও পরিণাম। মহাকাব্যের প্রকৃতি ও উপন্যাসের প্রকৃতি অবশ্যই এক নয়। তবু সাধারণ বিচারে টলস্টয়ের উপন্যাসের কাহিনীর বিশালতা ও ব্যাপ্তিতে মহাকাব্যেরই অনুরূপ। কোনো বিদেশী সমালোচক কাহিনীর এই প্রকৃতিকে বলেছেন Concrete epic reality. বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কাহিনী এই জাতের। ঘটনার জটিলতা, অতীতের কাল্পনিক জীবন পটভূমি, তীব্র অন্তর্দহন প্রভৃতি বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখা যায়। বাঙালি জীবনের বর্তমান সমাজের শান্ত চরিত্রের সঙ্গে এদের মিল নেই। মনে রাখতে হবে এটা উনিশ শতকের শেষের দিকের বাঙালি সমাজের কথা। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহ মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।'

১৮৮৮তে লেখা এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজেই সার্থক করেছেন তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পে এবং ক্ষণিকার কবিতাগুলিতে। এতে বোঝা যায় যে ক্ষণিকা রূপে রীতিতে রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কাব্যধারা থেকে আলাদা হলেও এর সম্ভাবনা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবিমানস প্রথমাবধি লিরিকের শান্ত অনাড়ম্বর গভীরতার অনুরাগী। বিহারীলালের গীতিকাব্যিক প্রবণতা তাঁকে প্রথম থেকেই আকর্ষণ করেছিল। নানা সূত্রে তাঁর অন্তর তাঁর মনের ভাবটিকে প্রকাশ করে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত প্রথা ছিল অন্যরকমের। রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে এই প্রথাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তখন বাংলা সাহিত্যের আদর্শ, তেমনি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে মন খুলে কখনও কিছু তেমন করে বলেননি। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের তিনি অসাধারণ প্রশস্তি করেছেন, তার বিশাল মহিমার জন্যই। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী চন্দ্রশেখর সীতারাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে তেমন কোনো মন্তব্য নেই। বরং 'সূর্যমুখী আমাদের ঘরের মেয়ে হইয়া দেখা দিল'—এই কথাটা বলতে তিনি ভালোবাসতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে মহাকাব্যিক ঘনঘটা যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্ববিলাপ রবীন্দ্রনাথের কাছে বরং কৃত্রিম বলেই মনে হয়েছে। অথচ উপন্যাস মহাকাব্যের এই আদর্শ সেকালের কবিদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই কৃত্রিম সাহিত্যাদর্শ থেকে মুক্ত বাংলা সাহিত্য সহজ স্বাভাবিক পথে যাত্রা করবে তাতেই সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ। বিহারীলালের মৃত্যুতে লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থাটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। যুদ্ধবর্ণনামূলক দেশাত্মবোধক কাব্য রচনার নিষ্ফল চেষ্টার চেয়ে নিজের মনের কথা সহজভাবে বলতে পেরেছিলেন্ বলেই বিহারীলাল সেকালে ছিলেন এতখানি স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও বিহারীলাল সমকালের মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করতে পারেননি। কারণ তখন সাহিত্য বড় বড় আইডিয়া আদর্শ গল্প কাহিনী নিয়ে ব্যাপৃত। ছোট কবিতা তখনও লেখা হয়েছে। নবীনচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনী লিখেছেন, হেমচন্দ্র কবিতাবলী লিখেছেন। কিন্তু এতে লিরিক সুর তেমন বাজেনি। এদের কবিতায় সেই শান্ত আত্মগুঞ্জরণ নেই। তত্ত্বনীতি আদর্শ নাটকীয় আবেগ উচ্ছ্বাস দিয়ে লেখা এইসব কবিতায় কবিদের নিভৃত মনের কথা শুনতে পাই না। বড় বড় আইডিয়া দিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়েছে। ইতিহাসের দূরশ্রুত রাজারাজড়াদের নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে কিন্তু বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা লেখার প্রয়াস শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বাসনা ব্যক্ত করেছেন। উপরে তার উল্লেখ করেছি।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবটিকে আমরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই কথা বলতে পারি না। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্তরের কথাটিও যেন পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমযুগ শেষ হয়েছে। আরম্ভ হচ্ছে রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রযুগ লিরিক কবিতার যুগ। ঐতিহাসিক উপন্যাস মহাকাব্য রচনা করবার প্রেরণা ফুরিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা কাব্যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয় ছিল ; তত্ত্ব ও নীতিকথাও ছিল। তখনও যেন মহাকাব্যিক কল্পনার শেষ ছায়াটুকু মিলিয়ে যায়নি। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত দুই কল্পনায় দোলাচলতা চলেছে। পঞ্চভূতের 'মনুষ্য' নামে প্রবন্ধে কবি বলেছেন ভীষ্ম-দ্রোণ কুরু-পাণ্ডবরা খুব বড়ো সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লীর একটি সামান্য মানুষের মহত্ত্বও তার চেয়ে কম না হতে পারে। বিচিত্র প্রবন্ধের 'বাজে কথা' নামে প্রবন্ধটির মধ্যে বলছেন 'সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার সাহস রাখে না'। এই বিচিত্র প্রবন্ধেরই ছোট ভূমিকায় তিনি বলছেন 'এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ, ইঁহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।' বস্তুত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যে শিল্পরূপ অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, ভাষা অনেক রমণীয় হয়েছে, ছন্দে এসেছে পূর্ণতা। কবিতায় কোনো বড়ো ভাবের কথা বলাই সার্থকতার পরিমাপ নয়। সুন্দর করে সহজ কথা বলাই সার্থকতা।

ক্ষণিকাতে কবি তাই করেছেন। সহজ কথা, সহজ ভোগ ও সহজ আনন্দের কথাই কবি এই কাব্যে বলেছেন। বস্তুত ক্ষণিকা কাব্যে দুটি দিক আছে—একটিকে বলা যায় বর্জনাত্মক আর একটি গ্রহণাত্মক। সংসারের একটা দিককে তিনি বর্জন করেছেন। যা আমাদের কাছে এতকাল আদর্শ বলে মনে হয়েছে, আমাদের চিন্তায় ভাবনায় কর্মে ক্রিয়ায় যাকে মনে করেছি সকলের অনুসরণীয় শ্রদ্ধেয়। তার অনেক কিছুই কবি ক্ষণিকায় বর্জন করেছেন। ক্ষণিকার অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে বর্জনের ঘোষণা।

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

সচেতনভাবে সাধুবুদ্ধি বর্জন করে সহজ সরলতায় প্রবৃত্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবার ঘোষণা এর আগে কখনো শোনা যায়নি। সত্য আছেন ঋষির অপরোক্ষ উপলব্ধিতে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, কবি বলেন—

কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।

'অনবসর' কবিতায় কবির সহজ স্বীকারোক্তি

যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই এমন
সময় যে নেই। সময় যে নেই।

যা চলে যায় তার জন্য কবির বিলাপ নেই। অতীতের জন্য কবি কোনো বন্ধন রাখতে চান না। বন্ধনেই আসক্তি, কিংবা আসক্তিতে বন্ধন। মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে আসক্তির জন্যই। কতকগুলি বস্তুতে মানুষের বিশ্বাস রাখতেই হয়। প্রেম সৌন্দর্য-ঈশ্বর। এই বিশ্বাস অবলম্বনে মানুষ বাঁচে। ক্ষণিকায় কবি সেই অনড় বিশ্বাসের জগৎ থেকে মুক্তি নিয়েছেন। প্রাচীনকালে চার্বাকপন্থীরা তাই করেছে সত্য কিন্তু মহাকাব্যে নাটকে গ... চিরকালই ঘোষিত হয়ে এসেছে অম্লান প্রেম অক্ষয় সত্যের কথাই।

শাস্ত্রের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে কবি বলেন—

পঞ্চাশোর্ধ্বের বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি, বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই চ'লে ভালো।

কবির যুক্তি হচ্ছে—

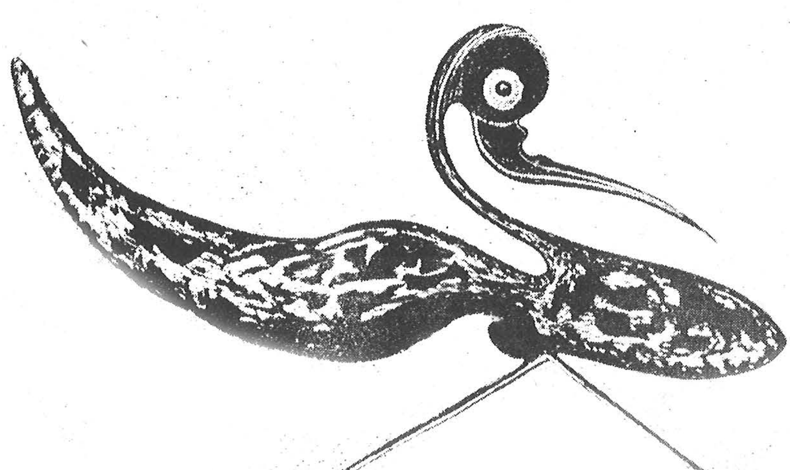
আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র
চালান মামলা মোকদ্দমা;
ফাল্গুন মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে
রাত্রি জেনো সাধ্যসাধন
থাকুন রত কঠিন ব্রতে।

ক্ষণিকায় এমনি করে বর্জন করেছেন প্রথাগত নীতিকে, তার জায়গায় গ্রহণ করে নিয়েছেন জীবনের সহজ সৌন্দর্য ও আনন্দকে তা যদি প্রথাগত নীতির বিরোধী হয়, তো হোক।

কবি যে কবিতায় একান্ত নিজের মনের কথা শুনতে চেয়েছিলেন, একমাত্র বিহারীলাল ছাড়া আর কারো কবিতায় সে কণ্ঠস্বর তিনি পাননি। ক্ষণিকাতে দেখি শুধু নিজের কথাই বলেছেন। এইজন্য ক্ষণিকার কবিতাগুলিতে আমি এবং আমার শব্দ দুটি বারবার ফিরে আসে। একদিকে যেমন তিনি বলেন, কী তিনি চান না, অন্যদিকে তেমনি বলেন কী তিনি চান। তিনি চান ত্রিভুবনের গোপন কথাটি ফুটিয়ে তুলতে। বিদ্যেরত্ন পাড়ায় স্বস্তি বোধ করেন না তিনি, স্বাভাবিক স্বস্তি বোধ করেন শিশুর কলভাষণকে ফুটিয়ে তুলতে, প্রেমিকের হৃদয়গুঞ্জনকে গানে ধরে দিতে। কখনও নিরুপমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন আষাঢ়ের বিবশ দিনের খেয়ালী চপলতার জন্য, কখনও অর্থহীন আনন্দে নববর্ষের মেঘ দেখে বলে ওঠেন— হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে; কখনও একলা বলে কোন অজানা প্রিয়ার নাম জপ করেন; কখনও হৃদয়ভারকে উড়িয়ে দেন হেসে। এমনি করে ক্ষণিকার কবিতায় কবি বারবার নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে নিজের মনের ভাবটিকে মেলে ধরেন কখনও গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে, কখনও শ্রাবণের সজল ছায়ায়, বসন্তের হাওয়ায় আতপ্ত শীতের জড়িমায়।

ক্ষণিকার পরিবেশটির মধ্যেও বাংলার পল্লীর ছায়াস্নিগ্ধতা। ইতিপূর্বে গল্পগুচ্ছের গল্পে বাংলার গ্রামকে দেখেছি। সেই গ্রামই ক্ষণিকার কবিতায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কোকিলের ডাক আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের ঘাট, কলস ভরে বধূদের ঘরে ফেরা, মেঘলা দিনের মাঠে কালো মেয়ের কুটির থেকে বেরিয়ে আসা, অঞ্জনা নদীর ধারে গ্রামটি, তিসির খেত, বাঁশবনের আড়ালে গ্রামের কুটির—ক্ষণিকার কবিতার সুর এবং ছবি আগের কবিতার সুর এবং ছবির সঙ্গে মিলবে না। একই সময়ে লেখা কল্পনা কাব্যের পরিবেশের সঙ্গেও এর মিল নেই। কল্পনায় বৈশাখের বর্ণনা দিতে গিয়েও বাংলাদেশ নয় ধ্যানরত শিবের পৌরাণিক ছবিটিই ফিরে আসে।

ক্ষণিকার পর তিনি লিখলেন নৈবেদ্য। সে তো সম্পূর্ণ আলাদা জাতের কাব্য। যে ত্যাগ বৈরাগ্যকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন ক্ষণিকায়, যে ঈশ্বরভাবুকতার চিহ্নমাত্র নেই ক্ষণিকায় নৈবেদ্যে তারাই গম্ভীর ছন্দে ফিরে এসেছে। ক্ষণিকায় পেয়েছিলাম বাংলার ছবি, নৈবেদ্যে এসেছে অতীত ভারত। আবার খেয়া কাব্যে ঈশ্বরভাবুকতা এসেছে বাংলার খেয়া নদী দিঘি সূর্যাস্ত অন্ধকার রাত বাঁশবনের প্রতীকের সহায়তা নিয়ে। রবীন্দ্রকাব্যের গতি বড়ো বিচিত্র। স্থূলভাবে কাব্যধারার একটা রেখাচিত্র আঁকা যায় বটে, কিন্তু তার মধ্যে থাকে বিস্ময়কর টানাপোড়েন।





সবার চেয়ে চাবার যাহা উৎস থেকে রূপান্তর

পশুপতি শাশমল

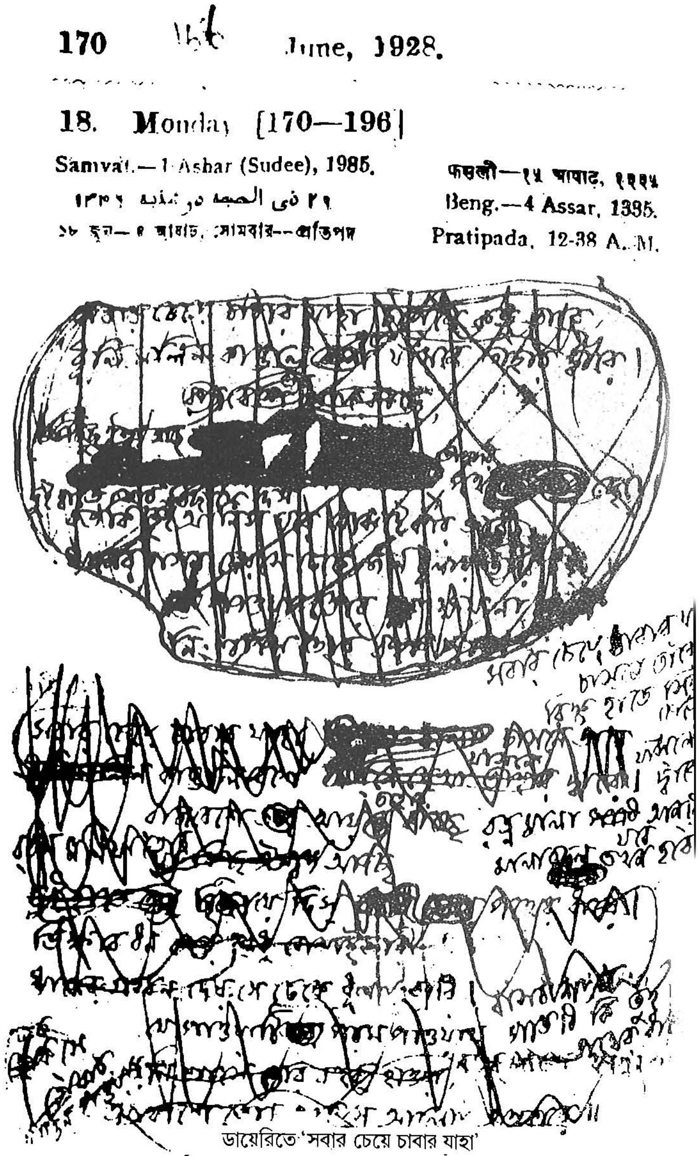
'সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে তারে' ইত্যাদি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ অপ্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা। মিলিয়ে দেখা গেছে, এর সঙ্গে নিকটসাদৃশ্য রয়েছে 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' সূচক সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতের, গীতবিতানে যা গান হিসেবে সংকলিত। শেষের কবিতা উপন্যাসের দশম অধ্যায়ে এই গানকে প্রয়োগ করা হয়েছিল ভিন্ন আকারে ও প্রকারে। উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট অমিতর গদ্যে-পদ্যে মেশানো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি সুদীর্ঘ সংলাপ-রূপের মধ্যে ভেঙে ভেঙে, খানিকটা বক্তৃতা আর আবৃত্তির মিশ্রধর্মী প্রকরণে; তবে গীতবিতানের পাঠ থেকে এর কিছু প্রভেদ আছে, বিশেষত এর শেষাংশের। অপ্রকাশিত 'সবার থেকে চাবার যাহা' রচিত হয় ১৯২৮ সালের একটি ডায়েরিতে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত এই পাণ্ডুলিপির পরিগ্রহণ-সংখ্যা ২৮। পাণ্ডুলিপির মোট চারটি পাতার ছয়টি পৃষ্ঠায় (১৭০-৭১, ১৭৩, ১৭৭-৭৯) কখনো কালিতে কখনো আবার পেন্সিলে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লেখা এবং সংশোধন করা এই রচনার রূপ অন্তত উনিশটি পর্যায়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বিচিত্র পরিণাম লাভ করেছিল, এর ফলে এমন আরো দুটি রচনার উদ্ভব ঘটেছিল যার একটি এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে; তাছাড়াও সেই উনিশটি পর্যায়ের কোন একটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল গীতবিতান ও শেষের কবিতার 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' রচনার আরো দুটি রূপ, এবং তা হয়েছিল অন্য পাণ্ডুলিপিতে।

।।এক।।

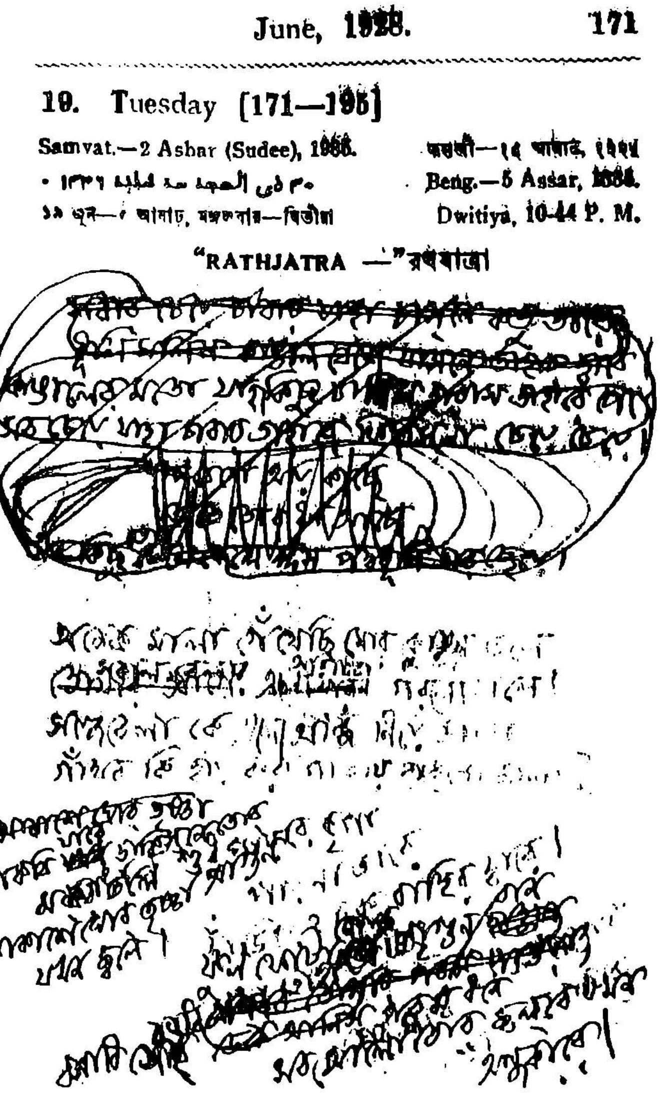
ডায়েরি-পাণ্ডুলিপির ১৭১ পৃষ্ঠায় সূচিত হয়েছিল 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' রচনাটির সৃষ্টি। প্রথমে লেখা হয় মাত্র দুটি ছত্র : 'সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে কভু তারে,/ধূলিমলিন কাঙালবেশে যাসনে তাহার দ্বারে।' চাওয়ার যোগ্য এমন যে বিষয় তার বিবরণ বর্ণনা কিংবা তার স্বরূপ ব্যাখ্যা নয়, চাওয়ার পদ্ধতি হল এই পর্যায়ের পাঠের মূল ভাবনা। তবে পদ্ধতিটি নিষেধাত্মক, প্রার্থীর ধূলিমলিন কাঙাল বেশের জন্যে সেই নিষেধ উচ্চারিত। প্রার্থীর চিত্রকল্প কিছু আনুপুঙ্খিক, এবং তা দীনতাদ্যোতক। ভাবনাকে উপযোগী আশ্রয় দিয়েছে বিশেষ প্রকৃতির ভাষাভঙ্গি আর ছন্দের রূপ ও রীতি। মনঃপূত হয়নি বলে অথবা প্রকারে নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় এ পাঠ কেটে দিয়ে এরই নীচে লেখা হয় পরবর্তী বা দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠ :

কাঙালের মতো যা কিছু চাহিস হারাস তাহারে পেয়ে
সবচেয়ে যাহা চাবার তাহারে ফিরিস না চেয়ে চেয়ে।
রাজবেশে আয় কাছে
যত তোর ধন আছে
সব কিছু ঢেলে ফেলে দিস পথধূলি তার ছেয়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এদের বিশেষ সম্পর্ক। প্রথম পাঠে যে দুটি মাত্র ছত্র ছিল তা দ্বিতীয় পাঠে বিন্যস্ত হয়েছে বিপরীত ক্রমে, কিছু পরিমানে রূপান্তরিত আকারে। দুটি পাঠের শব্দ ও চিত্রকল্পে, এমনকি ভাষাভঙ্গিতে, রয়েছে বিশেষ সাদৃশ্য। ছন্দের বিচারেও এদের আত্মীয়তা লক্ষিত হয়—প্রথম পাঠ দলবৃত্ত অথবা কলাবৃত্ত রীতির, এবং দ্বিতীয় পাঠ বিশুদ্ধ কলাবৃত্তের, তবে এর শেষ ছত্রের প্রথমাংশে পর্বমাত্রায় ত্রুটি রয়ে গেছে যা হয়তো অমনস্কতার ফল; দুটি পাঠেই চরণের রূপ নির্মিত হয়েছে একটি অপূর্ণ পর্বসহ তিনটি পূর্ণ পর্বের সমন্বয়ে। ভাবনার দিক থেকে বলা চলে, প্রথম পাঠের তুলনায় দ্বিতীয় পাঠের আয়তন বৃহত্তর, অন্তর্গত ভাবনাপুঞ্জ বা প্রসঙ্গ তাই এখানে বিস্তারিত। চাওয়ার প্রসঙ্গ দিয়ে দ্বিতীয় পাঠের শুরু, শেষ হয়েছে দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে, এবং তা প্রাধান্য পেয়েছে, অন্তত তার প্রতি রচয়িতার



ডায়েরিতে 'সবার চেয়ে চাবার যাহা'



ডায়েরিতে ‘সবার চেয়ে চাবার যাহা’

প্রবণতা অধিক। ফলে সম্ভাব্য রচনাটি যে কেবল চাওয়া সংক্রান্ত নয়, বরং তা যে অনেক বেশি পরিমাণ দেওয়া সম্পর্কিত, সেই বোধটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। তাছাড়া চাওয়ার অপরিহার্য আনুষঙ্গিক হয়ে উঠছে দেওয়া। এভাবে চাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার প্রসঙ্গ সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে বলে চাওয়ার পদ্ধতিগত প্রথম পাঠের ভাবনা এখানে পেয়েছে দ্বিরায়তনিক মূর্তি। সেই কারণে আগেকার ভাবনা এখানে অনেক আনুপুঙ্খিক। স্বভাবত তা সম্পূর্ণতা অর্জনের অভিমুখী, সেই দিকে ধাবমান।

রচয়িতার প্রবণতাও ছিল সেই দিকে। তার আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় পর্যায়ের পাঠ লক্ষ করলে, যা দ্বিতীয় পাঠের উপর মনোযোগী সংশোধনের পরিণাম, যার প্রধান লক্ষণ হল শেষ ছত্রে আরো দুটি মাত্রা যোগ করে তার ছন্দোরূপগত ত্রুটিমোচন। ভাবনার প্রতি মমতা ছিল বলেই তার রূপায়ণে দেখা দিয়েছিল মনস্কতা। তবু এ পাঠ কেটে বাদ দেওয়া হল শেষ পর্যন্ত, বিকল্পে আগের পৃষ্ঠায় (১৭০) লেখা হল পরবর্তী বা চতুর্থ পর্যায়ের পাঠ ঃ

> সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে কভু তারে
> ধূলিমলিন কাঙালবেশে যাসনে তাহার দ্বারে।
> রাজবেশে আয় কাছে,
> [যত তোর ধন আছে
> ......বিছায়ে দিস পথধূলি তার ছেয়ে।]

আগের তিনটি পাঠের অবলম্বনে এই চতুর্থ পাঠের সৃষ্টি। প্রথম পাঠের সবটুকু অর্থাৎ দুটি ছত্র এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় পাঠের মাঝের দুটি করে হ্রস্বায়ত ছত্র এখানে অবিকল গৃহীত ও পরপর বিন্যস্ত, আর দ্বিতীয়-তৃতীয় পাঠের শেষ ছত্র এখানে সামান্য পরিবর্তিত। তিনটি পাঠের মিশ্রণের ফলে আগেকার পাঠগুলির ভাবনাও এখানে মিশ্ররূপে বর্তমান, তবে ঈষৎ রূপান্তরিত আকারে। এই চতুর্থ পাঠের ভাষাভঙ্গি-শব্দ-চিত্রকল্পও সেই কারণে প্রায় আগের মতো; এর শেষ ছত্রে দ্বিতীয়-তৃতীয় পাঠের কলাবৃত্ত রীতির কিছু প্রভাব থেকে গেলেও এখানকার সমগ্র পাঠরূপে প্রথম পাঠ থেকে পরিত্যক্ত দলবৃত্ত রীতি প্রবলভাবে ফিরে এসেছে। এ ধরনের মিশ্রণের মাধ্যমে রচনার রূপান্তর সাধনের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য হল পূর্বে বর্জিত পাঠরূপের পুনর্গ্রহণ। ইয়েটসের কোনো কোনো প্রখ্যাত কবির পাঠ পরিবর্তন সমীক্ষার কালে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন স্টলওয়ার্দি।

পরবর্তী পঞ্চম পর্যায়ের পাঠে পাওয়া যায় চতুর্থ পর্বের সংশোধিত রূপের সঙ্গে যোজিত আরো চারটি নূতন ছত্র। এবারের রচনার রূপটি এই রকম, যদিও রচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত ঃ

> সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে কভু তারে
> ধূলিমলিন কাঙাল হয়ে যাসনে তাহার দ্বারে।
> রাজবেশে তার আয় রে কাছে,
> যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে
> দুই হাতে তোর বিছায়ে দিস তাহারি পথ ছেয়ে।
>
> কত কি তুই আনিস ঘরে বোঝাই করে ভারী,
> ধ্যানের গগন দেয় সে ঢেকে জীর্ণ ধূলায় তারি।
> যে পাওয়া তোর ক্ষয় না জানে
> নিঃশ্বাসে তোর রহুক প্রাণে

চতুর্থ পর্বের সংশোধনে নির্মিত এই পঞ্চম পাঠে ছন্দের রীতি পরিবর্তিত হয়নি, তবে ছত্রবিশেষের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে; উপযোগী বিকল্প শব্দের প্রয়োগের ফলে ভাবনা এখন অনেক সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছ, দীনতাদ্যোতক প্রাক্তন ভাষাভঙ্গি এখানে আন্তরিকতায় উন্নীত। যোজিত নূতন অংশটি আগেকার সংশোধিত অংশের যথেষ্ট নীচে লেখা হয়েছিল, তাই একে পৃথক দেখায়; এবং তাই উপরের সংশোধিত অংশের পাঁচটি ছত্রকে দেখায় পূর্ণ স্তবকের রূপে, একই কারণে নীচের নূতন ছত্র থেকে অনুরূপ স্তবক নির্মাণের আভাস পাওয়া যায়, যদিও তা পূর্ণতা পায়নি। সেই পূর্ণতা এসেছিল ষষ্ঠ পর্যায়ের পাঠে, যা পঞ্চম পর্যায়ের পাঠ বর্জনের অথচ তারই ভিত্তিতে নূতন করে লেখার পরিণাম। ষষ্ঠ পর্যায়ের পাঠ নিম্নরূপ ঃ

> সবার চেয়ে চাবার যাহা ভিক্ষা-ডালায় চাসনে তারে
> ধূলিমলিন কাঙালবেশে দিসনে দেখা তাহার দ্বারে।
> রাজবেশে তার আয়রে কাছে
> যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে
> দুই হাতে তাই বিছায়ে দিস [......] পথের ধারে।
>
> ভিক্ষার ধন করে শুধু বোঝাই ভারী
> ধ্যানের গগন দেয় সে ঢেকে ধূলায় তারি।
> যে পাওয়া তোর পরম পাওয়া
> নিঃশ্বাসে তোর বহুক হাওয়া,
> আকাশে তোর থাক সে আলোয় অন্ধকারে।।

ষষ্ঠ পর্যায়ে এসে রচনাটি সম্ভবত এই প্রথম অর্জন করল তার গঠনগত পূর্ণতার একটি স্পষ্ট—আকল্প দলবৃত্ত রীতির বিভিন্ন রূপের ছত্র, হ্রস্ব-দীর্ঘ নানা আয়তনের পাঁচ ছত্রের স্তবক, প্রতি স্তবকে ছত্রশেষের মিলবিন্যাসে

ক-ক-খ-খ-ক প্রকারের প্রয়োগ, এবং এই ধরনের মোট দুটি স্তবক—নির্মিতির একটি প্রাকরণিক শৃঙ্খলা এখানে এভাবে স্বীকৃত। তাছাড়া রচনা-শেষের দুটি দাঁড়ি চিহ্ন নির্দেশ করছে রচনার অবয়বগত পূর্ণতা। তবে ভাবনাবিন্যাসে এবং ভাবনার প্রবাহ রক্ষায় এখনো কিছু অস্বস্তি রয়ে গেছে, যদিও পূর্ববর্তী পঞ্চম পাঠের ভাবনাবিন্যাসে কিম্বা ভাবপ্রবাহে যে ব্যাপক অস্বচ্ছতা-জটিলতা ছিল তা বর্তমান ষষ্ঠ পর্যায়ে অনেক সরল ও মসৃণ হয়ে উঠেছে, এবং সেই কারণে কিছু স্থিতিশীলতা পেয়েছে, যেহেতু পরবর্তী আরো অন্তত ছয়টি পর্যায়ে অর্থাৎ দ্বাদশ পর্যায় পর্যন্ত পাঠের অল্পস্বল্প পরিবর্তন করা হলেও এর সমগ্র রূপগত আকল্পকে মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছিল।

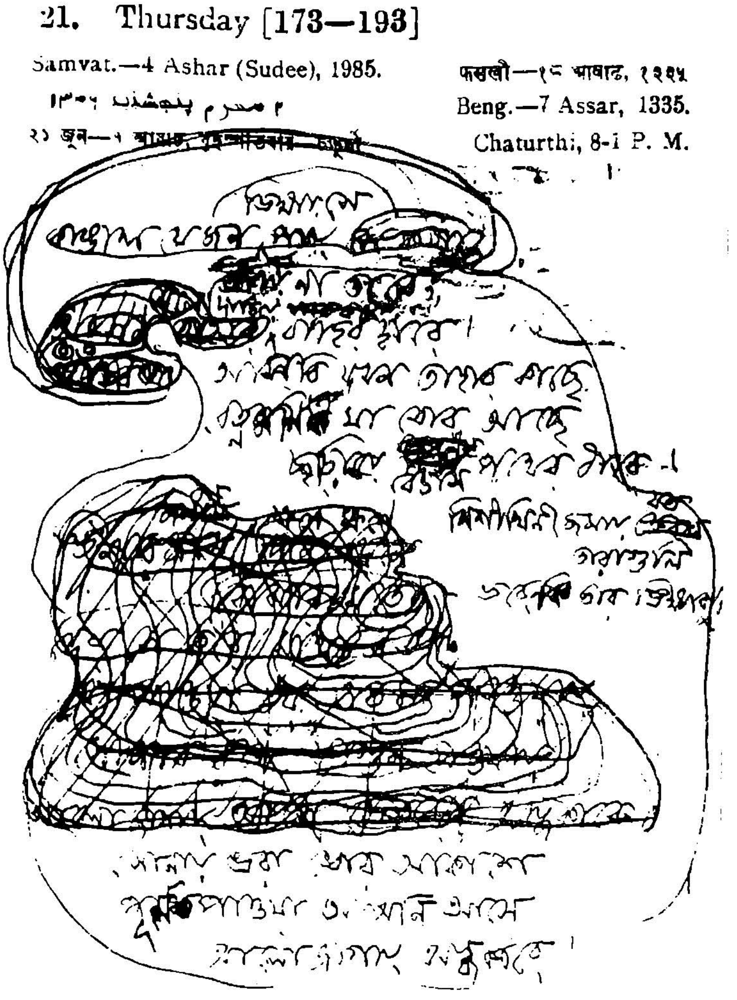
সম্ভবত এই ধরনের নির্দিষ্ট প্রকরণ ও ভাব প্রকাশের স্থিতিশীলতা দানের ফলে ষষ্ঠ পর্যায়ের পর রচয়িতার সৃষ্টির প্রয়াস লাভ করেছিল মৃদু শম। সপ্তম ও অষ্টম পর্যায় পর্যন্ত তা অব্যাহত, এই দুটি পর্যায়ে ভাবনার প্রকাশগত স্বচ্ছতা এবং তার উপযোগী শরীর তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রসাধনের মাধ্যমে রচনার সার্বিক উন্নতি বিধান হল মূল লক্ষ্য। প্রসঙ্গত বলা যায়, ষষ্ঠ পর্যায় পর্যন্ত সমূহ পাঠ লেখা হয়েছিল কালিতে, ষষ্ঠ পাঠ কালিতে সংশোধন করে নির্মাণ করা হয় সপ্তম পাঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম পাঠ পেন্সিলে সংশোধন করে প্রস্তুত করা হয় অষ্টম পাঠ, সংশোধনের কাজে এই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল পেন্সিল। এর পর অব্যবহিত পরবর্তী পৃষ্ঠার (১৭১) নীচের দিকের ফাঁকা জায়গায় পেন্সিলে লেখা হয় রচনার নূতন নূতন অংশ, এবং এভাবে উদ্ভূত হয় নবম পর্যায়ের পাঠ যা আগেকার পাঠগুলির তুলনায় আয়তনে বৃহত্তর ও প্রকাশের দিক থেকে উন্নততর। নবম পাঠে কালিতে ও পেন্সিলে সংশোধন অর্থাৎ বর্জন ও সংযোজন চলতে থাকে, রচনার শরীর নির্মাণ ও ভাবনা বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে উন্নতি বিধানের অভিপ্রায় এবং প্রক্রিয়াও থেমে নেই, ফলে ধারাবাহিকতায় প্রস্তুত হতে থাকে দশম ও একাদশ পর্যায়ের বিভিন্ন পাঠান্তর, যার বিবর্তিত পরিণাম দ্বাদশ পর্যায়ের পাঠ, যেখানে সৃষ্টিকর্মের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ এই ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপির ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় লেখা নবম পর্যায়ের পাঠ আয়তন ও প্রকাশের দিক থেকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, এবং তা নিম্নরূপ ঃ

সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে তারে
[ফরিয়াদি] কাঙালবেশে যাসনে দ্বারে।
রাজবেশে আয় তাহার কাছে
রতনমণি যা তোর আছে
দুই হাতে তাই ছড়ায়ে দিস পথের ধারে।

ভিক্ষার ধন হল শুধু বোঝার মত
[...   ...   .] নত।
যে পাওয়াটি পরম পাওয়া
বহুক সে তোর ফাগুন হাওয়া
আকাশে তোর থাক সে আলোয় অন্ধকারে।।

অনেক মালা গেঁথেছি মোর কাননতলে
তোমার আগে এলো যারা পরলো গলে।
সন্ধেবেলা কে এলো [তার] নিয়ে ডালা
গাঁথব কি হায় ঝরাপাতার শুকনো মালা?
কাঙাল শুধু পায়রে কৃপা পায় না তারে
দাঁড়িয়ে থাকে বাহির দ্বারে।
যাবি যখন তাহার কাছে
[...   ...   ...]

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পাঠের কাঠামো ও রূপ ছিল প্রায় একই, এদের সংশোধিত পাঠের অবলম্বনে গঠিত হয় বর্তমান নবম পাঠের প্রথমাংশ বা

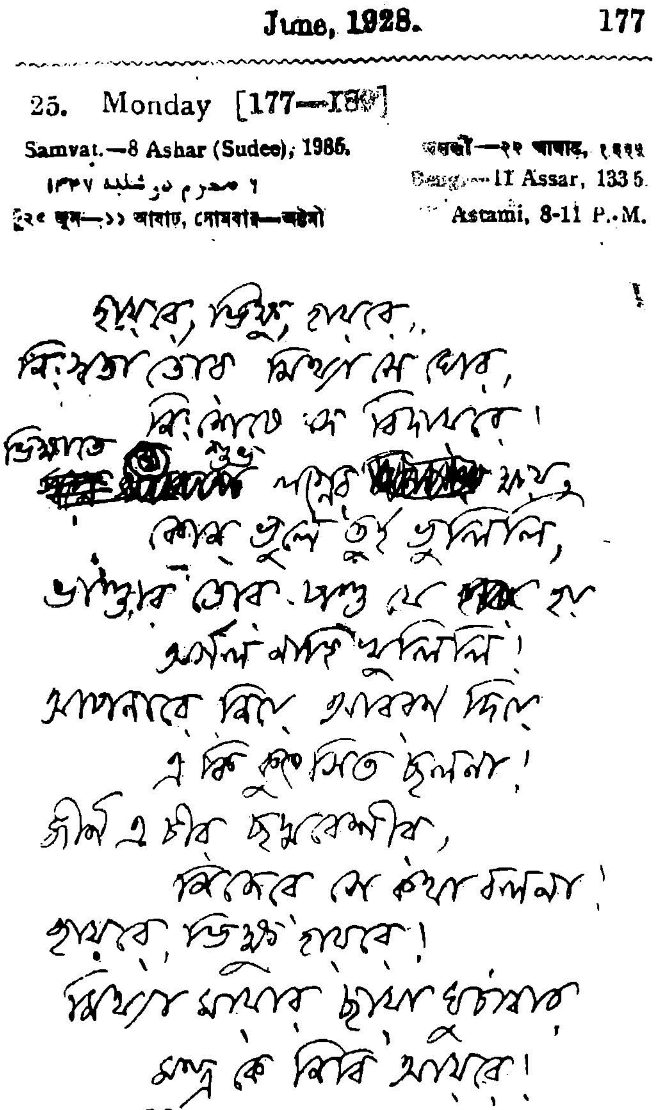


ডায়েরিতে 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়'

প্রথম দুটি স্তবক (১৭০), যার পাঠরূপে এবং ভাবনায় কিছু কিছু বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়; এবং নবম পাঠের শেষাংশে অর্থাৎ 'অনেক মালা গেঁথেছি মোর কাননতলে' ইত্যাদি নূতন নির্মাণের ফল (১৭১), তবে সেই নির্মাণটি পূর্ণতা লাভ করেছিল কিনা বোঝা যায় না, যেহেতু পেন্সিলে লেখা সেই পাঠের উপরেই কালিতে নূতন নূতন পাঠ পরে লেখা হয়েছিল বলে আগের পাঠ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। নবম পাঠে পৌনঃপুনিক সংশোধনের ফলে উদ্ভূত হতে থাকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পাঠ। দ্বাদশ পাঠেই এ রচনার আপাত-সমাপ্তি ঘটে, রচনাটিও পায় আপাত-পূর্ণতা, যা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এর পাঠ নিম্নরূপ ঃ

সবার চেয়ে চাবার যাহা চাসনে তারে
রিক্ত হাতে সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।
রত্নমালা আনবি যবে
মালাবদল তখন হবে,
বাসরশয়ন পাতবি কি তুই পথের ধারে।

অনেক মালা গেঁথেছি মোর কুঞ্জতলে
সকালবেলার অতিথিরা পরলো গলে।
সন্ধেবেলা কে এলো আজ নিয়ে ডালা
গাঁথব কি হায় ঝরাপাতায় শুকনো মালা?



12 ডায়েরিতে 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে'

ডাকবি যারে ডাকিসনে তোর [ঝরনা] তলে
আকাশে ঘোর তৃষ্ণা আগুন যখন জ্বলে।
ফুলফোটানো ফাগুনবনে
বসাবি সেই পরম ধনে
সব আলো তোর জ্বলবে যখন অন্ধকারে।

চাওয়া হল কারণ, পাওয়া তার ফল, আর চাওয়া অনুযায়ী পাওয়া; এভাবে তারা অন্যোন্যনির্ভর, ওতপ্রোত, অন্তত এভাবেই পরস্পরের সম্পর্কিত। দ্বাদশ পাঠ পর্যন্ত চাওয়ার প্রসঙ্গই কেন্দ্রীয় থিম; তা ক্রমিক প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে, চাওয়ার পদ্ধতিও ক্রমশ আনুপুঙ্খিক হয়ে উঠেছে, আর সে পদ্ধতি কেবল যে নিষেধাত্মক তাও নয়, বরং তার সদর্থকতাই আত্যন্তিক। প্রকারভেদে চাওয়ার রূপ দুটিঃ ভিক্ষা এবং দাবি। যে দরিদ্র সে ভিক্ষা চাইতে পারে, রিক্ত হাতে সিক্ত চোখে কৃপা-করুণা প্রার্থনা করে, বিনিময়ে যা পায় তা শূন্যতারই নামান্তর; পক্ষান্তরে পরমকে পেতে হলে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়, যে তা পারে সে ভিক্ষুক নয়, যোগ্য দাবিদার। প্রকৃত প্রাপককে তাই যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে, সেই নির্দেশাত্মক বক্তব্য এই রচনার মর্মমূলে নিহিত, সেই ভাবনা রচনাটির তাৎপর্যগত সত্য। ডায়েরি-পাণ্ডুলিপিতে অন্তত বারোটি পর্যায়ের পাঠগত পরিবর্তন-পরম্পরায় সেই সত্য ক্রমরূপায়িত হয়েছিল, ধীরে ধীরে লাভ করেছিল প্রকাশের বিবর্তনসম্মত পরিণাম।

॥ দুই ॥

পূর্বাপর পাঠ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, উদ্ধৃত দ্বাদশ পর্যায়ের পাঠ থেকে অথবা তার অনুসরণে ও অবলম্বনে উদ্ভূত হয়েছিল অতিশ্রুত 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' রচনাটি। তবে তা হয়েছিল অন্য পাণ্ডুলিপিতে। সে কথা পরে। তার আগে বলা যেতে পারে, নবম থেকে দ্বাদশ-পর্যায়ের পাঠ বা তার অংশবিশেষ বর্তমান ডায়েরি-পাণ্ডুলিপিতেই আরো দুটি রচনাবৃত্তে পরিণত হয়েছিল।

পাণ্ডুলিপির ১৭০ পৃষ্ঠার নীচের অংশে সপ্তম পর্যায়ের পাঠ নির্মাণ করা হয়েছিল কালিতে, তাকে পেন্সিলে ও কালিতে সংশোধন করে প্রস্তুত করা হয় অষ্টম পর্যায়ের পাঠ, তখনো পর্যন্ত রচনাটি ছিল পূর্বস্বীকৃত দলবৃত্ত রীতির হ্রস্ব-দীর্ঘ আয়তনের পাঁচটি করে ছত্রের মোট দুটি পূর্ণ স্তবকের। পরে এদের সব কিছু কালিতে কেটে বাদ দিয়ে অথচ এদেরই অবলম্বনে পৃষ্ঠার ডান দিকের ফাঁকা অংশে কালিতেই লেখা হয় পরবর্তী পর্যায়ের পাঠ, যা একই দলবৃত্ত রীতির হ্রস্ব-দীর্ঘ আয়তনের পাঁচ ছত্রের পূর্ণ স্তবকের হলেও দুই স্তবকের নয়, মাত্র এক স্তবকের, এবং এটুকু হল নবম পর্যায়ের পাঠের প্রথমাংশ; এরই অনুসরণে নবম পাঠের শেষাংশ বা 'অনেক মালা গেঁথেছি মোর কাননতলে' ইত্যাদি পেন্সিলে লেখা হতে থাকে সম্মুখীন বা পরবর্তী ১৭১ পৃষ্ঠার নীচের ফাঁকা জায়গায়। এই শেষাংশের পাঠ পেন্সিলে ও কালিতে সংশোধিত হয়েছিল বারবার। সেই পৌনঃপুনিক সংশোধনের ফলেই যে দ্বাদশ পর্যায় পর্যন্ত পাঠের উদ্ভব ঘটতে থাকে তা আগেই বলা হয়েছে। এখন বলা দরকার এবারের প্রাসঙ্গিক কথা।

নবম পাঠের নবোদ্ভূত এই শেষাংশের (১৭১) একেবারে শেষের কয়েকটি ছত্রে আছে 'কাঙাল শুধু পায় রে কৃপা, পায় না তারে' ইত্যাদি; দশম পাঠ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ পর্যায়ে তা বর্জিত হয়, তার বিকল্পে প্রস্তাবিত হয় নূতন নূতন পাঠ। বর্জিত 'কাঙাল শুধু পায় রে কৃপা' ইত্যাদিকে নিয়ে পাণ্ডুলিপির ১৭৩ পৃষ্ঠায় সূচিত হয় নূতন একটি রচনার সৃষ্টি, সমগ্র পৃষ্ঠা জুড়ে এর অস্তিত্ব, কালিতে লেখা এবং কালিতেই সংশোধন করা, সংশোধনের পরিমাণ যেমন ব্যাপক তেমনি তা সাধিত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে, অন্তত পাঁচটি পর্যায়ে, মূল বা আদি 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' ইত্যাদি সূচক রচনার এ হল ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ পর্যায়ের বিবর্তনসম্মত পরিণাম। সেই সপ্তদশ পর্যায়ের অর্থাৎ বর্তমান নূতন রচনাটির পাণ্ডুলিপিতে গৃহীত সর্বশেষ পাঠ নিম্নরূপঃ

কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়, পায় না তারে;
দাঁড়িয়ে কাটায় বাহির দ্বারে।
আসবি যখন তাহার কাছে
রত্নমণি যা তোর আছে
ছড়িয়ে বেড়াস পথের ধারে।

নিশীথিনী জমায় যত তারাগুলি
ভরে কি তার ভিক্ষাঝুলি?
সোনায় ভরা ভোর আকাশে
পূর্ণ পাওয়া আপনি আসে
আলো জাগায় অন্ধকারে।

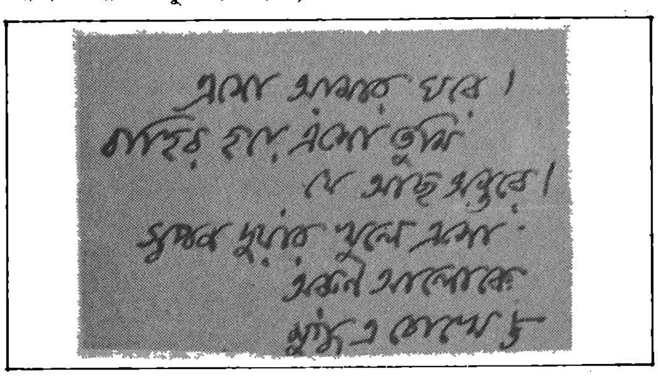
এর ভাবনাও আগেকার পর্যায়গুলির রচনার ভাবনারই অনুরূপ। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে মূল্যবানকে পাওয়া, মহৎ মূল্যের বিনিময়ে পূর্ণকে অর্জন করা—ঐশ্বর্যবান দাবিদার, যে কাঙাল ভিক্ষুক নয়, তার পক্ষে অসামান্য কিছু পাওয়ার রহস্য এরও বাচ্য এবং ব্যঞ্জনা, তবে সে কথা এখানে প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন রূপে বা রূপান্তরে। পূর্বস্বীকৃত দলবৃত্ত রীতির বর্তমান রচনাও পরিচ্ছন্ন দুই স্তবকের যার ছত্রগুলির আয়তন আগেকার রচনার কোনো কোনো ছত্রের তুলনায় হ্রস্বতর, কিন্তু আগের রচনার মতো এখানেও রয়েছে পাঁচ ছত্রের পূর্ণ স্তবক এবং ছত্রের অন্ত্যমিল ক-ক-খ-খ-ক প্রকারের। দুই স্তবকের বর্তমান রচনার দ্বিরায়তনিক

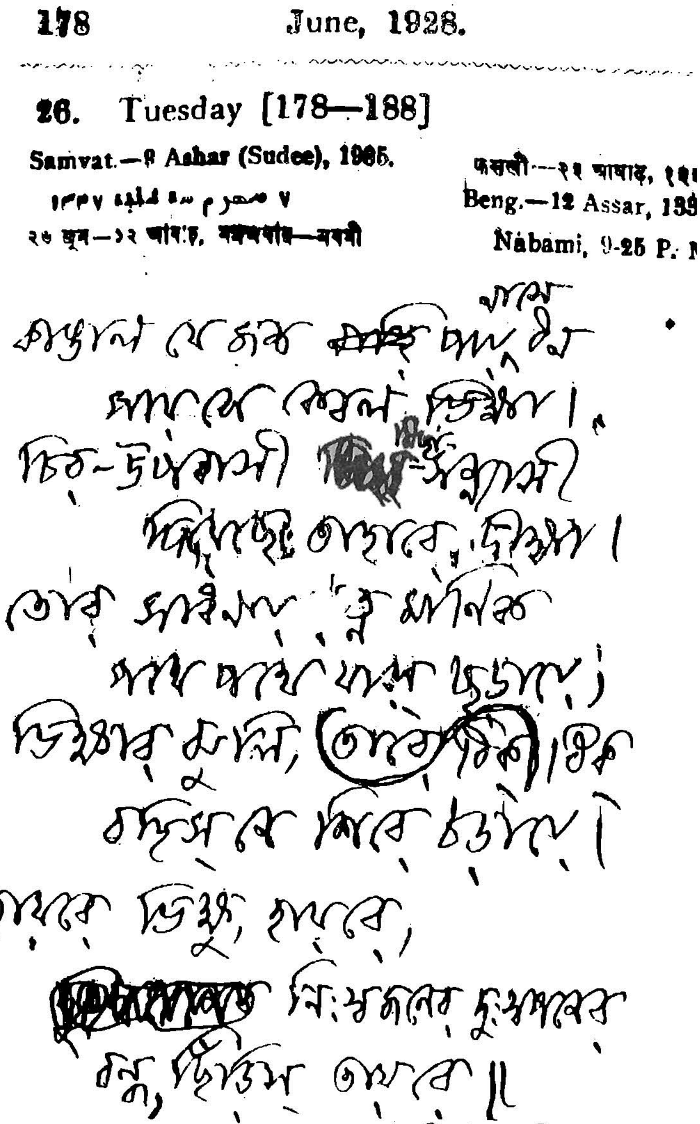
ভাবনাপুঞ্জে চাওয়ার তাৎপর্য হলঃ প্রথমত ভিক্ষা, এবং তা কাঙালের, পুঞ্জটি দীনতার, দীর্ঘ নয়, সংক্ষিপ্ত; অন্য পুঞ্জটি হল যোগ্য প্রাপকের পক্ষে দেওয়ার, চাওয়ার জন্য দেওয়ার এবং পাওয়ার জন্যও দেওয়ার, অবশ্যই তা ঐশ্বর্যবানের, সম্পন্নের, সেই কথাটি এখানে বিস্তারিত ও প্রধান, অস্ত্যর্থক সিদ্ধান্তের আকারেই তা পরিবেশিত, নিষেধের মাধ্যমে নয়, এর চিত্রকল্পও আভাসিত নয়, স্পষ্ট, তবে ভাবনা ঈষৎ জটিলতায় ও দুরূহতায় বিন্যস্ত, ভাবনা তাই সহজ বা অনায়াসবোধ্য নয়, কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন, অথবা এমনও হতে পারে যে দুই স্তবকের ভাবনা-সম্পর্ক সরলীকৃত নয়, দৃষ্টান্ত অলংকারে যেমন হয়। এই সকল সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে বর্তমান রচনাটি তার আগের রচনার অনুরূপ হয়েও ভিন্ন রূপের, একে বলা উচিত রূপান্তরিত অবস্থা। রচনাটি রচয়িতার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, অথচ পাণ্ডুলিপিতে একে স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছিল সযত্নে, বর্জিত পাঠ বা অংশ অলংকৃত মণ্ডনে আচ্ছন্ন করে দিয়ে রক্ষা করা হয়েছিল গৃহীত পাঠ। আরো বিস্ময়কর, তাঁর অন্য একটি বৃহদায়তন কবিতার মধ্যে বর্তমান রচনার রূপান্তর প্রচ্ছন্ন থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যে 'ভিক্ষু' নামক তিন স্তবকের কবিতাটির শেষের দুটি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের সঙ্গে এর নিকটসম্পর্ক আছে, সেখানে একে প্রয়োগ করা হয়েছে রূপান্তরিত আকারে। সম্ভবত এই কারণে বর্তমান রচনাটিকে আর প্রকাশ করা হয়নি।

॥ তিন ॥

পরিশেষ কাব্যে ভিক্ষু নামে সংকলিত কবিতাটির সৃষ্টি হয়েছিল একই ডায়েরি-পাণ্ডুলিপির ১৭৭ থেকে ১৭৯ পৃষ্ঠায়। এখানেও 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে' ইত্যাদি দিয়ে এর শুরু। পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতার বিচারে পূর্বোক্ত 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' (১৭০-৭১) এবং 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' (১৭৩) রচনা দুটি বর্তমান রচনার অনেক আগেকার; তাছাড়া 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' বর্তমান রচনায় গৃহীত হয়েছিল রূপান্তরিত আকারে, সে হিসেবে এরা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত, এবং সে দিক থেকেও বর্তমান রচনা পরবর্তী সময়ের। পাণ্ডুলিপির তিন পৃষ্ঠা জুড়ে কালিতে লেখা হয় বর্তমান রচনার প্রাথমিক পাঠ, এক একটি পৃষ্ঠায় লেখা এক একটি স্তবকের এই রচনা মোট তিন স্তবকের, সেই প্রাথমিক পাঠের উপরে কালিতেই সংশোধন করে নির্মাণ করা হয় এর সর্বশেষ গৃহীত পাঠ; অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে রচনাটি মোট দুটি পর্যায়ের। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এই তিনটি রচনার নির্মাণগত সামগ্রিক ধারাবাহিকতার বিচারে বর্তমান রচনার প্রাথমিক ও সর্বশেষ পাঠ অতএব যথাক্রমে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ পর্যায়ের।

ডায়েরি-পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান রচনার সর্বশেষ পাঠ এবং পরিশেষ কাব্যে সংকলিত ভিক্ষু কবিতার পাঠ একই, কেবল বানানে চিহ্নে বা শব্দগুচ্ছের শরীরী গঠনে সামান্য পার্থক্য আছে, গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ থেকে তাই সেই সর্বশেষ পাঠের পরিচয় পাওয়া যাবে অল্প আয়াসে। কিন্তু এর প্রাথমিক পাঠ একটু অন্য ধরনের, এখানে তা সংকলিত হলঃ



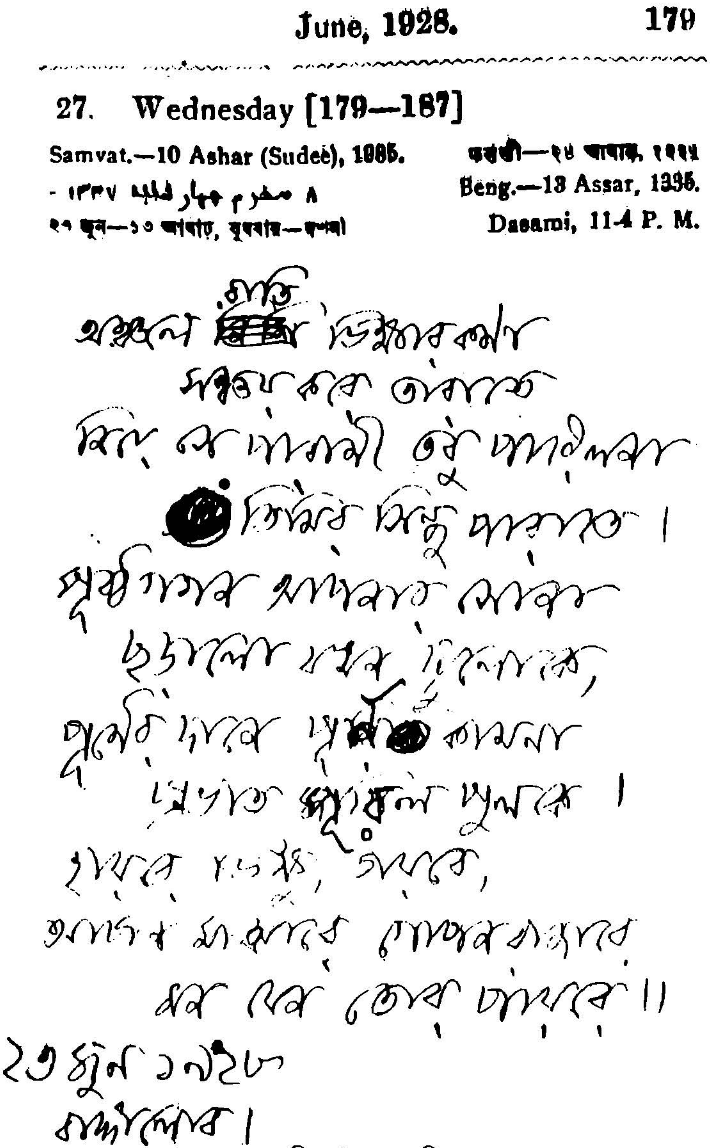


ডায়েরিতে 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে'

হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর, নিঃশেষে দে বিদায় রে।
স্বপ্ন আবেশে লগ্ন মিলায় কোন ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড যে হায় অর্গল নাহি খুলিলি!
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে এ কি কুৎসিত ছলনা!
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর, নিজেরে সে কথা বল না!
হায় রে, ভিক্ষু হায় রে!
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার মন্ত্র কে নিবি আয় রে!

কাঙাল যে জন নাহি পায় ধন পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী চির-সন্ন্যাসী দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্ন মানিক পথে পথে যায় ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, তোর ধিক ধিক বহিসনে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
দুঃস্বপ্নের নিঃস্ব জনের বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে!

অঞ্চলে নিশি, ভিক্ষার কণা সঞ্চয় করে তারাতে
নিয়ে সে পারাণী তবু পারিল না তিমির সিন্ধু পারাতে।
পূর্ব্ব গগন আপনার সোনা ছড়ালে যখন দ্যুলোকে,
পূর্ণের দানে পূরিল কামনা প্রভাত জাগিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপন মাঝারে গোপন রাজারে মন যেন তোর পায় রে॥



ডায়েরিতে 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে'

প্রাথমিক পাঠে লেখা তিন স্তবকের বর্তমান রচনার প্রথম স্তবকটি একেবারে নূতন, বাকি দুটি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক রচিত হয়েছে পাণ্ডুলিপির ১৭৩ পৃষ্ঠায় লেখা 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' ইত্যাদি দুই স্তবকের রচনাটির অবলম্বনে। বর্তমান রচনার ভাবনাও আগেকার 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' এবং 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' এই দুটি রচনার ভাবনার অনুরূপ ; তবে নিঃস্ব ভিক্ষুর ভিক্ষাদৈন্যে এর প্রধান বাচ্য, সম্পন্ন ঐশ্বর্যবানের সুযোগ্য দাবির মহিমা নয়, তাই এখানে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়েছে ভিক্ষুকের ভিক্ষা-প্রবণতার দীনতা সম্পর্কে তীব্র ও প্রান্তিক বিরূপতা, এ হল মূলত নঞর্থক রচনা, সদর্থক ভাবনা বা তার পুষ্ট এখানে নেই বললেও চলে, রচনার শেষাংশে 'পূর্ণের দানে পূরিল কামনা' ইত্যাদিতে সেই সদর্থক ভাবনা কেবল সূত্রাকারে উক্ত, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার আকৃতি প্রায় উহ্য। প্রকরণের দিক থেকে বলা যায়, অনেক আগেকার বা দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠের পর এ পর্যন্ত পরিত্যক্ত কলাবৃত্ত রীতি বর্তমান রচনার ছন্দে পুনর্গৃহীত। ছন্দোরূপেও স্বাতন্ত্র্য প্রবল ঃ প্রায় প্রতিটি চরণ সমপার্বিক ও সমমাত্রিক, অর্থাৎ সমান আয়তনের, এবং এ ধরনের পরপর দুটি চরণে আছে অন্ত্যমিল। আগেকার দুটি রচনার, 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' এবং 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' ইত্যাদির, সঙ্গে বর্তমান রচনার ভাবনা ও প্রকরণের এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণে একেও অভিহিত করা যায় মূলের অন্য রূপ বা রূপান্তর হিসেবে।

আগেকার দুটি রচনা নির্মাণের স্থান ও কাল পাণ্ডুলিপিতে নির্দেশিত হয়নি। তবে বর্তমান রচনার শেষে লেখা রয়েছে '২৩ জুন ১৯২৮ বাঙ্গালোর', এটুকু এর নির্মাণের কাল ও স্থান। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার অনুক্রম এবং এই তিনটি রচনার পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের নির্মাণগত ধারাবাহিকতার সূত্রে ধরে নিতে হয়, আগের দুটি রচনাও ১৯২৮ সালের ২৩ জুনে অথবা তার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল, তার পরে নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এর মাত্র দুদিন পরে অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ২৫ জুনে বাঙ্গালোরেই ব্যালাব্রুয়িতে সমাপ্ত হয়েছিল শেষের কবিতা উপন্যাসের প্রাথমিক পাঠ রচনা, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে তা জানা যায় ; আরো কয়েকটি রচনাও এদের সমসাময়িক এবং সমস্থানিক। 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' ইত্যাদির সঙ্গে এদের আছে গভীর বা নিকটপ্রত্যক্ষ, বা পরোক্ষ সম্পর্ক।

॥ চার ॥

একই ডায়েরি-পাণ্ডুলিপির ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় প্রথমে রচিত হয় 'সবার চেয়ে চাবার যাহা', তার শেষাংশ নিয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠায় রচিত হয় 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়', এবং প্রধানত এরই অনুসরণে ও অবলম্বনে ১৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায় রচিত হয় 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে'; অর্থাৎ 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' থেকে উদ্ভূত হয়েছিল দুটি নূতন রচনা, এবং তা হয়েছিল সেই ডায়েরি-পাণ্ডুলিপিতেই। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' থেকে সৃষ্ট হয়েছিল অন্তত আরো একটি রচনা যার সূচক ছত্র 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা'। এর সৃষ্টি হয় অন্য পাণ্ডুলিপিতে। এই রচনার দুটি মুদ্রিত পাঠ প্রচলিত আছে, একটি শেষের কবিতার এবং অন্যটি গীতবিতানের ; বলাই বাহুল্য যে দুটি পাঠে রূপগত ভিন্নতা রয়েছে। গীতবিতান-পাঠের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি ; পক্ষান্তরে শেষের কবিতার যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার সবগুলির মধ্যেই 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক, শেষের কবিতায় প্রযুক্ত বেশ কয়েকটি কবিতার উৎস-পাণ্ডুলিপি হল উক্ত ডায়েরিটি ; ডায়েরিতে রচনার পর সেই সকল কবিতা বা তার অংশবিশেষকে অবিকল বা রূপান্তরিত আকারে, সম্পূর্ণরূপে অথবা ভেঙে ভেঙে ও প্রাসঙ্গিক গদ্যাংশের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, উপন্যাসের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেই প্রয়োগ করা হয় এমন একটি কবিতা যার উৎস ছিল উক্ত ডায়েরিতে নির্মিত 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' ইত্যাদির শেষতম বা দ্বাদশ পর্যায়ের পাঠ, যা পরবর্তী উপন্যাস-পাণ্ডুলিপিগুলিতে পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত অর্জন করেছিল শেষের কবিতা গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে পরিবেশিত 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদির রূপ, যার সঙ্গে কিছু প্রভেদ সত্ত্বেও প্রবল সাদৃশ্য এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে গীতবিতানের অন্তর্গত 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' সূচক গানটির।

১৯২৮ সালের গ্রীষ্মে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শেষের কবিতা, সমগ্র উপন্যাসের প্রাথমিক পাঠ লেখা শেষ হয়েছিল বাঙ্গালোরের ব্যালাব্রুয়িতে ১৯২৮ সালের ২৫ জুনে, পরবর্তী সময়ে সেই প্রাথমিক পাঠ পরিবর্তিত হতে থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে। শেষের কবিতা নির্মাণের চারটি পর্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত ; তার মধ্যে দুটি আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় (১৩৭ এবং ২৩৬), বাকি দুটি আছে বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী শ্রীমতী রানী চন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহে (১৫৬ এবং ১৫৭)। সমগ্র উপন্যাসের পাঠ ও রূপের অভিব্যক্তির দিক থেকে এই চারটি পাণ্ডুলিপির পর্যায়ক্রম হলঃ ১৫৭>১৫৬>২৩৬>১৩৭ ; অর্থাৎ প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি চারটির মধ্যে চন্দ-১৫৭ হল সর্বপ্রাচীন এবং ভবন-১৩৭ সর্বাধুনিক পর্যায়ের। সর্বপ্রাচীন ১৫৭ পাণ্ডুলিপির ১২-২০ পাতার প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে লেখা হয়েছিল সেই পর্যায়ের সমগ্র উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়, যা পরবর্তী পর্যায়ের

পাণ্ডুলিপিগুলি সহ প্রবাসী পত্রিকা এবং শেষের কবিতা গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কালক্রমে পরিণত হয়েছে প্রচলিত গ্রন্থ-রূপের নবম-দশম অধ্যায়। উক্ত সর্বপ্রাচীন ১৫৭ পাণ্ডুলিপির ১৭ পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রাথমিক পাঠের অংশবিশেষের সঙ্গে প্রচলিত গ্রন্থ-রূপের দশম অধ্যায়ের অন্তর্গত বর্তমান 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' রচনা ও তার সংশ্লিষ্ট গদ্যাংশের নির্মিতিগত সম্পর্ক আছে। কিন্তু ১৫৭ পাণ্ডুলিপির ১৭ পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা প্রাথমিক পাঠে 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ছিল না, সেই প্রাথমিক পাঠ সংশোধনের উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক একটু অংশ কেটে বাদ দিয়ে তার বিকল্পে যে নূতন পাঠ পূর্ববর্তী ১৬ পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখে এখানে সংযোজন করা হয় তার মধ্যেই 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়েছিল; এবং এভাবে নির্মিত হয়েছিল উক্ত প্রাসঙ্গিক অংশটির সর্বশেষ পাঠ, অবশ্যই তা ১৫৭ পাণ্ডুলিপির পর্যায়ে। লাবণ্যর উপস্থিতিতে অমিত এবং যোগমায়ার কথোপকথনের আঙ্গিকে নির্মিত এই সর্বশেষ পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা ?"

"নিজের প্রয়োজনের জন্যেই। ঐশ্বর্য্য দিয়েই আমরা ঐশ্বর্য্য দাবী করি, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্ব্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্যদেবীরা জাগিয়েচেন ঐশ্বর্য্য, আর মাসিমারা এনেচেন আশীর্ব্বাদ। আমার রুক্ষ ভাষায় কথাটা ঠিক মানাচ্চে না তাই মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে না। কবিকে ডাকতে হোলো ছন্দে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখা ভালো, লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়।

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাসনে তারে,—
সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।
রত্নমালা আনবি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তুই বাসরশয়ন
শূণ্য ধূলায় পথের ধারে।।

পাতবার নেই কিছু তো পাতবো কি মাসী ? এই ভিজে খবর কাগজগুলো ! আজকালকার সম্পাদকী কালীর দাগকে ভয় করি।

ডাকবি যারে ডাকিসনে তোর
দৈন্যদারুণ মরুর তলে
তৃষ্ণা আগুন যেথায় জ্বলে।
পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্যধনে,
লক্ষ প্রদীপ জ্বলবে যখন
গর্ব্ব নীরব অন্ধকারে।।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর তপস্যা। এই কুটীরে তার কঠোর আয়োজন আছে, কিন্তু জগতে সব নারীই তো মাসি নয়।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্য্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে। তোমার সে সাধনাও ভিজে খবরের কাগজে ঢাকা পড়বে না। বর পাইনি বলে নিজেকে ভোলাচ্চ, মনে মনে নিশ্চয় জানো যে, পেয়েছ।"

উদ্ধৃতির অন্তর্গত অমিতর সংলাপটি গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত। এর পদ্যাংশটুকু পৃথক দুটি ভাগে বিন্যস্ত, ভাগ দুটি যেন সমায়ত ও সমরূপী দুটি পৃথক পৃথক পূর্ণ স্তবকের, এবং দুটি স্তবক মিলে যেন একটি কবিতা। এভাবে দেখলে এর যে সমগ্র রূপটি পাওয়া যায় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক লক্ষিত হয় ডায়েরিতে নির্মিত দ্বাদশ পর্যায়ের 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' সূচক স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনাটির, তুলনায় ডায়েরির অন্য দুটি অর্থাৎ 'কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়' এবং 'হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে' সূচক রচনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ততো ঘনিষ্ঠ নয়। তাছাড়া মিলিয়ে পড়লেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই দ্বাদশ পর্যায়ের 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' ইত্যাদির যথাক্রমে প্রথমাংশ এবং শেষাংশের অবলম্বনে ও অনুসরণে বর্তমান 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদির দুটি স্তবক নির্মিত হয়েছিল, এতোই এদের পাঠগত রূপগত এবং ভাবনাগত মিল। আরো প্রমাণ আছেঃ ১৫৭ পাণ্ডুলিপির ১৭ পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা উপন্যাসের প্রাথমিক পাঠ সংশোধনের কালে যে নূতন পাঠ সংযোজিত হয়েছিল তার প্রাথমিক রূপে প্রবর্তিত পদ্যাংশটি সূচিত হয় 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' ইত্যাদি দিয়ে এবং তারই সংশোধনে উদ্ভূত হয় বর্তমান 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদি। তাই অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নিতেই হয়, ডায়েরি-পাণ্ডুলিপির দ্বাদশ পর্যায়ের 'সবার চেয়ে চাবার যাহা' সূচক স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনাটিরই অবলম্বনে রচিত হয়েছিল শেষের কবিতার বর্তমান 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' ইত্যাদি সূচক দুই স্তবকের কবিতা, এবং এ রচনাও তাই সেই মূলেরই রূপান্তরবিশেষ। নির্মাণের ধারাবাহিকতার কথা মনে রেখে প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গীতবিতানের 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' নিঃসন্দেহে আরো পরবর্তী রচনা, এবং উক্ত ডায়েরি বা শেষের কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতেই তার সৃষ্টি হয়েছিল; আর শেষের কবিতার 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' থেকে সেই রচনার গীতবিতান-পাঠরূপের প্রভেদ রয়েছে, বিশেষত শেষের অংশে, তাই গীতবিতান-পাঠও একটি রূপান্তর বলে বিবেচিত হতে পারে।

শেষের কবিতা গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আছে, উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট অমিত যে সময় 'তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল', যেহেতু 'সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো', যেদিন 'নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল' যা প্রকাশ না করে থাকতে পারছিল না সে, যখন 'তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে'—সেই সময়ের এক বর্ষার দিনে লাবণ্যকে সামনে রেখে যোগমায়াকে অমিত শুনিয়েছিল তার জীবনের একটি তৎকালীন উপলব্ধিঃ 'ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্ব্বাদ।' এর শেষেরটি হল জীবনের প্রথম সাধনা, যাকে অমিত চিহ্নিত করেছে 'মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা' বলে; এবং এর আগেরটি হল দ্বিতীয় সাধনা, যোগমায়ার ভাষায়ঃ 'জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা।' উপন্যাসের এই দশম অধ্যায়ের শিরোনামও 'দ্বিতীয় সাধনা', ঐশ্বর্য দিয়ে ঐশ্বর্যের দাবি এবং ঐশ্বর্যের তপস্যার প্রসঙ্গ অতএব এখানে প্রধান। এই প্রধান প্রসঙ্গটি পরিবেশিত হয়েছিল অমিতর নিজস্ব গদ্যে-পদ্যে মেশানো এমন এক সংলাপের আকারে যার অন্তর্গত হয়ে আছে শেষের কবিতার 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা', যাকে এবার বলা যেতে পারে অমিতর আত্মজৈবনিক বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা ও অনুভব, তার অস্তিত্বের গভীরে নবজাত কোনো মূল্যের উপলব্ধি ও প্রত্যয়, যাকে কবিতায় প্রকাশ করা সে সংগত বলে মনে করেছিল এই কারণে যে কবিতা 'ক্রিটিসিজ্‌ম অফ লাইফ' নয়, তা প্রকৃতপক্ষে 'লাইফস কমেন্টারি ইন ভারস' যেহেতু। ফলে তাৎপর্যের এক নূতনতর মাত্রা লাভ করে ভিন্নতর আয়তনে রূপান্তরিত হয়েছিল শেষের কবিতার 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা'। গীতবিতানের 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা' কিন্তু অবিকল তেমন নয়, তা একটি স্বয়ংনির্ভর গান, শেষের কবিতার অমিতর ব্যক্তিগত ভাবনা-নিরপেক্ষ অথচ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রত্যয় সংবলিত রচনা, যার পাঠগত স্বাতন্ত্র্য হয়তো সেই কারণেও।

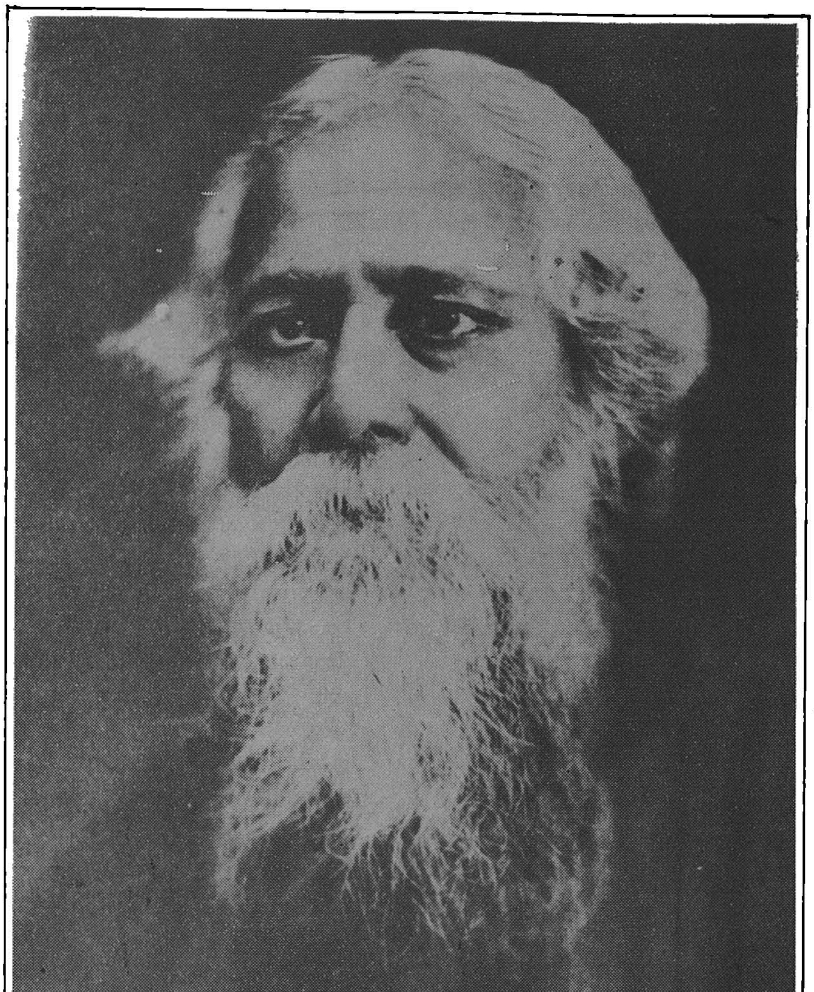
অবলম্বিতঃ রবীন্দ্রভবন সংগৃহীত ২৮, ১৩৭ ও ২৩৬ এবং রানী চন্দ সংগৃহীত ১৫৬ ও ১৫৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি; শেষের কবিতা, বিশ্বভারতীঃ ১৩৮৩; গীতবিতানঃ অখণ্ডসূচিসহ একত্র, বিশ্বভারতীঃ ১৩৬৭;
Jon Stallworthy, Between the Lines: W.B. Yeats's Poetry in the Making, Oxford: 1963.

কৃতজ্ঞতাঃ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন; শ্রীমতী রানী চন্দ।



রবীন্দ্রনাথ ও নগর কলকাতা

কৃষ্ণ ধর



কলকাতা শহর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নানা রঙের প্রলেপ দিয়েছে। তাঁর শৈশবে শহরকে তিনি দেখতেন বিস্ময়ের জানালা দিয়ে। শহরটার চেহারা তখন অন্যরকম ছিল। "চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী," "আরো দূরে দেখা যাইত, তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব দিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে।"

বালক বয়সে "সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া "চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস হইয়া যাইত।"

একটা শহর স্বপ্নের ডানা মেলে সেদিন তার বিষণ্ণ বিস্মিত চোখের সামনে মায়াবী আলোতে দেখা দিয়েছিল। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ এই শহরেই। সদর স্ট্রীটের বাড়ি থেকে দেখা এক পরমাশ্চর্য সূর্যোদয় কীভাবে কাব্যস্রোতস্বিনীর স্বপ্নভঙ্গ করেছিল তার কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন।

তবে সামগ্রিকভাবে এই মহানগরীর চরিত্র তেমনভাবে ফোটাবার চেষ্টা তিনি করেন নি। তাঁর সৃষ্টির পশ্চাদভূমি হিসেবেই কাজ করেছে কলকাতা প্রয়োজনবোধে।

পলাতকা কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্যে কলকাতার অনেক টুকরো ছবি, তার জীবনের আনন্দ-বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

মুক্তি কবিতার সেই রোগাক্লিষ্ট মেয়েটি যে ন'বছর বয়সে বধূ হয়ে এসেছিল একটি নাগরিক পরিবারে। রোগশয্যায় শুয়ে সে মিনতি করত—

ডাক্তারে যা বলে বলুক না কো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিয়রে ওই জানলা দুটো—গায়ে লাগুক হাওয়া।

শহরের গলিতে রৌদ্রের কার্পণ্য, রুদ্ধগৃহে বন্দিনী নারী যার বাইশ বছরেই সব স্বপ্নের পরিসমাপ্তি হতে চলেছে তার এক অশ্রুসজল চিত্র এতে আমরা পাই।

মায়ের সম্মান কবিতাতেও কলকাতার বনেদিয়ানার আভাস মেলে এই বর্ণনায়

"দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে ছিল চাকর দাসী
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি"

পলাতকা-তেই ছিন্নপত্র নামে একটি কবিতা আছে। এক নাগরিক কর্মব্যস্ত মানুষ নিজের মুখে যে-বর্ণনা দিচ্ছে তাতে কলকাতার নগর-জীবনের এক পাবলিকম্যানের ছবি স্পষ্টতর হয়:

"তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ
বীডনকুঞ্জে মিটিং হলে আমি হতেম বক্তা
রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা।
যুদ্ধ হত সেনেট-সিন্ডিকেটে
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।

এই নাগরিকব্যস্ত জীবনের ফাঁকে একদিন হঠাৎ তার মনে পড়েছিল ছোটবেলায় সখী মনোরমার কথা। 'মনুরে কি গেছ ভুলে'—শুধু এই কথার উত্তর কোনো বর্ণমালার অক্ষরে তার পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব হবে না। কলকাতার নাগরিক অস্তিত্বে গ্রামজীবনের স্মৃতিধূসরতার এক বেদনাময় ছবি ফোটানো হয়েছে।

পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের বালক এই নগরের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। তার চোখ দিয়ে আমরা কলকাতাকে দেখি

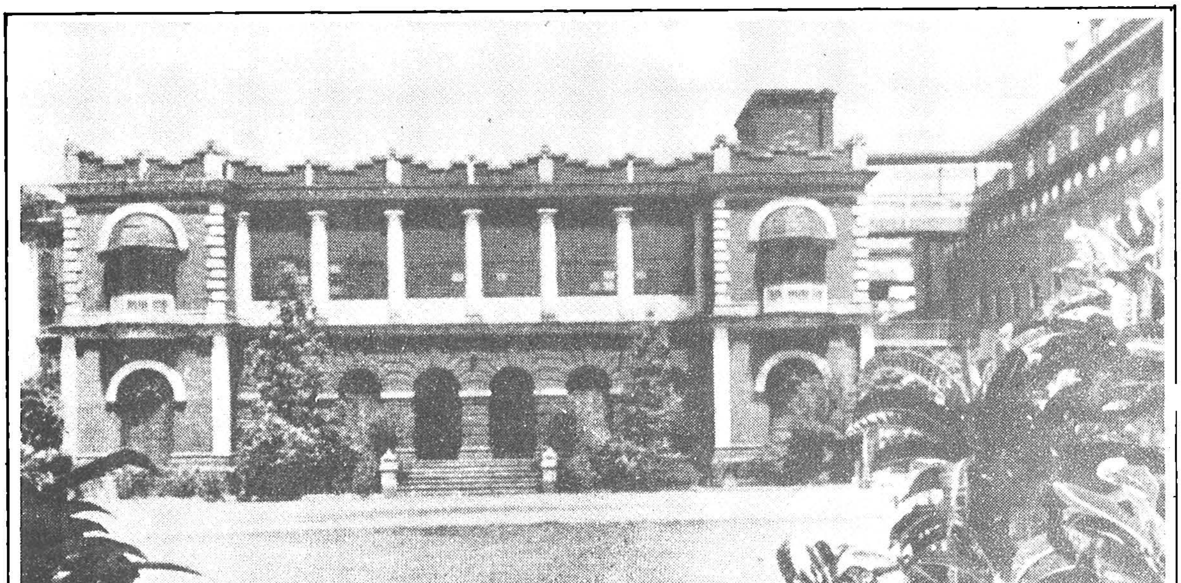
বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুই পহরে
দ্বারের' পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ভেসে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।

জোড়াসাঁকোর সেই বালকের অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া আমাদের অনুভবে তখন প্রসারিত হয়।

সাথী কবিতার মধ্যেও রয়েছে নগরের স্মৃতিকাতরতা যা কলকাতার ছবি, ধ্বনি, রঙ আমাদের চেনায়।

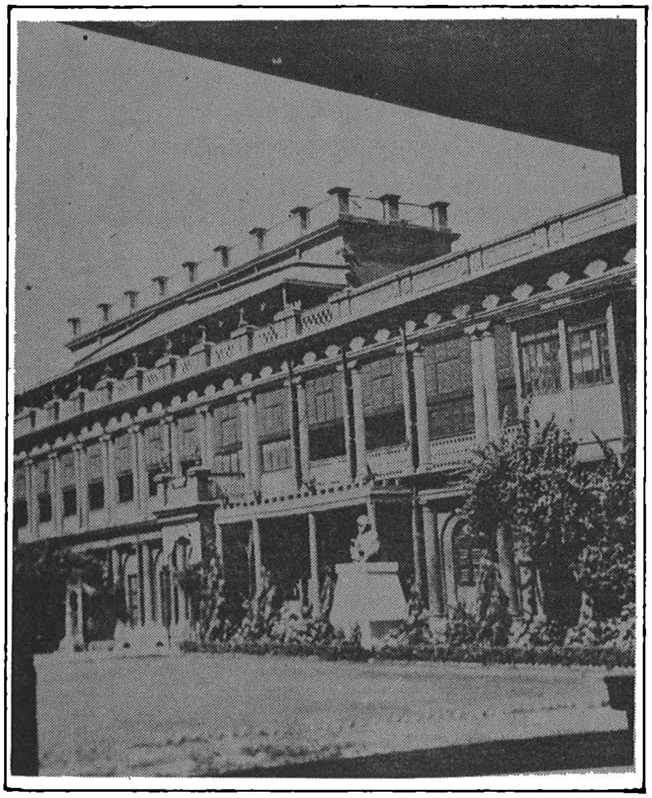
দূরে থেকে মাঝে-মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।

পুনশ্চ-র একটা কবিতা 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি'—তার একটা অংশে আমরা কলকাতার নগরসন্ধ্যার একটা শব্দচিত্র পাই। এই ছবির ফ্রেম আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তবু উত্তর ও মধ্য কলকাতার পরিচিত গলি দিয়ে যেতে যেতে হয়তো বা এখনও পথচারীর চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথের দেখা কলকাতার সেই সন্ধ্যার ছবি ভেসে উঠবে:



বিচিত্রা ভবনের বারান্দা

ছবি: অশোক ঘোষ



জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি *ছবি ঃ অশোক ঘোষ*

তখন সন্ধ্যা সাতটা
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির একতলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
  কৈলেস সরকার
আর তালপাতার পাখার বাতাস চলছে ডান হাতে
  [redacted]হারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।

এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের চেনা কলকাতার। এতে নগরের মানুষের জীবনজীবিকা ও শ্রেণীবিন্যাসের রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে বড় চমৎকারভাবে। আমরা সেই বিখ্যাত কবিতা ক্যামেলিয়ার কথাই মনে করতে পারি এ প্রসঙ্গে। কলকাতার আধুনিকতার হাওয়া তখন বেশ ফুরফুরে। দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি মেয়েকে কলকাতার মেয়ে বলেই যাকে চেনা যায় :

নাম তার কমলা
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়

এ ছবি তো হামেশাই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চোখেও তা পড়েছিল। তারই নিখুঁত বর্ণনা করেন তিনি তাঁর কবিতায়। অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত হরিপদ কেরানিরা কীভাবে জীবনযাপন করে তার ছবি আঁকা হয়েছে কবির হাতে এক আশ্চর্য রঙের তুলিতে।

গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি
  মাছের কানকা
মরা বেড়ালের ছানা
  ছাইপাঁশ আরও কত কী যে

আমরা কিনু গোয়ালার গলিকে চিনি। কলকাতাকে এই গলি দিয়ে একভাবে চেনা যায় যার পরিবর্তন হয়তো বা এখনো বেশি হয় নি। নগর চরিত্রের এই আবহমানতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি।

রাজধানী কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। তার ইঁটকাঠের অরণ্য কবির দৃষ্টিতে নিষ্করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে বার বার। তিনি আপাদমস্তক নাগরিক হলেও নগরজীবনের কৃত্রিমতা তাঁকে বেদনার্ত করত। মানসী-র বধূ কলকাতাকে দেখছে অন্য চোখে। কলকাতা তার কাছে কোনো স্বপ্নের চিত্রকল্প নয়।

হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
  ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।



দক্ষিণের বারান্দা *ছবি ঃ অশোক ঘোষ*

এই ব্যাকুলতা ও বিপন্নতা ছড়ানো আছে তাঁর কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে নগরের সম্পর্ক চিত্রণেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বিপ্রতীপ অবস্থানের।

গল্পগুচ্ছের 'ছুটি' গল্পে ফটিকের যে নিষ্করুণ মৃত্যু তার পেছনে রয়েছে মুক্ত প্রকৃতির সন্তান এক বালকের সঙ্গে নাগরিক স্নেহহীন পরিবেশের অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিরোধ। কলকাতার নগরজীবনের অন্যন্তরের দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যহীনতা রয়েছে 'মানভঞ্জন' গল্পে। স্বামী গোপীনাথের থিয়েটার আসক্তি ও নটীপ্রীতির যে ছবি এতে আছে তা কলকাতার অবক্ষয়ী সমাজের এক বিকৃত রুচির। স্ত্রী গিরিবালা নিজে নটী হয়ে সেই অনাদর ও উপেক্ষার চরম প্রতিশোধ নেয়। মাষ্টারমশায় গল্পে রাত্রির কলকাতার এক খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় :

"রাত্রি প্রায় দুটো। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুরিগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে আসিল।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নরনারীরা প্রধানত কলকাতার। নগরজীবনের প্রেক্ষাপটেই তাদের জীবনদ্বন্দ্বের ও মাধুর্যের সৃজন। গোরা উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে ভারতবর্ষ ও সংস্কৃতির মূল তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। কলকাতার এক সূর্যকরোজ্জ্বল সকালবেলার বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। এটাও যেন প্রতীকী। নবজীবনের নতুন মূল্যবোধের ধাত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মহানগরী কলকাতাকে।

"শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরের উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।"

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যে বিপুল জাগরণের পালা চলেছিল গোরা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তারই উপলব্ধিজাত। কলকাতা এখানে একটি প্রতীকী শহরের মর্যাদা পেয়েছে। কলকাতা ছাড়া অন্য কোনো শহরে এই দ্বন্দ্বের রূপটি এমনিভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না। কারণ গোরার বিরোধ, বিশ্বাস ও উপলব্ধির যে বিবর্তন তার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এমন একটি মানব গোষ্ঠীর যার ধাত্রীভূমি হিসেবে তখন কাজ করছিল কলকাতা শহর।

এ সবই কলকাতার ভিতরের কথা। কলকাতা শহরের বাইরের ছবি যখনই তিনি এঁকেছেন তার রুক্ষকাঠিন্য যেন বেশি চোখে পড়েছে তাঁর। তাই শহরের বর্ণনা দেবার সময় তিনি প্রকৃতির কোনো একটা দিনকে শব্দের আলপনায় তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এই শহরেই শুরু এবং তারই প্রতিভূ ছিলেন পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী। পরেশবাবুকে সম্বোধন করে গোরার উক্তি: 'আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

রেণেশাসের মানুষের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। গোরার উত্তরণে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। চোখের বালি, চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, নৌকাডুবি উপন্যাসের মধ্যে কলকাতার এই প্রেক্ষাপট বিস্তৃত। তিনি এই শহরকে দেখেছেন, তার নাড়ীনক্ষত্রের গূঢ় সমাচার তিনি আমাদের দিয়েছেন কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নয়, একজন কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে। তার এই বিশ্লেষণে একটা মহানগরীর বিপুল গভীর বিচিত্র আনন্দ-বেদনা, অস্তিত্বের সংগ্রাম ও তার মানুষ-মানুষীর হৃদয়ের আর্তি ফুটে উঠেছে।



এইঘরে রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে



রবীন্দ্রনাথ ও ছন্দ-সংহতিসূত্র

রামবহাল তেওয়ারী

প্রকৃত কবি আজন্ম সুন্দরের পূজারী—ভাবুক এবং রূপকারও। কবির প্রাণে চিরকাল ধ্বনিত হয় 'সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে'র সুমধুর বাঁশি। তাঁর যথোচিত প্রকাশ সম্ভব হ'লে অভিনবতা ও বৈচিত্র্যের-সীমা-পরিসীমা থাকে না। বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে কবিচিত্ত সহজ প্রাণের প্রবল টানে 'সুন্দরের' আবাহন গেয়ে ওঠে—

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে।—গীতাঞ্জলি-৭

একথা যে কোন ভাষার প্রকৃত কবির পক্ষেই প্রযোজ্য। সুতরাং প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে প্রতিদিন যে অসংখ্য ভাব ও বহু বিচিত্র রূপের অনুভূতি জেগেছে তা অবলীলায় শিল্পিত এবং অজস্রভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাঁর এই অভিব্যক্তিদানের প্রেরণা এসেছে ভাব ও রূপের পারস্পরিক উত্তরণের আকুলতা থেকে। কবির ভাষায়—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।—উৎসর্গ-১৭

অর্থাৎ ভাব পেতে চায় ধ্বনিরূপ আর রূপ হয়ে উঠতে চায় ধ্বনিভাব। সুতরাং কবিদের সুন্দরের পূজা মুখ্যত ধ্বনি-আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য মালঞ্চের অদ্বিতীয় ধ্বনিকার। ধ্বনি শিল্পীরূপে তিনি যে মায়াময় সুরলোকের সৃজন করেছেন, তার তুলনা নেই। তাঁর সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে আমরা মোহাবিষ্ট ও পরিতৃপ্ত। তাঁর অভিনব ছন্দ-রচনার বিবিধ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের শেষ নেই।

ভাষা ও ছন্দের সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। ছন্দের সংস্পর্শে ভাষা, নূতন শক্তি, নূতন ব্যঞ্জনা ও ভাবাবেগ লাভ করে অভিনব এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যে-কোনো ভাষার যুগন্ধর কবি সহজেই বলতে পারেন বা প্রত্যাশা করতে পারেন—

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

—কাহিনী,—'ভাষা ও ছন্দ'

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কল্যাণে আমাদের ভাষার এই উত্তরণ ঘটেছে। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্কার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একদিকে বাংলা ছন্দের মূলনীতি নিরূপণ করেন, অন্যদিকে অপরিমেয় শ্রুতিসম্পদে পূর্ণ করে তোলেন বাংলা ছন্দ-ভাণ্ডার। বাংলা ছন্দহিল্লোল, ঝংকার, নৃত্যলীলা ও সুরমাধুরীর অজস্র ঐশ্বর্যে অপূর্ব হয়ে ওঠে। নৃত্য ও সঙ্গীতের অভূতপূর্ব সমন্বয়ে অনন্য হয়ে ওঠে বাংলা কবিতা। আকৃষ্ট করে প্রতিবেশী অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কাব্যানুরাগীদের কান ও মন। দেখা দিয়েছে ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে নতুন কবিতা রচনার প্রবণতা। স্বীকৃতি পেয়েছে ক্রমে ক্রমে আধুনিক ছন্দ।

বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দীর মধ্যে হিন্দীর মধ্যযুগ ছন্দসম্ভার এবং ছন্দশাস্ত্রের বিবেচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু তা একান্তভাবে সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দোধারার অনুবর্তী। বাংলা, অসমীয়া এবং



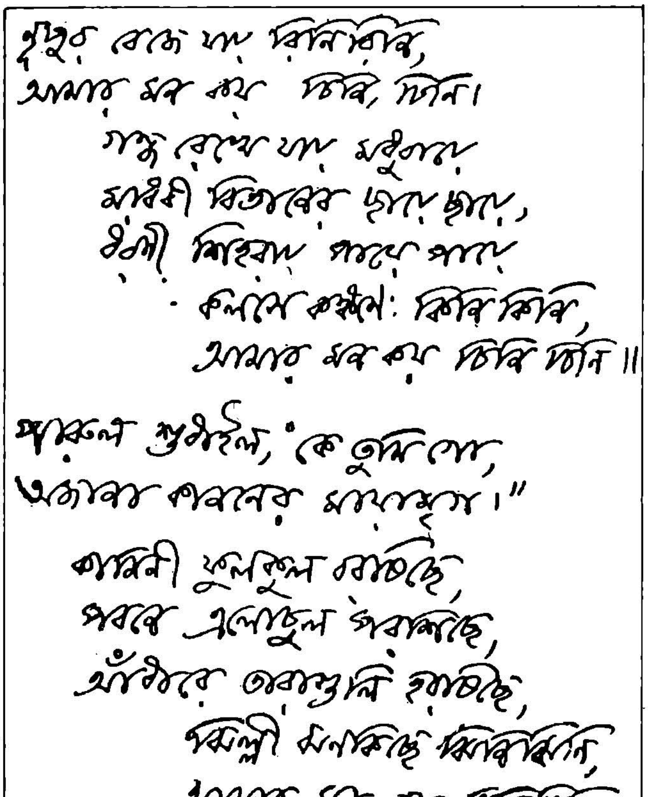
ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটেছে কিন্তু ছন্দচিন্তা ও চর্চা তেমন আমল পায়নি। তবে ছন্দ-রচনা যেন সংস্কৃত-প্রাকৃত ধারা- পথ থেকে মুক্ত হয়ে আপন মতে ও আপন পথে অগ্রসর হয়েছে। চর্যাপদের যুগ থেকে এই প্রবণতা লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ছিল বাংলা কবিতার একমাত্র বাহন। কিন্তু তখনও তার তরল নড়বড়ে অবস্থা পুরোপুরি কাটেনি। রবীন্দ্রনাথের হাতেই তা সুন্দর সুনির্দিষ্ট ও পরিণত রূপলাভ করে। লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দ তার ঐশ্বর্য এবং সম্ভাবনা নিয়ে সাধু-সাহিত্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু সাধের আসনটি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের কান-মন ও অভিরুচির সোহাগস্পর্শে সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়ে। প্রত্নকলাবৃত্ত বা ভাঙা জয়দেবী ছন্দ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রচলিত ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতির অতৃপ্তি কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প্রণোদিত করে নব-ছন্দ রচনায়। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অশ্রান্ত প্রয়াস শুরু হয়। সিদ্ধিলাভ ঘটে মানসী কাব্যের যুগে (১৮৮৭-১৮৯০)। আবিষ্কৃত হয় বাংলা ছন্দের ধ্বনি-পরিমাপের নতুন নিয়ম। আমরা পাই নব্য কলাবৃত্ত। শুরু হয় বাংলা ছন্দের জয়যাত্রা, তিনটি সুস্পষ্ট ছন্দোরীতির রাজপথ ধরে।

তখন বাংলার মতোই অসমীয়াতে অক্ষরবৃত্ত, ওড়িয়াতে দাঁণ্ডিবৃত্ত এবং হিন্দীতে ঘনাক্ষরী বা কবিত্ত ছন্দের প্রচলন ছিল। এই সমগ্রোত্রীয় ছন্দ কয়টি যে পুরোপুরি সার্থক এবং সুন্দর রূপলাভ করেছিল তা বলা যায় না। লৌকিক ছন্দ যে ছান্দসিক ও ছন্দশিল্পীদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি সে কথা বলাই বাহুল্য। নব্যকলাবৃত্ত গোত্রীয় কোনো ছন্দের কল্পনারই অবকাশ ছিল না। যদিও হিন্দীতে সংস্কৃত- প্রাকৃত-অনুসারী মাত্রাবৃত্তের বহুল ব্যবহার ছিল। ক্রমে-ক্রমে বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দুর প্রভাবে ভাষা কয়টির উচ্চারণের প্রাচীন-ধর্মিতা শিথিল ও দুর্বল হতে থাকে। উচ্চারণগত এই পরিবর্তন ছন্দোগত পরিবর্তনেরও ভূমি প্রস্তুত করে দেয়।

সাধারণভাবে বাংলা উচ্চারণে মুক্তদলের (বা open syllable) বিন্যাসে অবাধ ধ্বনিপ্রবাহ ও এক প্রকার মসৃণ সঙ্গীতমাধুরীর আস্বাদন ঘটে। রুদ্ধদলে (বা closed syllable) সে প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় তাই রুদ্ধ দল বাদ দিয়ে কবিতা লেখার বেশ সমাদর ঘটে। রবীন্দ্রনাথও প্রলুব্ধ হন। কিন্তু লেখা থেকে রুদ্ধদল ও যুক্তব্যঞ্জনকে পুরোপুরি বাদ দিলে ছন্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে, অস্থিহীন অত্যন্ত তরল হয়ে পড়ে—একথা বুঝতে রবীন্দ্রনাথের দেরি হয়নি। কিন্তু ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার উপায় কি হবে? তাই রুদ্ধদলের ব্যবহার নিয়ে বেশ কিছুকাল দ্বন্দ্ব চলে তাঁর মনে। অবশেষে রুদ্ধদলের প্রলম্বিত উচ্চারণ এবং দু'মাত্রার মর্যাদা স্বীকারের মধ্যে খুঁজে পান প্রত্যাশিত চাবিকাঠি। রুদ্ধদলের এই নবধ্বনি-মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নব্যকলাবৃত্ত বা সরলকলাবৃত্ত রীতি পাই। যা সংক্ষেপে কলাবৃত্তরূপে পরিচিত।

প্রতিবেশী ভাষা কয়টির ছন্দের মতোই বাংলা ছন্দশিল্পের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি যে বহুলাংশে রুদ্ধদলের প্রয়োগ-প্রকৃতি ও উচ্চারণ- বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভর করে—সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা ছন্দের রীতিভেদের মূলেও রুদ্ধদলের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যই। বাংলা কলাবৃত্ত ছন্দটি সংস্কৃত-প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত থেকে ভিন্ন হয়েও কতকাংশে যে



সমগোত্রীয়—তার কারণও ওই রুদ্ধদলই। রুদ্ধদলের পূর্ণমূল্য লাভের ফলে বাংলা ছন্দে অভূতপূর্ব ধ্বনি-সুষমা এবং রূপবৈচিত্র্য দেখা দিল। বিভিন্ন আয়তনের একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পংক্তির অভিনব স্তবকসজ্জা নিয়ে দেখা দিল বাংলা কবিতা। চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষট্‌কল ও সপ্তকল পর্বের সঙ্গে আবশ্যকমতো অতিপর্ব, ডেমকল বা হ্রস্ব তর পর্বের বিন্যাসে বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে প্রত্যেক প্রকারের পঙ্‌ক্তি বন্ধ। এই চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্বের মধ্যে ছয় মাত্রার বা ষটকল পর্বটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। কলাবৃত্ত রীতিতে রবীন্দ্রনাথ ৭৫০টি কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে ষট্‌কলপর্বিক রচনাই ৪৩০টি। তাতে ঘটেছে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধের সার্থক প্রয়োগ। কিন্তু ষট্‌কলপর্বিক রচনার এরূপ কৌলিন্য লাভের কারণ কি? তার উত্তর দিতে হলে বাংলা ভাষার মর্ম, কবির অভিরুচি, কলাবৃত্তরীতির ভাবপ্রকাশের শক্তি ও সৌন্দর্য এবং বাঙালির স্বাভাবিক ছন্দরুচির পরিচয় দেওয়া দরকার। তবে তার ক্ষেত্র আলাদা। এখানে কেবল এইটুকুই উল্লেখ করা যেতে পারে যে,—বাংলা ছন্দের কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত —তিন রীতিতেই চতুষ্কল পর্বের ব্যবহার আছে। এমন কি মিশ্রবৃত্ত তথা দলবৃত্তের একমাত্র বাহন এই চতুষ্কল পর্ব-ই। কলাবৃত্তের বাহন বিভিন্ন মাপের পর্ব। সুতরাং অন্য দুই রীতির তুলনায় চতুষ্কল পর্বের গুরুত্ব কলাবৃত্তরীতিতে কম। পঞ্চকল পর্ব আপন মাহাত্ম্যে আপনি সমুজ্জ্বল। কিন্তু তার রচনায় আমাদের বাক্‌পর্বের সঙ্গে সহজ-সঙ্গতি আনা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তা সম্ভব হলে রচনাটি অনবদ্য হয়ে ওঠে। পঞ্চকল পর্বটি চার মাত্রা থেকে একটু বড়, তার রচনা ও পাঠ আকর্ষণীয় হলেও ধ্বনিপরিমাণের স্বল্পতা থেকেই যায়। অন্যদিকে বাংলায় আট মাত্রার পর্বরচনার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ তা বেশ বড়, আমাদের বাক্‌পর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না। তাছাড়া অষ্টকল পর্ব তো দুটি চতুষ্কল পর্বের সংযোগের ফলমাত্র। চার মাত্রার দুটি পর্বরূপে তা সহজে পড়া যায়। এটাই স্বাভাবিক। সাত মাত্রার পর্ব আট মাত্রার পর্ব থেকে ছোট কিন্তু আমাদের বাক্‌পর্ব বা উচ্চারণসঙ্গতির বিচারে বড়ো-ই। তাই বাংলায় সপ্তকলপর্বিক কলাবৃত্তরীতির কবিতার সংখ্যা খুবই কম। কেবল বাংলাতেই নয়, সব আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই এমনকি সংস্কৃত-প্রাকৃতেও তাই। ছোট বলে যেমন পাঁচ মাত্রার পর্বকে মেনে নিতে চায় না আমাদের বাক্‌পর্ব, তেমনি বড়ো বলে মানতে চায় না সাত মাত্রার পর্বকেও। কিন্তু ছয় মাত্রার পর্ব এ-দুয়ের মধ্যবর্তী এবং সাধারণভাবে আমাদের বাক্‌পর্বের বা উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কারণ তা খুব ছোট নয় আবার খুব বড়োও নয়। তাছাড়া সুরহীন ও সুরাশ্রিত ভাবাভিব্যক্তিতে মুক্ত ও রুদ্ধদলের বিচিত্র বিন্যাসে উৎপন্ন ধ্বনিমাধুরীর ভূমিকা কেবল অনবদ্যই নয়, অতুলনীয়ও। বাঙালির আধুনিক প্রকৃতি ও অভিরুচি, সংস্কার ও সংস্কৃতির অনুকূল বাহন এই পর্বরূপটি। বলা চলে বাঙালি চিত্তের গভীরে তীব্র ও তীক্ষ্ণ, মধুর ও স্নিগ্ধ, হাস্য ও লাস্যময় যে সব অনুভূতি জাগে তার প্রত্যাশিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে কলাবৃত্তরীতির এই ষট্‌কল পর্বে। অর্থাৎ যে-কোনো প্রকারের ভাবই তাতে অবলীলায় অভিব্যক্তি পায়।

আমরা জানি, কলাবৃত্তরীতির ষট্‌কলপর্বিক দ্বিপাদী বন্ধটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর মানসী (১৮৯০) কাব্যের 'ভুলে' ও 'ভুলভাঙা' কবিতা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে কবি 'ভুলে' রুদ্ধদল বর্জন করে লিখেছেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখ পানে নয়ন তুলে §§
এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি?
দখিণ বাতাসে কেহ নাই পাশে সাথের সাথি।

—মানসী—'ভুলে'

পরের কবিতার সেই 'ভুলভাঙা' হয়েছে, রুদ্ধদল গৃহীত হয়েছে এবং তাতেই এসেছে ধ্বনি ও আবেদনগত উৎকর্ষ। যেমন—

চেয়ে আছে আঁখি নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর,
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর।
বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো;
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা জীবন হত। —মানসী—'ভুলভাঙা'

বাংলা গীতিকবিতার বিশেষ উপযোগী কলাবৃত্তের এই ষট্‌কল পর্বটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ও সৃজনীশক্তির দৌলতে অসামান্য হয়ে উঠেছে। বাংলা কবিতায় এনেছে আশাতীত সমৃদ্ধি। ভাবানুরূপ শব্দের দলশৃঙ্খলা ও ধ্বনিঝংকারের সুষমায় কাব্যরুচি যে কতদূর উন্নত হতে পারে, তাতে কবিতা কতদূর আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে—তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অনুরূপ অনুধ্যান অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের ক্ষেত্রেও সম্ভব। কারণ বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই প্রতিবেশী সাহিত্যের কাব্যানুরাগী মহলে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি, স্বীকৃতি ও অনুসৃতি বাড়তে থাকে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তা আরও গতিশীল হয়। অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দীর তরুণ রবীন্দ্রানুরাগী কবির দল ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রানুসারী হয়ে ওঠেন। কলাবৃত্তরীতির ষট্‌কল পর্ব তাঁদের রচনায় অভিনব স্বাদ ও সমৃদ্ধি এনে দেয়। যা ছিল একান্ত বাংলার, তা ধীরে ধীরে অন্য ভারতীয় ভাষার পক্ষে নিতান্ত আপন, সহজ এবং সুন্দর হয়ে দাঁড়াল। ছন্দশিল্পের অলক্ষ্য সূত্রে আর একবার বাঁধা পড়ল ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করে ভারতীয় কাব্য। এখন আমরা রবীন্দ্র-কাব্যকানন থেকে কলাবৃত্তরীতির ষট্‌কলপর্বিক একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধের নিদর্শন এবং অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কাব্য থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে ধ্বনি-সুষমাগত সাম্য-ঐক্য দেখার চেষ্টা করতে পারি।

আমরা জানি পূর্ণযতি দিয়ে সুনির্দিষ্ট কবিতাংশকে ছন্দোপঙ্‌ক্তি বা সংক্ষেপে পঙ্‌ক্তি বলা হয়। আবার অর্ধযতি দিয়ে চিহ্নিত ছন্দ-পঙ্‌ক্তির অংশ পদ এবং লঘুযতি-খণ্ডিত পদের অংশ পর্ব নামে পরিচিত। কলামাত্রিক বা কলাবৃত্তরীতিতে মুক্তদল—এককলা এবং রুদ্ধদল দু'কলা-রূপে উচ্চার্য। সুতরাং ষট্‌কলপর্বিক কলাবৃত্তে সর্বাধিক ছয়টি মুক্তদল এবং সবচেয়ে কম তিনটি রুদ্ধদল থাকতে পারে, এ দুয়ের মিশ্রণও থাকতে পারে। এই পর্বে মুক্ত ও রুদ্ধদলের বিবিধ বিন্যাসে বিচিত্র ধ্বনিরূপ গড়ে ওঠে। যে ছন্দোপঙ্‌ক্তি অর্ধযতি দিয়ে বিভক্ত নয়—তাকে বলা হয় একপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধ। এই একপদীর প্রাচীন-প্রচলিত নাম 'একাবলী'। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিতায় আধুনিক কবিদের রচনায় কলাবৃত্ত একপদীর বেশ সহজ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার হয়ে থাকে। একটু মনোযোগ দিলেই এই ছন্দের উৎকর্ষ এবং কবির স্বাচ্ছন্দ্য সহজে ধরা দিতে পারে। যেমন—

সখী প্রতিদিন হায়। এসে ফিরে যায় কে ?.....
তারে আমার মাথার। একটি কুসুম দে।
—রবীন্দ্রনাথ, কল্পনা : 'সকরুণা'

প্রারম্ভে ২ মাত্রার একটি অতিপর্বসহ ৬+৬+১=১৩ মাত্রার একপদী এটি।

অসমীয়া— নতুন নিমাতি। নিয়ঁরে নিশা
জীবন জিলিকা। জোনাকরে নিশা
—ভূপেন হাজারিকা : 'নতুন নিমাতি'

এখানে ৬+৬=১২ মাত্রার বিন্যাস লক্ষণীয়।

ওড়িয়া— উপরে ভীষণ বারিদর মালা গরজে
উত্তরা বায়ু উত্তাল হোই তরজে।
—ওড়িয়া ছন্দর বিকাশ (১৯৬১) পৃ: ৪১

৬+৬+৩=১৫ মাত্রার একপদী।

হিন্দী— ভারতি, জয় বিজয় করে
কনক-শস্য-কমল ধরে!
—নিরালা, 'ভারতীবন্দনা'

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া উচ্চারণে দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরের পার্থক্য গ্রাহ্য নয়, কিন্তু হিন্দীতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা এবং দ্বিমাত্রাকতা অবশ্যগ্রাহ্য। তাই এখানেও আমরা ৬+৬=১২ মাত্রার একপদী রূপটি পাই। হিন্দী কলাবৃত্ত প্রধানত সংস্কৃত-প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তেরই অনুসারী সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্র-রচনায় আরও বিচিত্র রকমের একপদীবন্ধ খুবই সুলভ।

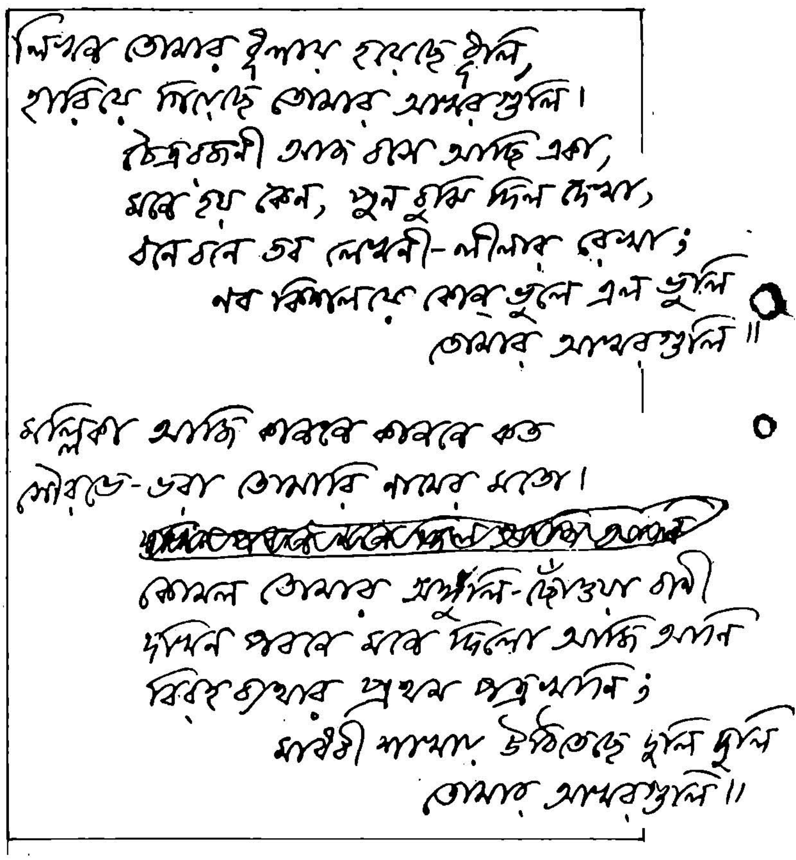
এবার আমরা ষট্‌কলপর্বিক দ্বিপদীর প্রসঙ্গে আসি। মনে হয় ষট্‌কল-পর্বিক দ্বিপদীবন্ধটি আধুনিক গীতিকবিতার সর্বাধিক উপযোগী। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথই নয় অপরাপর বাঙালি, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী আধুনিক কবিরা ও এই বন্ধটির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। ভাব ও ভাষার অনুকূল বিবিধ এবং বিচিত্র প্রয়োগও করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা চার ভাষার চার জন কবির রচনা থেকে একটি করে দৃষ্টান্ত নিয়েই ক্ষান্ত থাকব—

বাংলা— দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয় নাথ,
কল্যাণ করে মঙ্গল ডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।
—রবীন্দ্রনাথ, কল্পনা : 'বিরহমঙ্গল'

৬+৬॥ ৬+৫ =২৩ মাত্রার পংক্তি দুটির পর্ববিভাগ এবং পর্বে দলবিন্যাস লক্ষনীয়।

অসমীয়া— অগ্নিবীণার নুমালা বাহ্নি স্তব্ধ করিয়া প্রলয় গান—
জীবন রঙ্গেরে করিয়া দীপ্ত আনিলা হিয়াত স্নেহের বান।
—দেবকান্ত বড়ুয়া : 'দৃষ্টিসৃষ্টি'

বাংলার মতোই এখানেও ২৩ মাত্রার প্রয়োগ হয়েছে।


লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা,
মনে হয় কেন, পুন তুমি দিলে দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা;
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি
তোমার আখরগুলি॥

মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মনে দিলো আজি আনি
বিরহ-কথার প্রথম পত্রখানি;
মাধবী শাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি
তোমার আখরগুলি॥

ওড়িয়া— কি হবে আমর তম্বারপটা আজি এ রূপার জয়ন্তীরে ?
স্বাধীন এদেশে কি দেখুচু আমে সিন্ধু গঙ্গা কাবেরী তীরে ?
—রাধামোহন গড়নায়ক ঃ 'আজি এ রূপার জয়ন্তীরে'

এ দ্বিপদীও ২৩ মাত্রার কিন্তু নিচের হিন্দী দ্বিপদীটি ২২ মাত্রার—

হিন্দী— পাপোঁকে শুদ্ধিকরণ চারুচরণ ধোয়ে
তুফ্মী অখিল বেশ-বরণ বিশ্ব-শরণ রোয়ে।
নিরালা : বেলা -৩৭

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর এই পঙ্ক্তি দুটি ধ্বনি-সুষমার সাম্য লক্ষ্য করুন—রবীন্দ্রনাথের পরিশেষ কাব্যের 'বুদ্ধ জন্মোৎসব' কবিতাটির পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী ।।
—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ : 'বুদ্ধ জন্মোৎসব'

রবীন্দ্রনাথ ২০ থেকে ৩১ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ ষট্‌কলপর্বিক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু প্রতিবেশিক ভাষাগুলির যে কোনো একটিতে সব রকমের দ্বিপদীর নিদর্শন চোখে পড়েনি। তবে রচনার ক্রম এখনও অক্ষুণ্ণ থাকায়—তা পাওয়া অসম্ভব নয়।

এবার কলাবৃত্তরীতির ষট্‌কলপর্বিক ত্রিপদী পংক্তির দৃষ্টান্তও দেখা যাক্। বলাই বাহুল্য দ্বিপদীর তুলনায় ত্রিপদীর ব্যবহার কম। তবু তার বৈচিত্র্য কম নয়।—

বাংলা— উদয়াচলের সে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।
—রবীন্দ্রনাথ, গীতালি-১০৭

৬+৬+২=১৪ মাত্রার তিনটি সমপদে রচিত এইরূপ ত্রিপদী খুবই বিরল।

অসমীয়া— নতুন্ প্রেমর্ লাজুক্ দৃষ্টি
আবেগত্ তার্ জাগিল্ সৃষ্টি
অরুণ্-কিরণ্ ইন্দ্রজাল।
—দেব্‌কান্ত বড়ুয়া : 'দৃষ্টি-সৃষ্টি'

৬+৬+৬+৬+৬+৫=৩৫ মাত্রার এ উদাহরণটি কিছুটা পরিবর্তিত। অনুরূপ ওড়িয়া ত্রিপদী দেখুন—

ওড়িয়া— পুরুষ কেবল্ রাজ্য চালই
নারী কি কেবল্ অবলা অতি ?
দেশ সংগ্রাম চলাই নাহি কি
এই ভারতের দুর্গাবতী ?
—রাধামোহন গড়নায়ক, 'চাখি খুন্টিয়া'

৬+৬+৬+৫=২৩ মাত্রার লঘু ত্রিপদী।

হিন্দী— ঔর ঔর ছবি রেয়হ নূতনভী কবি রেয়হ
ঔর ঔর ছবি।...
বাদল ওয়হ নহীঁ জহঁা ছিপাহুআ পবি রেয়হ
ঔর ঔর ছবি।
—নিরালা, অনামিকা : 'ঔর ঔর ছবি'

এখানে ১২।।১২।।৮=৩২ মাত্রাপ্রযুক্ত। এই ধরনের ত্রিপদী হিন্দীতে বেশি নেই। এইরূপ ৩২ মাত্রার একটি উদাহরণ রবীন্দ্র-রচনা থেকে দেখুন—

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী, বাজে বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি তব সুর মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর
কারাগারে দিল নাড়া ।।
—মহুয়া : 'বসন্ত'

ত্রিপদীর পর এবার চৌপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধ।

রবীন্দ্র-রচনায় ত্রিপদীর অপেক্ষা ষট্‌কলপর্বিক চৌপদীর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। অনুরূপভাবে অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দীতেও ষট্‌কলপর্বিক চৌপদী বেশি রচিত হয়েছে অন্তত ত্রিপদীর তুলনায়। আসুন দৃষ্টান্ত পড়া যাক্।

বাংলা— নূতন ছন্দে অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিনী-ভরে। —চিত্রা : 'অন্তর্যামী'

১২ মাত্রার তিনটি ও ৮ মাত্রার একটি পদের সমবায়ে এই চৌপদী পঙ্‌ক্তিটি গঠিত।

অসমীয়া— নভ-মহানীল্ চিরাচির করি
প্রলয়্ ভঙ্গি উঠে তার চরি
স্বর্গ-মর্ত্য রসাতল রেখা
মোহারি মুচরি করি দিলে একাকার্।
—অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী : 'মই তাণ্ডবী'

তিনটি বারো মাত্রার পদের সঙ্গে একটি চোদ্দ মাত্রার পদের সমবায়ে চৌপদীটি নির্মিত। অর্থাৎ ছয় মাত্রা অধিক।

ওড়িয়া— অমর তোহর সমর কবিতা
কণ্ঠে কণ্ঠে হোইচি সাইতা,
লেখি যাই অছি, রাখি যাই অছি
নৃসিংহ রায় গুরু।
—রাধামোহন গড়নায়ক : 'কেরি চাঁহাতানগুল'

বাংলা চৌপদীটির মতোই এখানেও ১২।।১২।।১২।।৮ মাত্রা বিন্যস্ত।

হিন্দী— বন্ধুঁ পদ সুন্দরে তব
ছন্দ নবল স্বরগৌরব
জননি, জনক-জননী জননী
জন্মভূমি ভাষে। —নিরালা, অপরা—৩৫

'জননী'র 'নী' তিন ক্ষেত্রেই হ্রস্ব-উচ্চারিত হবে। তিনটি বারো মাত্রার এবং শেষেরটি দশ মাত্রার পদ নিয়ে এ চৌপদী রচিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি চৌপদী উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কঠিন। তাতে অবশ্য শেষ পদে দুই মাত্রা কম রয়েছে। যেমন—

ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায় ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীত তানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব মহাবাণী। —উৎসর্গ—১৬

আজকের আলোচনায় যে-সব প্রতিবেশী ভাষার কবিদের রচনা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত সংকলিত হয়েছে তাঁরা এবং আরও অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের অনুজোপম। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। বিশেষ করে ররীন্দ্র-কাব্য ছন্দ তাঁদের বিমুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদের রচনায় রবীন্দ্র-ভাব ও ভাষার সঙ্গে ছন্দও প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। ফলে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী—এই প্রতিবেশী ভাষা চারটিতে ছন্দের বিচারে একটি আপাত অলক্ষ্য সূক্ষ্ম যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। সেই যোগ-সূত্রটিকে সুস্পষ্টভাবে খুঁজে নিয়ে তাকে আরও সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ করতে প্রয়াসী হওয়া দরকার। বর্তমান নিবন্ধে সেই প্রয়াসের একটি প্রয়াস-রেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। এতে করে যদি কৌতূহল জাগে, প্রয়াসী হবার প্রবৃত্তি জাগে—কারো কারো মনে—তবে এ শ্রম সার্থক মনে করব। কারণ ভারতীয় আত্মার কাব্যরতির শিল্পসম্মত নির্মিতিতে ছন্দ পরমাবশ্যক, এমন কি অপরিহার্য। কবি-শিল্পীরা ধ্বনির তুলি এবং ছন্দের রঙেই চিত্রিত করেন কবিতার বাণীমূর্তি। সুতরাং ছন্দের মধ্যেই কবিতার 'শিল্প-শোভার সার'- এর চাবিকাঠি নিহিত বলা যায়। রবীন্দ্র-কবিতা পাঠে তা সহজেই বোঝা যায়। আমাদের ছন্দবোধ ও ছন্দ-শিল্পবোধ দুই-ই তৈরি করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।



শান্তিনিকেতনের বাড়ি কবির বাসগৃহ

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়



উত্তরায়ণ

ছবি ঃ সুদীপ্ত চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতনের প্রথম বাড়ি "শান্তিনিকেতন গৃহ" গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মাণ করিয়েছিলেন এই দোতলা পাকা ইমারত। আশ্রমের উত্তর দিকের প্রধান তোরণ সামনে রেখে এ'বাড়ি নির্মাণ করে মহর্ষিদেব সাধন পীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তোরণের মাথায় লেখা আছে মহর্ষির জীবনের সার সত্য—"একমেবাদ্বিতীয়ং। আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। নির্জন প্রান্তে "সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দং" মন্ত্র মাথায় লিপিবদ্ধ করে এই বাড়ি তৈরি হল ১৮৬৩ সালে। দোতলা ইমারতের এক তলায় মহর্ষিদেব ব্রহ্মোপাসনা করেছেন। ব্রহ্ম মন্দির নির্মাণের পূর্বে এই গৃহে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা হয়েছে। অতিথিদের তিনদিন বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থাও এই বাড়িতে ছিল। পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রার পূর্বে (১৮৭৩, ফেব্রুয়ারী) এই গৃহে এসে উঠেছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের (১৯০১ সাল) তিন মাস পূর্বে কবি সপরিবারে এই গৃহে বাস করেন। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য নির্মিত "শান্তিনিকেতন গৃহে" রবীন্দ্রনাথ বেশীদিন থাকলেন না। সপরিবারে বাস করার জন্য ১৯০২ সালে শালবীথি ও আম্রকুঞ্জের পূর্ব সীমানায় তিনটি পর্ণকুটির নির্মিত হল "নূতন বাড়ি" নামে। কিন্তু এ'বাড়ি তৈরি হতে-না-হতেই কবির সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল (১৯০২, ২৩শে নভেম্বর)। শোকাহত কবি এই নূতন বাড়িতে এলেন না। আশ্রমের শিশুদের আশ্রয়স্থল হল এ'বাড়ি। নূতন বাড়ি'র প্রাঙ্গণে বসে সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথ শিশুদের গল্প শুনিয়েছেন। এ'বাড়িতে বাস করেছেন পিয়ারসন—এণ্ড্রুজ সাহেব। মহাত্মা গান্ধীর ফিনিকস ইস্কুলের ছাত্রদল গান্ধী পুত্র দেবলালের সঙ্গে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে (১৯১৪ নভেম্বর) এসেছিল তখন এই নূতন বাড়িতে তারা আশ্রয় নিল। ১৯১৫, ৬ই মার্চ এদের দেখতে এসে সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী এ'বাড়িতে বাস করলেন।

নূতন বাড়ির পাশেই ছোট, দোতলা বাড়ি 'দেহলি'। ১৯০৪ সালে শোকাহত কবির একান্তে লেখাপড়ার জন্য তৈরি হল 'দেহলি'। দীর্ঘদিন এ'বাড়িতে থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আশ্রম পরিচালনা করেছেন। দেহলির দোতলায় বসে লিখেছেন—'খেয়া' কাব্য। অনেক ঘটনার স্মৃতি হয়ে আছে এই দেহলি বাড়ি। এখান থেকে ১৯১৯ সালে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ চলে উত্তরায়ণের ভিতরে। উত্তরায়ণ কোন বাড়ির নাম নয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত যে গৃহসমূহ উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী ও চিত্রভানু-গুহার — যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে তার নাম উত্তরায়ণ। আশ্রমের উত্তরে সীমাহীন প্রান্তরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বাড়িগুলি তার বাড়ির সঙ্গে সমতা রেখে বাগান আর এক মনোরম পরিবেশ। বাড়িগুলির স্থাপত্য—সূক্ষ্ম শিল্পময় রুচির চূড়ান্ত বিকাশ।

শান্তিনিকেতনের অন্যান্য বাড়ি—সিংহসদন, পুরনো লাইব্রেরী, কলাভবনের হোস্টেল, হ্যাভেল হল, চৈত্য, পান্থনিবাস এবং উত্তরায়ণের বাড়িগুলির বিচিত্র স্থাপত্য সকলকে তৃপ্তি দেয়, রুচিকে উন্নত ও প্রসারিত করে।

উত্তরায়ণের ভিতরে প্রথম যে বাড়ি—একতলা-দোতলা-তিনতলা, একটা ছাদের সঙ্গে আর একটির মিল নেই, ভিতরে ছোট-বড় অনেক ক'টি ঘর—এ' এক বিচিত্র বাড়ি—নাম "উদয়ন"। পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম উদয়ন। কবির অনেকদিনের বাসস্থান এই উদয়ন। পূর্বদিকের বারান্দায় তিনি প্রতিদিন বসতেন—রবির উদয়-প্রত্যাশায়। বিশাল প্রাঙ্গণে সুরম্য এই ত্রিতল অট্টালিকার স্থাপত্যশিল্প অসাধারণ। স্থাপত্য বৈচিত্র্য এই বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। শীতল-পাটি দিয়ে ভিতরের দেওয়াল ঢাকা। কারুকাজ করা দরজা-জানালার সঙ্গে মানানসই পর্দা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে এর স্থাপত্যে। প্রবেশ মুখেই ঢাকা বারান্দা। ঠিক ষ্টেজের অনুকরণে। দু'পাশে খোলা বারান্দা। কতকটা চীন দেশের 'সামার থিয়েটার' স্টেজের প্রতিলিপি। খোলা বারান্দার দু'পাশে ভিতর ঘরের জানালা জাপানী আর চীনদেশের ভাবধারায় তৈরি। বারান্দার পিলারগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্যের (অজন্তা-ইলোরা) সুন্দর নিদর্শন। ঢাকা বারান্দায় ঘরে ঢুকবার দরজা—কাঠের। কাঠের উপর অসাধারণ শিল্পকলা—মোগল রীতির সাক্ষ্য বহন করছে। ঘরে ঢুকেই সু-সজ্জিত ড্রইং-রুম। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সজ্জারীতিতে সাজানো। দেওয়ালে শীতলপাটির উপর মসৃণ কাঠের প্যানেল—রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি দিয়ে সাজানো। বসবার চেয়ার-ডিভান এর ষ্টাইল—দেশী-বিদেশী ভাবধারার সঙ্গে মিশে আছে। ড্রইং-রুমের পরেই হলঘর। নিপুণ হাতের কাঠের কাজ দিয়ে ঢাকা। চারিপাশে বসবার জায়গা—মাঝখানে ফাঁকা। জাভা-বালির গৃহসজ্জার রীতিতে সাজানো। মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ষ্টেজ—যেখানে হবে অনুষ্ঠান। হলঘরের দেওয়ালের গায়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি আর উত্তর দিকের দেওয়ালের শো-কেসে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিষ ও অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবীর শিল্প কাজ দিয়ে সাজানো। দক্ষিণের ঘর জাপানী ঠাটের। ভিতরের ঘরের দেওয়াল শীতল-পাটি দিয়ে ঢাকা। কাঠের প্যানেলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা অধ্যায়ের-ছবি দিয়ে সাজানো। সেখানে আছে স্মৃতি বিজড়িত পিয়ানো। কলকাতার হব্‌স কোম্পানীর এই পিয়ানো দান করেন পিয়ার্সন সাহেবের বান্ধবী হল্যাণ্ডের মহিলা শ্রীমতী ভ্যানইয়াগেন—১৯২৩ সালে। এই পিয়ানো ব্যবহার করেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে পিয়ানো বাজিয়ে সঙ্গীতের বিদেশী ভাবধারা প্রবর্তন করেন। বাইরের অংশের দেওয়ালে মহর্ষির আত্মীয়-পরিজনের তৈলচিত্র দিয়ে সাজানো। জানালার রং—রেলিং সব কিছু জাপানী ছন্দে নির্মিত হয়েছে। খাবার ঘরের দেওয়াল কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা। দেওয়ালের গায়ে শিল্পী অসিত হালদারের আঁকা ছবি। অনান্য ঘরে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবীর আঁকা ছবি ফটোগ্রাফ দিয়ে সাজানো। দোতলার রবীন্দ্রনাথের থাকার ঘর—তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। ঘরের ভিতরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবি—নন্দলালের আঁকা 'সতীর দেহত্যাগ'—ঘরটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ঘরের ভিতরে বই-রাখার ব্যবস্থা, ড্রেসিং রুম ও পাশের বাথরুমের বেসিন-স্নান করার জায়গার সৌন্দর্য অতুলনীয়। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সব পেয়েছির দেশে' এই বাড়ী প্রসঙ্গে লিখেছেন—" স্থাপত্যের দিক থেকে শুধু নয়, সুখকরতার দিক থেকেও শান্তিনিকেতনের শ্রেষ্ঠ বাড়ি যে 'উদয়ন' সে কথা না বললেও চলে। রথীন্দ্রনাথের এই প্রাসাদটি তাঁরই নেতৃত্বে একদিন ঘুরে দেখলুম। দেখবার মতো বটে। নানা কোণ, মোড় ও উঁচু-নিচুর ভিতর দিয়ে ছন্দের অক্ষুণ্ণ সুষমা বাইরে যেমন প্রকাশিত ভিতরে তেমনি অনুভূতি গম্য।

তাছাড়া যে-সব ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্মে বাড়িটি সাজানো তারও অন্ত নেই।" উদয়ন বাড়ির আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, খাট, পরদা সব কিছুই পরিচ্ছন্ন। বিশেষভাবে তৈরি এই আসবাবপত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। কবি বুদ্ধদেব বসু "সব পেয়েছির দেশে" আসবাবপত্রের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন — "এই আসবাবপত্রগুলির বিশেষত্ব প্রথম দর্শনেই চোখে ঠেকে। এখানে তুচ্ছতম কোনো প্রয়োজনের জিনিষ দেখলুম না যা সুন্দর নয়। শুধু সুন্দর নয়— অভিনব ; শুধু অভিনব নয়— বিশেষভাবে চরিত্রবান। একটি দৃঢ় স্বকীয়তা সমস্ত জিনিষে পরিস্ফুট। চেয়ার, টেবিল,



উদীচী

ছবিঃ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়



উদয়ন

ছবি ঃ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

খাট, পরদা সর্ব জিনিসেই একটা বাহুল্য বর্জিত পরিচ্ছন্নতা, ধনাঢ্য বিলাসিতার ভাব একেবারেই অনুপস্থিত, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটেছে এখানেও। জিনিষগুলির কাঠামো বিলাতী, কিন্তু রচনা ভারতীয় ছন্দে"। উদয়ন সংলগ্ন রান্নাবাড়ি, ভৃত্য থাকার ঘর, কাঁকর ঢালা আঙ্গিনা—সারি সারি মালিদের ঘর, উত্তর ভারতের সুন্দর স্থাপত্যের তৈরি ইঁদারা, রান্না বাড়ির চূড়ো—বোরোবুদুরের মন্দিরের স্থাপত্যের যেন একটি অংশ। ইঁদারা সংলগ্ন দারোয়ানের ঘর তার ছাদে জলের চৌবাচ্চা—প্রতিটি স্থাপত্যের ডিজাইন মনকে আকৃষ্ট করে।

উদয়ন বাড়ির পরেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছের কোলে 'কোণার্ক' বাড়ি। ১৯১৯ সালে আসাম সফরের পরে গুরুদেব দেহলি বাড়িতে উঠলেন না। উঠলেন 'কোণার্ক' বাড়িতে। তৎকালীন আশ্রমবাসিদের কাছে জানা যায়—রবীন্দ্রনাথ খুব সখ করে কোণার্ক বাড়ি তৈরি করলেন। এমনভাবে করলেন—যে ঘরে বসে তিনি লিখবেন, যেখান থেকে দূর-দিগন্ত অবধি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। উঁচু ভিতের উপর ঘর উঠল একটা, তার চার দেওয়ালই খোলা, শুধু ছাদটা ধরে রাখবার জন্য চার কোণায় চার থামের মতো খানিকটা করে ইঁটের গাঁথনি তোলা। এই ঘরের মেঝে হতে বেশ খানিকটা নীচে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি শোবার ঘর, আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তেমনি ঘর একখানি—এণ্ড্রুজ সাহেব থাকতেন। মাঝের বড় ঘরটি বসবার ঘর। ঘরটির সামনে দু'সিঁড়ি নেমে একটি বারান্দা, সেই বারান্দা থেকে দু'সিঁড়ি নেমে পূর্ব দিকে এগিয়ে আসা সারি সারি থামের মাথায় কোণার্কের লাল বারান্দা। তিন দিক খোলা ষ্টেজের মতো। তার সামনেই লাল কাঁকরের উপর কবির যত্নে আদরে পালিত শিমূল গাছ। কোণার্ক বাড়ি অনেক ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ভিতরের ঘরগুলি উঁচু-নিচু ; — একঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলে উঠতে-নামতে হবে। কোনটাই সমান চাতালে নয়। সেই কারণে, ছাদও ঠিক তেমনি। উঁচু-নিচু চোদ্দটা উঠতি পরতি ছাদ আছে। ছাদে উঠবার সিঁড়ি—এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে যাবার দু'দিক থেকে সিঁড়ি—বসবার জায়গা (ছাদে) এর কলাকৌশল ও ছাদের গঠন সাধারণের কাছে বিস্ময়কর।

কোণার্ক বাড়ির কোণে মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'—১৯৩৫ সালের মার্চ মাস। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উত্তর ভারত ভ্রমণ করে ফিরলেন। তাঁর

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে—
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

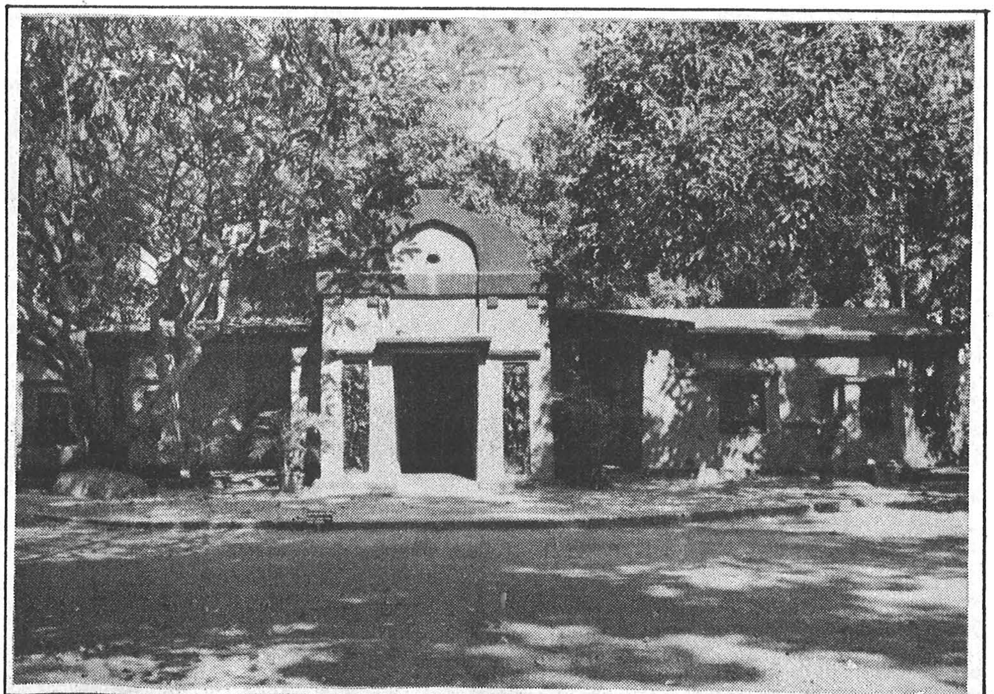
[৪৪ সংখ্যক কবিতা ঃ শেষ সপ্তক]

ইচ্ছামতো শ্যামলী বাড়ি তৈরি হচ্ছে। উত্তরায়ণে তখন কোণার্কের পাশে উদয়নের বিরাট প্রাসাদ। তার পার্শ্বে মাটির বাড়ি কেমন হবে? সেই নিয়ে কবির সঙ্গে স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর আর শিল্পী নন্দলাল বসুর চিন্তা ও ভাবনা। কাজ শুরু হল। পাশের গ্রাম ভুবনডাঙ্গা থেকে গৌরদাস মণ্ডল এল মিস্ত্রী। সাঁওতাল মাঝি মেঝেনের দল মাটি কাটে, মাটি মাখে, মাটির দেওয়াল দেয়। বাড়ির সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খোলা আঙ্গিনা। বাড়ির ডিজাইন করলেন সুরেন কর। আর নালন্দা বোরোবুদুরের ডিজাইন মিশিয়ে পারসপেকটিভ তৈরি করলেন স্বয়ং নন্দলাল বসু। মাটি দিয়ে তৈরি-মাটি আলকাতরা গোবর চিটে গুড় মিশিয়ে সেটা ভালো করে গড়িয়ে নেওয়া হলো আর একটা জিনিষ রথীন্দ্রনাথ যোগ করলেন সেটা হ'ল বেনাগাছ (সর জাতীয়) টুকরো টুকরো করে কেটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল। এ নিয়ে তৈরি হ'ল শ্যামলীর প্লাসটারিং। দেওয়ালে হাই রিলিফের কাজের দায়িত্ব নন্দবাবু দিলেন শিল্পী রামকিঙ্করকে। কলাভবনের তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রী গৌরী ভঞ্জ (বসু), রুদ্রাপ্পা (হানজি), যমুনা সেন (বসু), চিত্রনিভা চৌধুরী, শঙ্খ চৌধুরী-রা সাহায্য করলেন। বাঁকুড়া মন্দিরের টেরাকোটা, পারিপার্শ্বিক সাঁওতাল জীবন এবং মোগল মিনিয়েচার এই রিলিফের বিষয়বস্তু। অজন্তা থেকে একটি অলংকরণ ও একটি ফিগার নেওয়া হল। বাড়ির চারিদিকে রিলিফের কাজ বাড়িকে সতেজ প্রাণবান করে তুললো। প্রবেশ মুখে দরজার দু'পাশে সাঁওতাল দম্পতি—রামকিঙ্করের নিজস্ব সৃষ্টি। পিছনের দেওয়ালে বাঁকুড়ার ছাঁচে 'কৃষ্ণ গোপিনী'—রামকিঙ্করের কপি। পুবের দেওয়ালে বিরাট হাই রিলিফের কাজ 'লড়াইয়ের ঘোড়া'—নন্দলাল বসুর। লড়াইয়ের ঘোড়া যার প্রাপ্তিস্থান হুগলি জেলার গোঘাট থানার বালি দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের ভগ্নপ্রায় মন্দির। মা-ছেলে, তালগাছে চড়া মানুষ, প্রণাম, সাঁওতাল মেয়ের দল, হরিণসহ সিপাহী, হরিণ দল, হাঁসের প্যানেল—প্রভৃতি কাজ নন্দলাল বসুর পরিচালনা ও নির্দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের। শ্যামলীকে কবি সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে। নন্দবাবুর ইচ্ছামতো রথীন্দ্রনাথ মাটির বাড়ির মাটির রঙ্ মিলিয়ে গাছ লাগালেন। সেই গাছ আজ যার পাশে ও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াঘন আম, জাম, তেঁতুল, বেল, ইউক্যালিপটাসের অলৌকিক গম্ভীর দৃশ্যপট—এই দৃশ্যপট শ্যামলীর স্থাপত্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। মনে হবে যেন বৌদ্ধ বিহারে প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করছি। এ'জন্য গান্ধীজী ভালবাসতেন শ্যামলীকে। শ্যামলীর সামনে গুলঞ্চ বা কাঠটগর—শ্যামলীর অঙ্গসজ্জাকে যেন আরো ঘরোয়া করে তুলেছে।

শ্যামলীর পূর্ব দিকে 'পুনশ্চ' শ্যামলীতে কবির এক বছর কাটলো। ১৯৩৬ সাল। বর্ষা এল ভীষণ রূপ নিয়ে। শ্যামলীর মাটির ছাদে ফাটল ধরলো। বর্ষা শেষে নূতন করে ছাদ তৈরি হল। 'পুনশ্চ' বাড়ীর ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাণী চন্দ 'গুরুদেব' বইয়ে লিখছেন—'গুরুদেব বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, চারিদিকে জিনিষপত্রে ঠাসা এর মাঝে আমি যেন বন্দী হয়ে আছি। একটু হাত-পা ছড়াবার জায়গা নেই। ....আমার জন্য একটা ঘর করে দাও এর পাশেই। একখানি ঘর চারিদিকে খোলা বারান্দা। শ্যামলীর মাত্র কয়েক হাত পূর্বে এ'বাড়ি তৈরি হল। দেওয়াল মাটির, ছাদ হল কংক্রীটের। গুরুদেব এ'বাড়ির নাম দিলেন 'পুনশ্চ'। প্রয়োজনে ও কবির ইচ্ছানুসারে কাঁচ দিয়ে ঘেরা হল পূর্বদিক। পশ্চিম দিকে দেওয়াল উঠলো। প্রথম পুনশ্চ'র রূপ পাল্টে গেল।

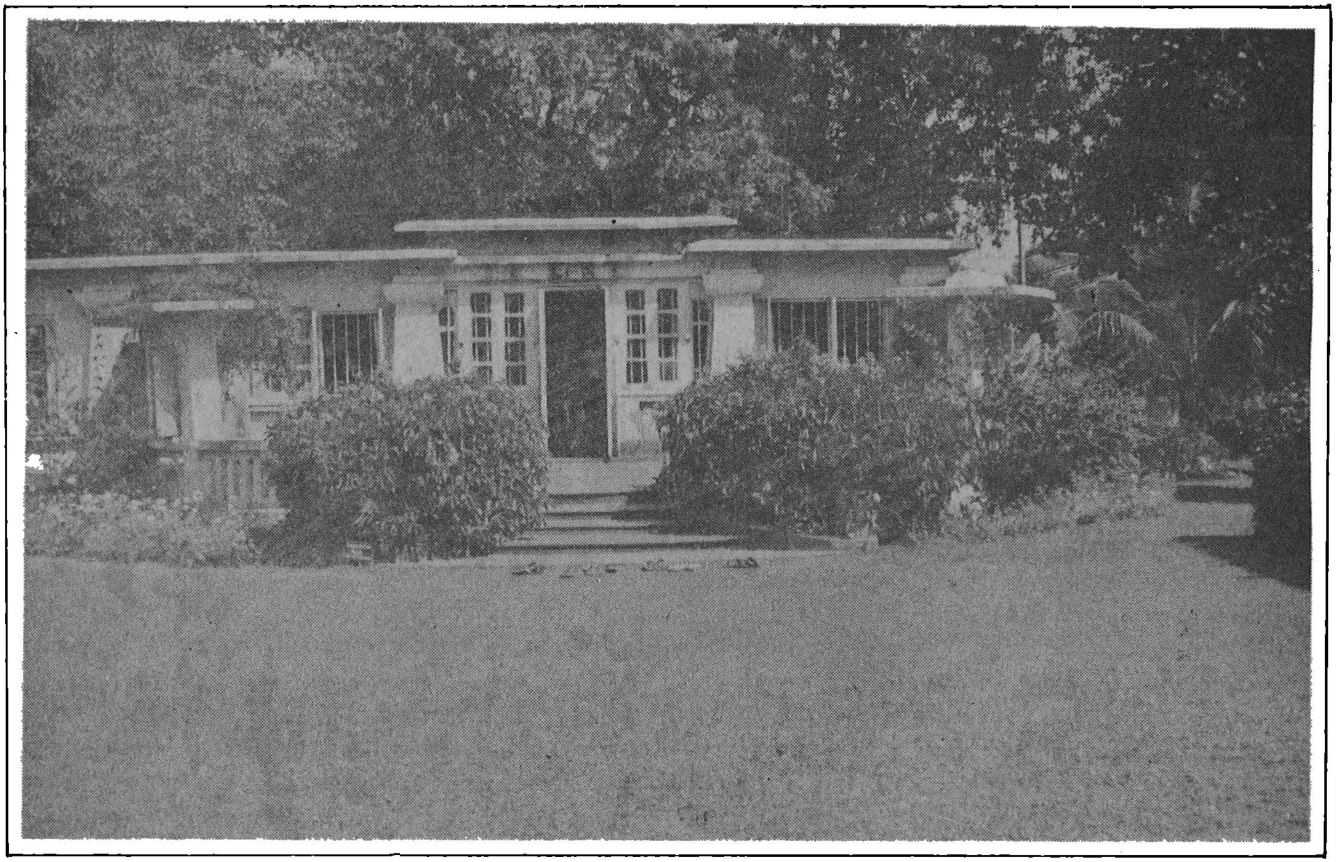
পুনশ্চ বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বের দোতলা বাড়ি 'উদীচী'। পুনশ্চ বাড়িতে দু'বছর বাস করে কবি হাঁপিয়ে উঠলেন। ১৯৩৮ সাল। শ্রীমতী রাণী চন্দ 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে লিখলেন 'রথীকে বলেছি, এবার আমাকে ছোট একটি বাড়ি করে দাও। দোতলা, উপরে মাত্র একখানি ঘর থাকবে, চারিদিকে খোলা। আর আমি কিছুই চাইনে। অনেক তো হল, অনেক বাড়ি ঘুরলুম, এবার এই হবে আমার শেষ কীর্তি। উপরের আকাশের সংলগ্ন থাকবো, আকাশ দেখব, আমার যখন ইচ্ছে হবে, শার্সি বন্ধ করে দেব। আর দেখব গাছের ডগায় সবুজ পাতার ঝিলিমিলি — আলোড়ন'।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী 'পুনশ্চ'র দক্ষিণ-পূর্বে অল্প দূরেই কঙ্করকুঞ্জে চার থামের উপর ঘর উঠল। ঐ সময় (১৯৩৮) কবির সেঁজুতি বই বার হল। প্রথমে এ'বাড়ির নাম দিলেন 'সেঁজুতি'। পরে সে নাম পাল্টে পূর্ব দিকের বাড়ির কথা মনে করে নামকরণ করলেন 'উদীচী'। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সব পেয়েছির দেশে' উদীচী বাড়ি প্রসঙ্গে লিখলেন—'এদিক



শ্যামলী

ছবিঃ সুদীপ্ত চক্রবর্তী



পুনশ্চ ছবি ঃ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

থেকে আমার খুব ভালো লাগলো 'উদীচী'। এটি কবির শেষের বাড়ি এবং আমি বলবো সবচেয়ে ভালো। সৌন্দর্য আর উপভোগ্যতা এখানে মিলেছে। কবির একলা থাকার জন্য যে কটি বাড়ি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এইটি শুধু দোতলা। দোতলা হলেও উঁচু নয়, একতলা মাটির সঙ্গে সমান, পূর্ব দিকে দোতলার গা বেয়ে একটা গাছ উঠেছে, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। দোতলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমস্ত শান্তিনিকেতনের একটা নতুন চেহারা চোখে পড়ে, মনে হয় এই প্রথম দেখছি। ....এই দোতলাটি যেমন সুন্দর তেমনি সুখকর"।

উদয়ন বাড়ির দক্ষিণে পম্পা লেকের গায়ে লাগানো ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়ি—যার নাম চিত্রভানু-গুহাঘর। বাগানের সঙ্গে স্থাপত্যের অদ্ভুত মিলন। চিত্রভানুর উপর তলায় ছিল প্রতিমা দেবীর ষ্টুডিও নীচের তলায় গুহাঘরে রথীন্দ্রনাথের ওয়ার্কশপ। নীচের ঘর যেন একটি জাহাজের কেবিন। গুহাঘরের বাইরের অলংকরণ রবীন্দ্রনাথের ছবির আদর্শে—অদৃশ্য লোকের জীবজন্তু, পাহাড়, কোটর, ষ্টাকো ওয়ার্কের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। ভিতরের অলংকরণ—বিশেষ করে চিত্তাকর্ষক খাট—সিমেন্ট বেদীর উপর তৈরি। খাটের ভিতরের অঙ্গসজ্জা—মশারী—বইয়ের শেল্‌ফ, সাধারণের কাছে বিস্ময়কর মুন্সীয়ানার ব্যাপার। দ্বিতলে উঠবার বৈচিত্রময় সিঁড়ি—বারান্দায় ফুলের কেয়ারী, মাঝখানে পাথরের খোদাই এক ঘোড়সওয়ার—কলিঙ্গ ভাস্কর্যের নিদর্শন। ঘরের ভিতরে দেওয়ালে লাগানো অভিনব কাঠের তাক। পশ্চিম দিকে ছোট গোল জানলা—গোল বৃত্তের মধ্যে তাকালে বাইরের 'পম্পা লেক' সহ সমস্ত বাগানের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখা যাবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এ'বাড়িতে বাস না করলেও বাগানে ঘোরার সময় দ্বিতলে বসেছেন। গুহাঘরে বসে বিশ্রাম নিয়েছেন।

উত্তরায়নের বাড়িগুলি নির্মাণে যাদের চিন্তা পরিশ্রম এবং সৃষ্টিশীলতা

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটি মাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভাণ করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভাণ করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাই নে;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।
বেশ লাগছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতি দিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

[১৫ সংখ্যক কবিতা ঃ শেষ সপ্তক]

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোট ঘর। এইরকম ছোটো ঘর আমি ভালবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি, ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে ঠিক যতটা দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে, টেবিল আছে, চৌকি আছে, সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাই নে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে —পূর্ণভাবে, বিশুদ্ধভাবে। দেওয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়, একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানালার গা ঘেঁষে। তাঁর কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরী হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই 'দূর' পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে 'নিকট' আছে, 'দূর' নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালবাসে—কেননা, 'দেয়াল আমারই , আর কারও নয়'। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালবাসার আর তুলনা হয় না।

—শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখিত পত্র, পথে ও পথের প্রান্তে ২৬।

কাজ করেছে তারা হলেন, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রণেত্রী প্রতিমা দেবী, রূপকার সুরেন্দ্রনাথ কর, আর শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছেন—রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক সান্নিধ্য ও শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শ লাভের আশায়। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে উত্তরায়ণে এসে বাস করেছেন ফরাসী দেশের বিদুষী ও শিল্পী মহিলা আঁদ্রে কারপেলে, প্রাচ্য শিল্পের বিদুষী মহিলা ষ্টেলা ক্রেমরিশ, বিদেশিনী ভাস্কর মার্গারেট মিলয়ার্ড, সিলভ্যাঁ লেভি, লেস্‌নী, এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন্ সাহেব, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গুরুদেবের অতিথি হয়ে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক। শ্যামলী বাড়িতে বাস করেছেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা উদয়ন বাড়িতে হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দু'দিন ছিলেন। উদীচী বাড়িতে বসে গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। রবিবাসরের অনুষ্ঠান উদয়ন বাড়িতে হয়েছিল। সজনী দাস, জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেন সেন, রাধারাণী দেবী, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ নাম করা সাহিত্যিক সাংবাদিকরা এসেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে 'ভারতভাস্কর' উপাধি এই উদয়ন বাড়িতে গুরুদেবকে দেওয়া হয়েছিল। গুরুদেবকে অক্সফোর্ড ডি লিট্ উপাধি দিল। এলেন মরিস গয়ার, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান। উদয়ন বাড়িতেই তাঁরা থাকলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিসেস্ রুজভেল্ট, সস্ত্রীক চিয়াং কাইসেক, সরোজিনী নাইডু এসে উদয়ন বাড়িতে বাস করেছেন। জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী গুরুদেবের সময় ও তাঁর প্রয়াণের পর বহুবার এসে উদয়ন বাড়িতে থেকেছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রমথ চৌধুরী—পুনশ্চ বাড়িতে অনেকদিন বাস করেছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আচার্য হিসাবে উদয়ন বাড়িতে থাকতেন—শান্তিনিকেতনের জীবন কাটিয়েছেন ছবিতে-গল্পে-শিল্প সৃষ্টিতে।



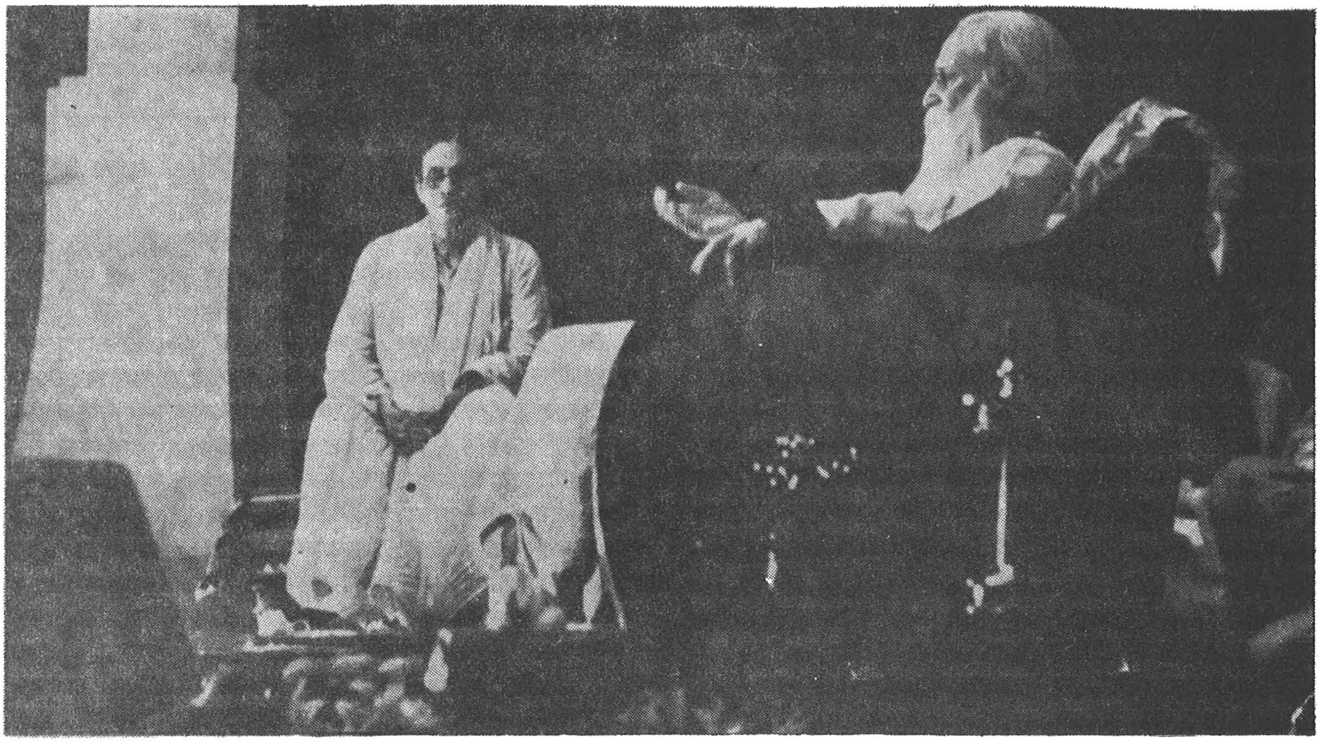
ফোটোক : ছবি ফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী

নেপাল মজুমদার

১



আশি বৎসরের জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য যে-কয়জন কৃতি সাহিত্যিক, কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং খুবই আস্থাভাজন হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে বিশেষ করে রাজনীতিক এবং শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অমিয়চন্দ্রের মতামত ও পরামর্শের উপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। সকলেই জানেন, ১৯৩০ সালে কবির ইউরোপ এবং সোভিয়েট দেশ ভ্রমণে,— পরে ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণে অমিয়চন্দ্র কবির সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

কবির জীবনে শেষ ১৫টি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা যখন ঘটে চলেছে, এইকালেই গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনীতিক সমস্যা-সংকট এবং সেইসঙ্গে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তীর আলোচনা, পরামর্শ বা মতামতের উপর কবি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। অমিয়বাবুও এই সব বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে কবির সুচিন্তিত এবং লিখিত মতামত সংগ্রহ করে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। সকলেই জানেন, কবির এইকালের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক এবং শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত রচনা, অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে 'খোলাচিঠি'র আকারে 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবির এ-সব রচনা এবং অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে 'চিঠিপত্র' ১১-শ খণ্ডে' সংকলিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় কবিকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিগুলি আজও পর্যন্ত কোথাও সংকলিত এবং প্রকাশিত হলো না।*

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৩ সালে অমিয়চন্দ্র উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিলেতে চলে যাওয়ার পর কবি যেন বেশ কিছুটা অসহায় বোধ করতে থাকেন। এই সময় একটি চিঠির এক জায়গায় অমিয়চন্দ্রকে লিখছেন :

"তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়।.....তুমি আমার অনেক করেছ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ—তোমার সহযোগিতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না—কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবে না।"

পরের একটি চিঠিতে কবি এক জায়গায় অমিয়চন্দ্রকে লিখছেন—(২ রা এপ্রিল, ১৯৩৪) :

"তোমার কথা বারবার মনে পড়ে। তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই জন্যে আমি

* অবশ্য অমিয়বাবুর বেশ কয়েকটি চিঠির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইতিপূর্বেই অন্যত্র প্রকাশ করে তা সকলের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেছি—লেখক।

তোমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি। এ রকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করি নে।"...

অবশ্য অমিয়চন্দ্রের সব পরামর্শ ও মতামতকে কবি যে গ্রহণ করতে পারেননি—বিশেষ করে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনীতিক ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে, এটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গ্রহণ করতে না পারলেও প্রায় পুত্র-প্রতিম এই অনুজ 'ভাবশিষ্য'টির স্বতন্ত্র বিচারশক্তি ও মতামতকে, কবি শ্রদ্ধা করতেন আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মহত্ত্ব।

১৯৩৫ সাল থেকেই ইউরোপ তথা সারা বিশ্বের রাজনীতিক সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। এটাও দেখা যাচ্ছে—১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হয়েছে।

অমিয়চন্দ্র তখন বিলেতে অক্সফোর্ডের Balliol College এ গবেষণারত। এই সময় কবির কিছু ইংরেজি কবিতা ও রচনার সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটিও তখন প্রকাশের মুখে। কবির ইচ্ছানুসারে এটিরও ইংরেজি তর্জমার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু কবি ইতিমধ্যেই গ্রেট্রুড এমার্সনের অনুরোধে আমেরিকার *Asia* কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। অমিয়চন্দ্রের তা ইচ্ছা নয়। এছাড়া এইসময় 'রাশিয়ার চিঠি'রও ইংরেজি তর্জমা বিলেতে প্রকাশের উদ্যোগ চলতে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৩৪ জুন সংখ্যা হতে *Modern Review* পত্রিকায় প্রথম 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অর্জমা প্রকাশ হতে থাকে। অনুবাদক ছিলেন ডঃ শশধর সিংহ। অল্পকাল পরেই ইংরেজ সরকার এর তর্জমা প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৩ই নভেম্বর বিলেতের *Times* পত্রিকাতেই প্রথম এই খবর প্রকাশিত হয়। অমিয়চন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা, 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি তর্জমা বিলেত থেকে প্রকাশিত হোক। সম্ভবত এডওয়ার্ড টম্সনের এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে শশধর সিংহও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হন। টমসন শশধর সিংহকে যে চিঠি লিখেছিলেন শশধরবাবু তা কবিকে পাঠিয়ে দেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 'রাশিয়ার চিঠি'-তে কয়েক জায়গায় টমসনের উদ্দেশে খোঁচা ছিল। তাছাড়া 'রাশিয়ার চিঠি'তে শুধু পাতায় পাতায় সোভিয়েটের বিশাল কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত-প্রশংসাই ছিল না, দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে ভারতের ভয়াবহ দুরবস্থা ও অকল্পনীয় দুর্গতির কথাও বারে বারে বলা হয়েছে। টমসনের বিরূপতার এটাই যে ছিল আসল কারণ, তাতে আর সন্দেহ নেই। আর ঠিক এই কারণেই অমিয়চন্দ্রের 'রাশিয়ার চিঠিই' ইংরেজি তর্জমা বিলেতে প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল। বিলেতের, তথা সারা বিশ্বের লোক জানবে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত। কবির তাতে অমত ছিল না, তবে তিনি কয়েকটি ব্যাপারে এ ব্যাপারে অমিয়বাবুকে সতর্ক করে দেন। তাঁর মতে, ইতিপূর্বে হিরণ সান্ন্যালের কৃত 'রাশিয়ার চিঠি'র তর্জমাটাও মিলিয়ে বিচার করে দেখা দরকার। ১লা জানুয়ারী ১৯৩৫, কবি তাঁর চিঠির এক জায়গায় অমিয়চন্দ্রকে লিখলেন :.

"রাশিয়ার চিঠিতে এমন কিছু যদি বাদ পড়ে থাকে যেটাতে ওর স্বাদ নষ্ট হয় তাহলে সে তোমরা ফিরিয়ে নিতে পারো। কিন্তু নাম না দিয়ে এক জায়গায় টমসনের উপর খোঁচা ছিল সে যেন না থাকে। ঝগড়াটে সুরটা undignified বলে অনেক জায়গায় ছেঁটেছি কিন্তু তোমাদের মতে যদি তাতে ক্ষতি হয়ে থাকে যথোচিত ব্যবস্থা কোরো। বিশ্বভারতী পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখ্‌লুম তাতে রাশিয়ার (চিঠির) দুই একটা চিঠির তর্জমা আছে। তর্জমা আমার নয়, হিরণকুমার সান্ন্যালের — যদি তুলনা করে এটাই গ্রাহ্য মনে হয় তবে যথাকর্তব্য কোরো। কপি করে পাঠিয়ে দেব।"

'চার অধ্যায়'এর ইংরেজি তর্জমা *Asia* কাগজে প্রকাশের ব্যাপারে এই পত্রের উপসংহারে কবি লিখলেন :

"চার অধ্যায়ের তর্জমাটা এসিয়া কাগজে চেয়েচে—অবশ্য দাম দেবে। সেটা আমার হাতে শোধন পাবার জন্যে আমার কাছে পাঠাবার দরকার আছে বলে মনে করিনে। তোমাদের সেখানকার ওস্তাদরা পছন্দ করলেই যথেষ্ট।"

অমিয়চন্দ্র এই সময় ছুটি কাটাতে হল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন সেখানে থেকে ইতালিতে। ইতালি থেকে ফিরে কবির উপরোক্ত চিঠিখানি পেয়েই তার জবাবে অমিয় চক্রবর্তী লিখলেন (১৮ই জানুয়ারী)

Oxford
January 18, 1935

"রোম থেকে ফিরে আপনার চিঠি পেলাম। Typed কবিতাগুলিও এসেচে। কিন্তু আপনার চিহ্নিত ইংরেজি কবিতার বইগুলি এখনো এল না।—

"....'রাশিয়ার চিঠি' সম্বন্ধে Thompson এর চিঠি শশধরবাবু আপনাকে পাঠিয়েচেন। তাঁর তো মত নয় ঐ ইংরেজি অনুবাদ ছাপানো। কিন্তু এ বিষয়ে তারই তো শেষ মত নয়—এদিকে Publisher-রা তো চাচ্চে। আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে।

"....চার অধ্যায়ের বাংলা বেরিয়ে যাচ্চে খুব ভালো হ'ল। মনে হয় না কিছু গোলমাল হবে। এদিকে ইংরেজিও শীঘ্র বেরোবে। Asiaতে ছাপালে অনেক মাস দেরি হবে বই হতে—তাছাড়া Publisher-দের গরজ কমবে, বিশেযত American কাগজে বেরোলে। শেষ পর্যন্ত তাতে আর্থিক ক্ষতি হবে। ইংরেজি তর্জমা এখন দু'একজন পড়ে দেখচেন। ওঁদের মতামত সমেত সব জিনিসটা আপনার হাতে পৌঁছবে। এদিকে তাড়াতাড়ি যাতে ছাপা হয় সব ব্যবস্থা ঠিক হচ্চে।

এই সময়ই সুভাষচন্দ্রের *Indian Struggle* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের আগেই বইটি ভারতবর্ষে আসা বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। অমিয়চন্দ্র সম্ভবত বইটি আগেই পেয়েছিলেন। কবিকে ঐ পত্রেই সুভাষচন্দ্রের এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখলেন, "সুভাষচন্দ্রের বই খুব interesting হয়েচে।—তাতে তাঁর মতামত তো তাঁর নিজস্ব।".....

এর পর তাঁর ইতালি ভ্রমণের এবং রঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লিখছেন :

"Rollandদের সঙ্গে দেখা করলাম ফেরবার পথে। Montreauxতে ট্রেন থামলে—হাতে সময় ছিল হঠাৎ নামবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।".....

"ইটালীর বিষয়ে এত বলবার আছে যে চিঠিতে লেখবার চেষ্টা করলে কষ্ট পাব। ওদের ব্যাপার সব শেষ হলে আমি নিজের মতো ওঁদের intellectualদের সঙ্গে দেখা করেচি Rome-এ Florence-এ Pompia, Milan ইত্যাদি সহরে। Govani ওদের বড়ো কবি এবং Lucio D'Amtra ভালো লোক এই দুজনকে বেশ লাগলো। মোটের উপর বাধ্য হয়ে এঁরা Compromise করে টিকে আছেন—মনের ভিতর অত্যন্ত ভার চেপে আছে। শাসনতন্ত্র বা যুদ্ধ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এক(টা) কথা বলবার অধিকার নেই কারো—press office-এর মত এবং বিচার

---

* মুসোলিনীর আমন্ত্রণে এইবারের ইতালি ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে অমিয়বাবু স্মৃতিচারণ করে লেখককে এক পত্রে লিখেছেন :

"আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম হল্যাণ্ডে।—সেখানে তাঁদের (ইটালীয় কর্তৃপক্ষের) কাছ থেকে টেলিগ্রাম পাই। আজ পর্যন্ত জানি না তাঁরা আমার ঠিকানা কোথায় কী করে পেলেন। আমি ছিলাম Amsterdam এ....। মুসোলিনী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ ভেবেছিলেন পূর্বীয় আমাদের কথার বলে জয় করবেন।—কিন্তু দু'-চারজন ছাড়া কারো সে দশা ঘটেনি খালি ভদ্রতার খাতিরে অনেকেই রোমের প্রতাপ ও প্রভাব বিস্তার করতে উৎসুক হলেন। দু'একজন অভারতীয় ছাড়া কেউ অবশ্য সেইভাবে চলেন নি।"

চূড়ান্ত। কিন্তু আজ Itally ধনেপ্রাণে য়ুরোপে এমন একটা জোরালো জায়গা পেয়েচে—যেমন করে হোক আজ এরকম চারিদিক থেকে জেগে উঠচে যে ইটালীয় কারো পক্ষে Mussoliniকে ব্যক্তিগতভাবে অস্বীকার করা শক্ত। Croce ও অনেকটা বদলেচেন। Rollandও দেখলাম Hitler-এর ব্যাপার দেখে Itally-কে তবু খানিকটা স্বীকার করে নিতেই রাজি।...(Romeএ একদিন হঠাৎ ঘটনাচক্রে Major Rapicattesh *-র সঙ্গে দেখা হল—তিনি Croceকে এনেছিলেন আপনার কাছে। আরো কিছুকাল পরে আপনাদের interview সম্বন্ধে তিনি লিখবেন ঠিক করচেন, বললেন।"

পরিশেষে তিনি কবিকে আরো লেখেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে "এখন আর কোনো বিরুদ্ধতা নেই—কোনো কালেই জাগেনি সর্বসাধারণের মনে।"

প্রসঙ্গত বলা দরকার, এবার হল্যাণ্ডে ছুটি কাটাতে গিয়ে হঠাৎ রোমে আমন্ত্রিত (সেই সঙ্গে কয়েকজন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ছাত্র) হয়ে মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্টদের ফাঁদে পড়েছিলেন। কয়েক বছর আগে, এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অমিয়বাবু তাঁর স্মৃতিচারণ করে লেখককে এই ঘটনার গূঢ় কারণগুলি বর্ণনা করে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রস্তুতিতে মুসোলিনী এবং ফ্যাসিস্ট নায়কেরা কিভাবে ইতালির সৈন্য ও সাধারণ লোককে প্রলুব্ধ এবং উন্মত্ত করে তুলছিল, অমিয়বাবু তাঁর এই স্মৃতিচারণে তার ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। অন্যত্র আমরা অমিয়চন্দ্রের এই মূল্যবান স্মৃতিচারণগুলির সংকলন (দ্র: "রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ" পৃঃ ৮৪-৯৪) করে দিয়েছি।

ইতিমধ্যেই সম্ভবত জানুয়ারীর ৩/৪ তারিখের মধ্যেই 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হয়ে যায়। কবির আশঙ্কা ইংরেজ সরকার হয়ত গোঁয়ার্তুমি করে এ বইটি নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। ৬ই জানুয়ারি (১৯৩৫), কবি এক পত্রে (চিঠিপত্র ১১শ।। ১৩১-৩৯) অমিয়চন্দ্রকে এ খবর দিয়ে লিখছেন:

"চার অধ্যায় প্রকাশ করে দিয়েছি। বিশ্বাস করিনে কর্তারা ওটা বন্ধ করে দেবে—বন্ধ করবার ন্যায্য কারণ কিছুমাত্র নেই, তৎসত্ত্বেও যদি উপদ্রব করে তবে সেটা বোকামি হবে।.....যাই হোক্ বইখানা যখন প্রকাশিত হোলোই তখন ওটা তর্জমা করবার কোনো হেতু রইল না। সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এ রকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, যদি তার সজীবতা না থাকে।"

এই পত্রে আধুনিক ইংরেজ ও ইউরোপীয় সাহিত্য এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালীন আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্যচর্চা এবং বক্তব্যের আসল স্বরূপ ও তাৎপর্যটি কি,—তার লক্ষ্য ও গতি কোন্ অভিমুখে ইত্যাদি প্রসঙ্গে কবি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নানা দিক থেকেই কবির এই সাহিত্য ও শিল্পমূল্য-বিচার খুবই তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। কবি একজায়গায় (চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড।। পৃ. ১৩১-৩৯) লিখছেন:

"....আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত।.....আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্চে না ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাজী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে।....

"আমাদের দেশের তরুণদের কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজ কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে ভিত্তি বদল করতে পারে না। যে সৌন্দর্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন।....সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন।.....এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের। তাই বারেবারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরেজ কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন; যে-তরুণের মন কালপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদির রসে মত্ত কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ।...."

আসলে আধুনিক ইংরেজি তথা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কবি যে একেবারে ওয়াকিবহাল ছিলেন না—তা নয়। যে মূল দার্শনিক ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্য গড়ে উঠছে, তার মূল মর্মকথাটা কবি তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও অনুভূতির সাহায্যে অত্যন্ত অল্প কথায় এখানে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তবে কতকটা অভিমানভরেই তিনি এই চিঠিতে বারে বারে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অমিয়বাবু এর পর থেকে আধুনিক ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কবিকে অবহিত রাখার জন্য বইপত্র সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠি পাওয়ার পর তিনি কবিকে তাঁর জবাবী-পত্রের এক জায়গায় লিখলেন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫):

"আপনার চিঠিখানি প্রবাসী কি পরিচয়ে ছাপানো দরকার, আমাদের লেখকদের চোখ খুলবে। আধুনিক সাহিত্যের ভিতরকার কথা এমন করে বলেচেন। এদিক থেকে এঁরা যা বলতে চান তা বড়ো করে লিখচি; তাড়াতাড়িতে চিঠি শেষ করতে পারলাম না পরের মেলে পাঠাবো। Yeatsএর এই কবিতাটি বেশ লাগলো; তিনি নিজের কথা বলচেন আধুনিক অতিবুদ্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে—

God guard me those thoughts men think
In the Mind alone—
He that sings a lasting song
Thinks in his marrow bone

From all that makes a wise old man
That can be praised by all
Of what am I that should not seem
For the song's sake a fool ?

I pray—for fashion's word is out
And prayer comes round again—
That I may seem though I die old
A foolish passionate man.

Eliot পন্থীর উত্তরে এর চেয়ে ভালো এদের কেউ লিখতে পারেন নি। Sturge Moore এর সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখা হয়েছিল.....বড়ো ভালো ওঁর সৌম শান্ত ব্যবহার".... লক্ষণীয় এলিয়টের অপেক্ষা ইয়েটসের কাব্যসচেতনতা ও বিচারবুদ্ধির উপর অমিয়বাবু বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

"চার অধ্যায়" বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্পর্কে কবি একটা ক্ষীণ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। অমিয়চন্দ্র এ খবরে উদ্বিগ্ন, ইংরেজি তর্জমার কাজ

*রানী মহলানবীশ এর নাম লিখেচেন Carmelo Umberto Rapicovali

শেষ। অনেকেই পড়ে তারিফ্ করেছেন। 'এসিয়া' কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশিত হলে পরিণামে ভালো হবে না, ক্ষতি হবে— একথা তিনি চিঠিতে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি :

"ছাপানো 'চার অধ্যায়' নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েচে কিনা জানতে ব্যগ্র থাকব। তর্জমাতো দেখচি প্রত্যেকেরই ভালো লাগচে, এইবার আমার হাতে ফিরে আসবে। আগে থাকতে বিশেষ দুচারজনের জানা থাক্‌লে একটু সুবিধা হয়, যদি Book Societyর Choice ঠিক করা যায় তাহলে তো আর ভাবনা নেই। হয়তো এখান থেকে ভারতবর্ষে পাঠালে পথে তাও আটকাবে কিন্তু কপি রেখেই পাঠাবো। এই বই যে য়ুরোপে সর্বত্র নাড়া দেবে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। Magazine-এ বার করলে বইয়ের ক্ষতি হবে সবাই বলচেন। East & West তো পেয়েচেন...."

কিছুদিন পরে অমিয়চন্দ্র 'চার অধ্যায়'এর ইংরেজি তর্জমা কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। এর পরের চিঠিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, 'চার অধ্যায়'এর ইংরেজি তর্জমা প্রকাশের ব্যাপারে কবি ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারছেন না। ৭ই মার্চের (১৯৩৫) চিঠিতে লিখছেন,—"চার অধ্যায় অনুবাদের কপি পাঠিয়ো না হয়ত পথেই মারা যাবে। তোমার তর্জমা পুনঃসংস্কার করবার মতো মেজাজ আমার নেই—ঐখানেই ছাপিয়ে দিয়ো। যদি ছাপানো দরকার না বোধ করো তাহলে ছাপিয়ো না।" আবার কয়েকদিন পর লিখছেন (২৮শে মার্চ) "চার অধ্যায়ের তর্জমা *Asia*তে দেওয়া কর্তব্য কিনা রথী ঠিক করবেন। ঐ কাগজের খাতিরে ইংলণ্ডে ছাপা বন্ধ রাখা চলবে না।.....এখনো বলচি আমার অপেক্ষা না রেখে তুমি ছাপতে দিয়ো।...."

১২ই এপ্রিল আর একটি পত্রে লিখছেন :

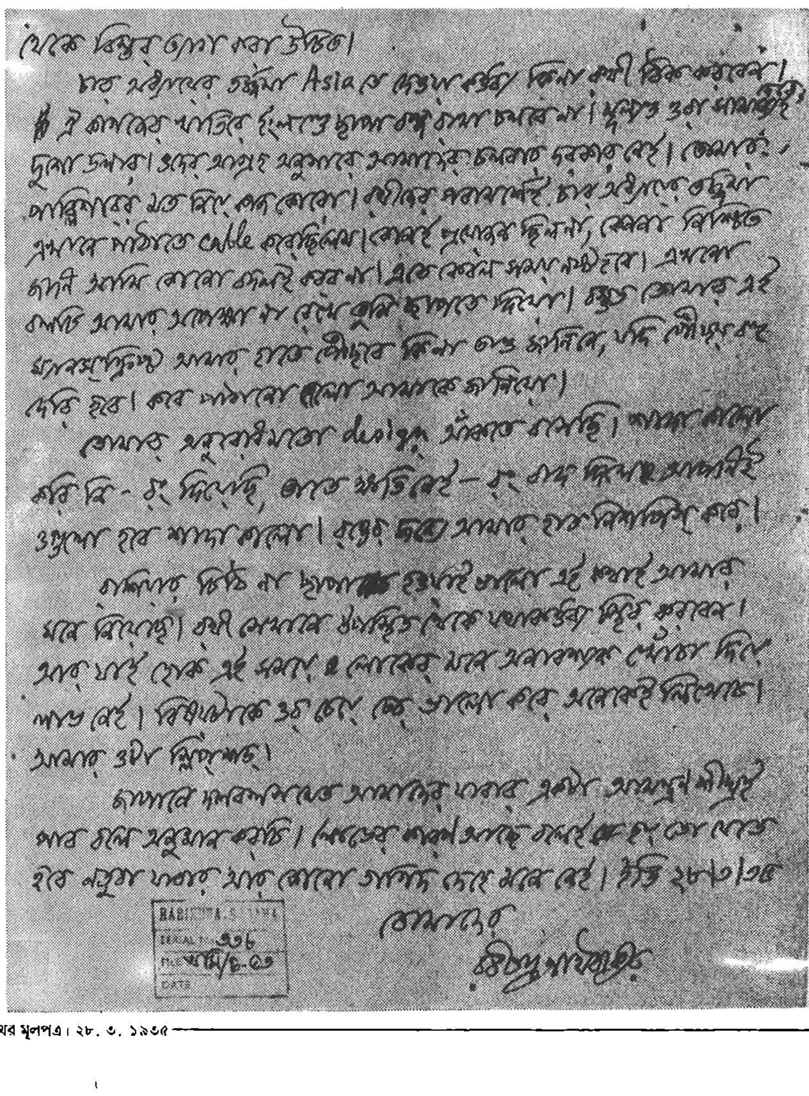
"মেল পাবার দুই একদিন পরে তোমার তর্জমা এসে পৌঁছল।....তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই ওখানকার সমজদারদের মত নিয়ে যদি বোঝো এটা কেবলমাত্র চলনসইয়ের চেয়ে বেশি নয়, অথবা তার চেয়েও কম তাহলে ছাপতে দিয়ো না।"....

কবি তার ইংরেজি কবিতার "চয়নিতা' এবং Collected Edition এর সম্পাদনার ব্যাপারে অমিয়বাবুর ওপর পূর্ণ অধিকার দিয়ে ওই পত্রেরই উপসংহারে লিখছেন (চিঠিপত্র ১১শ ॥ পৃ. ১৫৬) :

"Collected Editionএ ছেঁটে ফেলার কাজে একটুও মমতা দেখিয়ো না। তোমাদের কার্ট্ ব্লাঁশ অধিকার দিচ্চি। আমি যা দাগ দিয়েছি তাতেও আমার মন তৃপ্তি পায় নি। লাগাও কোপ। পরিবর্তন যদি উপযুক্ত লোকের হাতে হয় কিসের আপত্তি ? তুমিই আমাকে represent করতে পারবে। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় Sturge Mooreএর মত কবি যদি মাজাঘষা করেন আমি স্বয়ং থেকে তার বেশি কিছুই করতে পারি নে।...."

এর থেকেই অনুমান করা যায়, অমিয়চন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও বিচার-শক্তির ওপর কবির কি সুগভীর আস্থা এবং ভরসা ছিল।

এরপর গবেষণাকাজে অমিয়চন্দ্রকে আরও প্রায় তিন বছর বিলেতে থাকতে হয়। এই তিন বছর বিলেতে থাকাকালে শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেশ কিছু পত্র-বিনিময় হয়। এর মধ্যে ৭ই মার্চের, কবির দীর্ঘ পত্রখানি দেশের এবং



অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূলপত্র। ২৮. ৩. ১৯৩৫

সেই সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনীতিক প্রসঙ্গে কবির সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ডে কবির পত্রগুলি ইতিপূর্বেই সংকলিত হয়েছে। দেশের এবং বিশ্বপরিস্থিতির এই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে কবি সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিই যেন তাঁর শেষ আশা-ভরসা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড।। পৃ. ১৪৫-৪৬):

"সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখ রাঙানীর ভান করে অথবা দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।.....কিন্তু সর্বমানবের তরফে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্যরাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুকালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধন-মদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।"

লক্ষণীয়, ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশ এবং নিপীড়িত মানুষের বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার এই সুমহান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁর আর কোনো রচনায় এতোখানি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর আন্তরিক আশা ও আস্থার কথা এমন করে ঘোষণা করেন নি।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৫ সালের আগস্টের শুরুতেই অমিয়চন্দ্র ছুটি কাটাতে ইউরোপে গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি 'অতি কষ্টে' কয়েক দিনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রায় ছয় বছর পর সোভিয়েট দেশে গিয়ে, সেখানকার বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যে সেখানকার মানুষের বিপুল কর্মোন্মাদনা, ত্যাগ ও তাদের মানবকল্যাণমুখী সুমহান আদর্শনিষ্ঠা ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে অমিয়চন্দ্র গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'ন। ফেরার পথে তাঁর গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে এক পত্রে তিনি কবিকে লিখছেন। (১১ই আগস্ট ১৯৩৫) (Gulf of Finland):

"রাশিয়ায় গিয়েছি বহুকষ্টে ফেরবার পথে শেষ মুহূর্তে লেনিনগ্রাডে Prof. Stcherbatskyর সঙ্গে দেখা করেচি। এত আনন্দ হল বলতে পারি না। অনেক কথা বলেচেন, দেশে গিয়ে জানাতে পারব। Jacobi আর তিনি Darmstadএ আপনার সঙ্গে একটা দিন কাটিয়েছিলেন সে-কথা কখনো ভুলতে পারবেন না, বললেন। এ চিঠি ইচ্ছে করে রাশিয়ায় পোস্ট না করে এখান থেকে পাঠাচ্ছি।

"মস্কো আবার দেখে এলাম। এই ছয় বৎসরে যে কী পরিবর্তন ঘটেচে তা বিশ্বাস করাই শক্ত। অথচ বুঝতে পারি না বিরাট সংঘচেতনায় চালিত মানুষের জীবন ধ্রুবকেন্দ্রের বাহিরে ধূমকেতুর মতো কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মানবসেবার এত বড়ো ধ্যান-শক্তি আর কোথাও তো এখনো এমনভাবে দেখা দেয়নি।—কী প্রচণ্ড এই কল্যাণকর্মের ব্যবস্থা, কত ত্যাগ কত বীর্য; জ্ঞানবুদ্ধির কী তপস্যা। সার্থক সাধনার ফল চতুর্দিকে। কিন্তু মানুষের চেয়ে বড়ো কিছুকে মানবে না, ব্যক্তি বিশেষত্বকে কোথাও নিভৃত আসন দেবে না, অন্তরের যেখানে সার্থকতার মূল্য তা উচ্ছেদ করে ঐক্যের মঙ্গল আয়োজন। হয়ত প্রতিক্রিয়ার এই পর্ব আরো কিছুকাল চলবে—এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা শক্ত নয়। বহু অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে দেখেচি—Collective Farm এবং Culture Communalই সব চেয়ে দ্রুত এগিয়েচে মনে হল।"

সোভিয়েত দেশের মানুষ কবি রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁদের মাঝে আসবেন বলে কত আশা করে আছে—সেকথা জানিয়ে অমিয়বাবু পরিশেষে লিখলেন, "এত ভাল লেগেচে—এখানে আপনি একবার আসবেন—এরা কতকাল আশা করে আছে। এখন এরোপ্লেনে বিশেষ আরামে এবং সহজে য়ুরোপে যেখানে ইচ্ছে আসতে পারবেন। ফিরে গিয়ে আমার বিশেষ বলবার আছে।"

এইভাবে অমিয়চন্দ্র সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং তার সুমহান আদর্শবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবহিত রাখার চেষ্টা করে গেছেন, এটাই লক্ষ্য করা যায়।

এর প্রায় মাস দেড়েক পর—কয়েকটি বই কবিকে পাঠিয়ে দিয়ে, অমিয়চন্দ্র এক পত্রে এলিয়ট এবং সেসিল ডে-ল্যুইস্ প্রমুখ ইংরেজ নবীন ও আধুনিক কবিদের কাব্যচর্চা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য এক পত্রে লিখছেন (২৩শে অক্টোবর ১৯৩৫):

"জাহাজের ডাকে আজ তিনখানি বই পাঠালাম।—এই চিঠির সঙ্গে পৌঁছবে। মনে হয় The Land আপনার ভালো লাগবে—ওতে মাটির কথা আছে, ঋতু পর্যায়ের কাহিনী। 'বীথিকা'র দু'একটি সুর ওতে বেজেছে, লেখিকা এখানকার কবিদের মধ্যে অন্যতম। *Eliot* এর সঙ্গে সেদিন সভায় তর্ক-বিতর্ক হলো—তিনি *Pure Poetry*র সন্ধানে সমস্ত জীবনকে অস্বীকার করতে চান। *The Land* জাতীয় কাব্য যে ওঁর কাছে কাহিনীর মূল্য পাবে, কাব্যের নয়। বিশ্লেষণের পদ্ধতি বাদ দিয়ে এইটে স্পষ্ট বুঝেছি ইংরেজি কাব্যের মোড় ফিরেচে। *Eliot* এর নূতন Drama *Murder in the Cathedral* এর *chorus*গুলিতে জীবনের বিচিত্র সুরগুলিকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি।

সেসিল ডে-ল্যুইস্ সম্পর্কে অমিয়চন্দ্র লিখলেন:

"Day Leui's-এর বই reactionary যদিও ওঁরা বলবেন revolutionary—তবে ওকেও মানুষের কাব্যচেষ্টাকে মানুষের সমাজের রাষ্ট্রের আত্ম-প্রকাশধর্মী বিচিত্র ব্যাকুলতার সঙ্গে উনি এক করতে চেয়েচেন। এতেও দেখি এই সত্তার সামীপ্য, সাযুজ্য এবং ঐক্যচেতনার অনুভূতি।....."

যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বাংলার তৎকালীন সব চেয়ে প্রগতিশীল ও বামপন্থী কবিদের কয়েকজন তখন এলিয়টকে নিয়ে খুবই মাতামাতি করছেন, আধুনিক ইংরেজি কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ কুলচূড়ামণিকে পাওয়া গেল, বলে। বস্তুত, তাঁরা তখনও এলিয়টের *Waste Land* এবং *Ariel Poems* এর কবিতাগুলি নিয়েই বেশি হৈ-চৈ করছেন,—যখন নাকি এলিয়ট স্বয়ং তাঁর এই পর্ব ছাড়িয়ে Pure poetry বা 'বিশুদ্ধ কবিতা'র সন্ধানে আত্মনিমগ্ন। এলিয়েটের এই বাস্তব জীবনবিমুখতা তাঁর বিশুদ্ধ কবিতা বা কাব্যসৃষ্টির ব্যাখ্যাভাষ্য অমিয়বাবু গ্রহণ করতে পারেন নি এই নিয়ে এলিয়টের সঙ্গে অমিয়চন্দ্রের তর্ক-বিতর্ক [illegible]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৩৫ এর প্রথম ভাগেই এলিয়টের *The Murder in the Cathedral* কাব্যনাটিকাটি প্রকাশিত হয়। [illegible] অডেন স্পেন্ডার, ইশারউড় সেসিল ডে ল্যুইস—প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্যচর্চার বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করে কবিকে চিঠিতে লিখেছেন,—'ইংরেজি কাব্যের মোড় ফিরেচে'। বস্তুত আবিসিনিয়া ও স্পেনের ঘটনার এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ওই সব আধুনিক ইংরেজ কবিরাও নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট গুছিয়ে বলতে পারেন নি।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৫-এর ২রা অক্টোবর,—অর্থাৎ মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণের পর থেকেই ইংরেজ কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের অন্তত একটা অংশের বড়ো রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়। এরকম একটা উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে অমিয়চন্দ্রও

নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন, যাঁরা আসন্ন যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, কিভাবে তাকে ঠেকান যায়। এমন দিনে ভারতবর্ষের বিবেকবাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনো বাণী আসলে তাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে—এই অনুরোধ জানিয়ে অমিয়চন্দ্র কবিকে ২রা আগস্ট ১৯৩৫ একটি চিঠি দিয়েছিলেন। এর প্রায় মাস দুই পরে আর একটি চিঠিতে লিখলেন (১৩ই অক্টোবর ১৯৩৫):

"*Manchester Guardian*-এর কাছ থেকে চিঠি পাঠাই।

Aldous Huxley, Lord Allen, Gerald Heard, S. Doglas, Prof. Stephens এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে এখানে একটা নতুন অনুষ্ঠান গড়ে তুলেচি।.....

"য়ুরোপে অনেক দিন থেকেই যুদ্ধ ঘনিয়ে আসচে। কিন্তু এখন চারদিকে অন্ধকার এবং ভয় অত্যন্ত আসন্ন হয়েছে—এরা যে কী ভাবে বাস করচে, পথ খোঁজবার চেষ্টা করচে তা দেখে স্থির থাকা যায় না। আমাদের আপন আত্মীয় মানুষ—সকলে মিলে তাই চেষ্টা করতে হবে যাতে যুদ্ধের বিভীষিকা না নামে—এবং তার প্রধান পথ হচ্চে এই প্রলয়ের মূলে কী আছে তা আবিষ্কার করা। য়ুরোপীয় সমস্যার সঙ্গে এশিয়া আফ্রিকায় এদের কৃত যুগ যুগব্যাপী অন্যায়ের কী রকম ঘনিষ্ঠ যোগ তা এরা এবার কিন্তু বুঝতে পারচে। কোনো সমাধান হতেই পারে না সমগ্র মানবজাতিকে এক ভূমিকায় না দেখতে পারলে। আপনার রচনা তাই আমাদের পথ দেখাবে—বারে বারেই সেখানেই ফিরে আসতে হবে।...."

আবিসিনিয়া-যুদ্ধকালে অমিয়চন্দ্র কিভাবে একটার পর একটা চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'আফ্রিকা' কবিতা এবং তার ইংরেজি তর্জমাটি সংগ্রহ করে কিভাবে সম্রাট হাইলে-সেলাসী এবং বিলেতের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত আলোচনা (দ্র: পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৯৪; 'রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ।' ॥ পৃ. ৭০-৯৫) করেছি, যার মধ্যে অমিয়চন্দ্রের কয়েকটি পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আবিসিনিয়া এবং স্পেনে ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে কবিকে লেখা অমিয়চন্দ্রের আরও কয়েকটি পত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। ১৯৩৬ সালে ৩১শে ডিসেম্বর, কবিকে লেখা পত্রের শেষাংশটিতে অমিয়বাবু লিখেছিলেন,

'আফ্রিকা আজ অত্যাচারিত দেশের চরম বেদনা ভোগ করচে—বোধ হচ্ছে এইবার নাট্‌সী জার্মাণরা এই হতভাগ্য দেশের অন্য আর এক প্রান্তে যুদ্ধ বাধাবে, হয়তো স্পেনের ব্যাপারে তাদের যোগদানের উদ্দেশ্য মরক্কো এবং West Africa-য় পরে আক্রমণ করা। Liberia-কে তো মেরে রেখেচে—ওখানে দ্বিতীয় Abysinia-কাণ্ড যে-কোনো দিন ঘটতে পারে। শত লক্ষ নির্যাতিত দুঃখী আফ্রিকাবাসী আজ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মিলিত চক্রান্ত এবং সাংঘাতিক যন্ত্রের আঘাতে জর্জরিত।

"অথচ আফ্রিকা বর্বরতার আশ্রয় নয়—ওখানেও মানবদেবতা আদিম যুগ থেকে আত্ম প্রকাশিত। য়ুরোপের সবচেয়ে কলঙ্কের যুগ—ভিক্টোরীয় যুগ—পৃথিবী-জুড়ে অতিভয়ানক Imperialism এর দখল পাকা করেছিল।.....পৃথিবীজুড়ে আত্ম এর পররাষ্ট্র-নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির সাধনা এখনকার নূতন বিদ্যালয় কেন্দ্রগুলির সর্বপ্রধান সাধনার অঙ্গ বলে মেনে নিচ্চে, এ দেখে মনে ভারি উৎসাহ বোধ হয়।—রাশিয়ার তো কথাই নেই,—এমন কি Fascist দেশেও নূতন যুগের চেষ্টা আর বেশি দিন চাপা দিতে পারবে না। কিন্তু বাণী আসচে ভারতবর্ষ থেকে—আফ্রিকা থেকে—এদেরও শ্রেষ্ঠ চেষ্টা প্রেরণার জন্য মুখ ফিরিচে য়ুরোপের বাইরে।....."আফ্রিকার আর্ট এবং বিশেষভাবে তাদের সমাজ গঠনের প্রণালী তাঁদের Tribal ethics আজ আমাদের বিস্মিত করেছে।"...

তবে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের চেয়েও স্পেনে ফ্যাসিস্ট-অভ্যুত্থানের (১৮ই জুলাই, ১৯৩৬) ঘটনাটা অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সেদিন সারা বিশ্ব-জুড়ে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এমনটি আর কখনো হয়নি। সে-ইতিহাস আজ প্রায় সকলেরই জানা। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে সেদিন International Brigade এর নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী শ্রমিক কৃষক ছাত্র ও যুবকেরা স্পেনের রণাঙ্গনে রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ করে যে অপরিসীম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, জগতের ইতিহাসে তার আর কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। সেদিন স্পেনের রণাঙ্গনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লেখক শিল্পীদের সঙ্গে র‍্যালফ্ ফকস্ কড্‌ওয়েল অডেন, স্পেণ্ডার, জন কর্নফোর্ড প্রমুখ ইংরেজ লেখক শিল্পীরাও যুদ্ধ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, সেদিন স্পেনে ইংরেজ শহীদদের তালিকায় র‍্যালফ্ ফকস্ কড্‌ওয়েল, কর্নফোর্ডদের সঙ্গে অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যারের পুত্র বেসিল ম্যারের নামও যুক্ত হয়েছিল। সেদিন শোক-সন্তপ্ত অধ্যাপক গিলবার্ট ম্যারে-পরিবারকে সান্ত্বনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দেওয়ার জন্য অমিয়চন্দ্র কবিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই পত্রের (Balliol College, April 13, 1937) শুরুতেই 'আফ্রিকা' কবিতার ইংরেজি তর্জমাটির প্রাপ্তিস্বীকার করে পরিশেষে অমিয়বাবু লিখছেন:

"Prof. Gilbert & Lady Murray-কে আপনি যদি তাঁদের এই দুঃসহ শোকে সমবেদনা জানিয়ে নিজের হাতে এক লাইন লেখেন তো বড়ো ভালো হয়। অমন প্রতিভাসম্পন্ন সুন্দর যুবক কম দেখেচি Basil Murray-র মতো: Spain এর বেদনা সহ্য না করতে পেরে Valencia তে গিয়ে নানারকম সেবার কাজে অসম্ভব পরিশ্রম করেছিলেন, হঠাৎ যখন শরীর ভাঙল জাহাজে করে Alicante-র অভিমুখে ডাক্তারের পরামর্শের জন্যে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল, দুদিনের মধ্যে জাহাজেই মারা গেলেন। চারদিকে অনাহার এবং মারীর হাওয়া, কী একটা উৎকট রোগ ধরেছিল; দুঃখী অত্যাচারিত Spanish Government-এর অসহায় নরনারীদের জন্যে প্রাণ দিলেন। এই বয়সে পুত্রশোকে Murray-রা অভিভূত হয়ে পড়েচেন, যদিও এঁরাও সর্বক্ষণ খাট্‌চেন যুদ্ধের শান্তির জন্যে, সত্যপ্রচারের নিয়ত চেষ্টায়।"

স্পেনের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধে একজন ভারতীয়ও অংশগ্রহণ করেছিলেন* এর জন্য গর্ববোধ করে অমিয়বাবু তাঁর চিঠিরই এক জায়গায় লিখছেন:

"স্পেনে সম্প্রতি একজন ভারতীয় গিয়েছিলেন; Madrid এর University Cityর Front Line Trench এর কাছে যুদ্ধ চলচে; সেখানে Caballers সৈন্যবৃন্দের সামনে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারতীয়ের এই বীর্য, এই মৈত্রীভাব দেখে ইস্পানী সৈন্যরা খুশি হল, তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—'দেখ তোমাদেরও স্বাধীনতা জয় করতে হবে; কিন্তু এ পরে যেন না হয়। কঠিন প্রাণ বর্মাবৃত যোদ্ধার মুখে যুদ্ধের এই নিস্ফল মিথ্যার আলোচনা শুনে ভারতীয়(টি) হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হলেন। ইস্পানী-সৈন্য জানে আজ যুদ্ধ কাকে বলে, তবে তার চোখে কোনো মোহ নেই। দেশ হোক, যাই হোক নরহত্যার এই পথ স্বাধীনতার পথ নয়, এমন কথা সে বলতে পারল।"

অডেন-স্পেন্ডার প্রমুখ আধুনিক ও প্রগতিশীল ইংরেজ কবিদের মুখে স্পেনের ইস্পানীরা কি বীরত্বের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রী এবং মা-বোনদের নিয়ে তাদের জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, শুনে অমিয়বাবু কবিকে ওই চিঠিরই শেষের অংশে লিখছেন:

*আন্তর্জাতিক বাহিনীর হয়ে আরও দুজন ভারতীয় স্পেনে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। একজনের নাম বাল মুকুন্দ হেদ্দার। মুক্তিলাভের পর দেশে ফিরে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনি।

"স্পেনে আরো একটী দৈনিক ঘটনা Auden Spender—এঁদের কাছে শুনেছিলাম—এঁরা সম্প্রতি Madrid এ গিয়েছিলেন, আবার যাবেন। ইস্পানী সৈন্যরা কম খেয়ে, নিরন্তর দুঃখ যন্ত্রণায় ভুগেও সহজ মানুষভাব হারায়নি।—যতদূর পর্যন্ত পারে তাদের সঙ্গে স্ত্রী বোনেরা পাশে পাশে চলেচে, আপাদমস্তক যুদ্ধসাজ পরেও কোলে শিশুকে তুলে নিচে, কিছুতে ছাড়তে পারছেনা। Franco এদেরই উপর পাপের বন্যা বইয়েচে, এরা যুদ্ধবিগ্রহ চায় না, সহজ মানুষ এরা। এমন দেশকে সুন্দর করে তুলছিল নূতন যুগের উৎসাহে, এমন সময় ফ্যাসিস্টদের উন্মাদ আক্রমণ শুরু হলো।

"আজ য়ুরোপ জুড়ে মানুষের কি দুঃখ, আমাদেরও তাই।

* * *

'Auden-এর ভাষায় বলতে গেলে আশার কথা এই যে 'Our separate sorrows are a single hope'—

We ride turning globe, we stand on a star. It has thrust us up together : it is stranger than we : It is our separate sorrows are a single hope."

(নতুন বই "Look, stanger !")

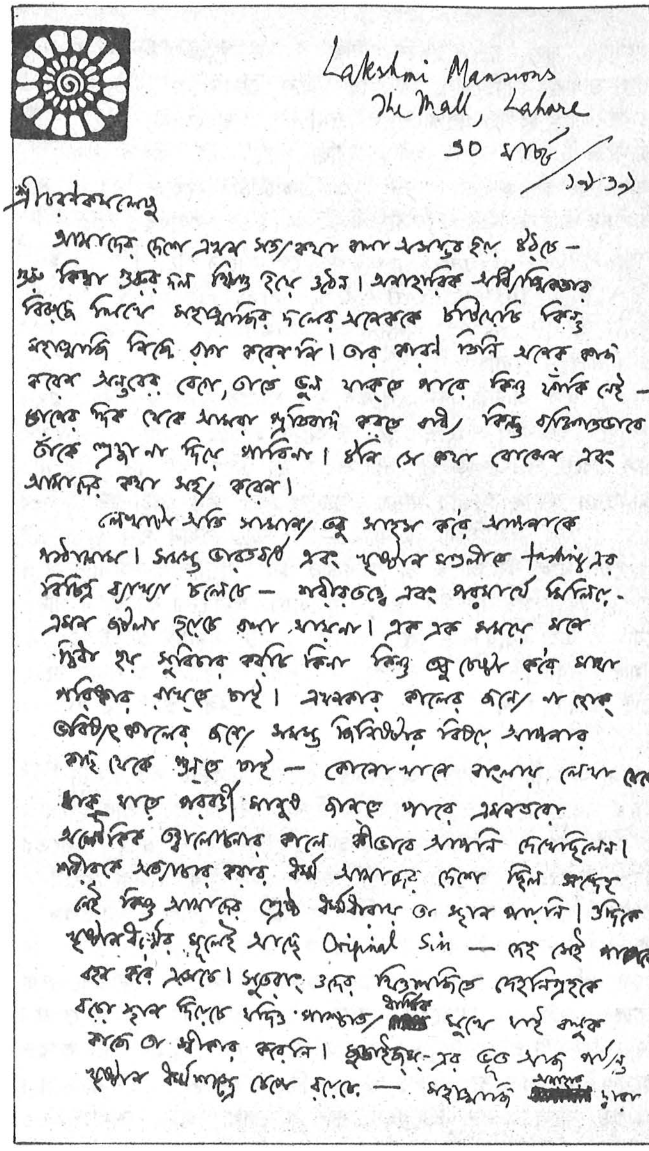
স্পেনের প্রতিরোধ যুদ্ধের ওই প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও উত্তেজক পটভূমিতে বিলেতের অডেন স্পেণ্ডার প্রমুখ কবিদের চিন্তা-ভাবনা এবং রচনাদি সম্পর্কে কবিকে অবহিত রাখার জন্য অমিয়চন্দ্র এইভাবে একটার পর একটা চিঠি লিখে চলেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের হালফিল রচনা সম্পর্কে অডেন স্পেণ্ডারদেরও খুব কম আগ্রহ ছিল না। অমিয়চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী এবং প্রকরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। এই চিঠির প্রায় বছর খানেক আগে (১৭/১১।৩৬) অমিয় চক্রবর্তী কবিকে এই খবর দিয়ে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

"তরুণ কবি Stephen Spender এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আধুনিক free Verse এর যুগে Yeats এর মতো আপনি experimentation এর পরে এই সংহত, মিলান্ত, ছোটো কবিতার দরকার এরা অনুভব করচে। আমার মনে হল, বাংলা কাব্যের দরকার epigrammatic style এ লেখা অথচ ভাবের ঘনীভূত মাধুর্য্যে ভরা কবিতা সৃষ্টি করা। আপনিই পথ দেখাতে পারেন।"....

১৯৩৭ সালের ২রা আগস্ট, অমিয় চক্রবর্তী অক্সফোর্ডে দীর্ঘকাল গবেষণার এবং ডক্টরেক্ট পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। সে দিনটি ছিল 'আন্দামান দিবস'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কলকাতায় 'টাউন হলে'র বিরাট জনসভায় আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। পরদিন শান্তিনিকেতনে অমিয় চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানান হয়। ১৪ই আগস্ট ছিল, নিখিল ভারত 'আন্দামান দিবস'। কবি ঐদিনই শান্তিনিকেতনের এক সভায় আন্দামান বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন। ঐদিনই কবি অমিয় চক্রবর্তীকে বাংলার গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনের কাছে পাঠিয়ে দেশবাসীর নিদারুণ মনোবেদনার কথা জানিয়ে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তির অনুরোধ জানালেন।

শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকার পর অমিয় চক্রবর্তীকে কতকটা জীবিকার সন্ধানেই লাহোরে যেতে হয় (সেপ্টেম্বরে) গবেষণা কাজের দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল *'Humanism in Modern Indian Thought'*

সারা দেশে তখন খুবই রাজনীতিক উত্তেজনা। কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে,—বিশেষ করে বাংলায়। বাংলায় তখন হক-নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীত্ব। জওহরলালের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *'All India Civil Liberties Union'* এর অনারারী প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন অপরদিকে আবিসিনিয়া স্পেন ও চীনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিবাদে



দেশে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। স্পেন ও চীনের সাহায্য প্রেরণের জন্য তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এ ক্ষেত্রেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্পেন ও চীনের সাহায্য তহবিল সংগ্রহের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। লাহোর থেকে অমিয় চক্রবর্তী এই আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানিয়ে কবিকে (জানুয়ারী ১৯৩৮) এক পত্রে লিখছেন :

"এখানে ২০শে তারিখে জওহরলাল আসবেন। তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব রাজনীতিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে, চীন জনসমাজের জন্যে সমগ্র ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে আমরা কি করতে পারি। আমরা দিতে পারি সামান্য অর্থসাহায্য, আমাদের ব্যথিত চিত্তের শ্রদ্ধা—কিন্তু আজকের দিনে এরও মূল্য কম নয়। ইথিওপিয়ার সম্রাট দুঃখ করছিলেন বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বড়ো রকমের বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি চরম যন্ত্রণার কালে—মহাত্মাজি প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান নি—একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ থেকে ঐরকম বাণী এসে পৌঁছলে ওঁদের কিছু সহায়তা হ'ত। আপনার কবিতা যখন বেরোলো আফ্রিকা সম্বন্ধে তখন আপনার নিজের রচিত ইংরেজি তর্জমা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম, তিনি শান্তি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, উগাণ্ডার রাজকুমার আমাদের বন্ধু নীয়াবঙ্গো আপনার রচনাটি সমগ্র আফ্রিকার বান্টু এবং সোয়াহিলিভাষী আফ্রিকানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে

হয়েছিল, যখন অনেক কিছুই খবরের কাগজে কালিছাপায় কালো হয়ে মিলিয়ে যাবে তখন এই কবিতা আফ্রিকা এবং ইথিওপিয়ার নবজাগ্রত মানুষসমাজে নূতন হয়ে জ্বলতে থাকবে। আজকের চীনদেশব্যাপী দুঃখের দিনে ভারতবর্ষ যে ভাবে জেগেচে তার পিছনে আমাদের চিত্তবৃত্তি শুধু নয় কল্যাণবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত সংঘচেষ্টার উদ্দীপনা দেখা যাচ্চে—কংগ্রেস আপনার নাম এবং দানকে সামনে রেখে সমস্ত ভারত জুড়ে মঙ্গলচেষ্টার ব্যবস্থা করেচে। যে-পৃথিবীতে বেঁচে আছি তার চরমগতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ফিরে পাই যখন এইরকম করুণার মূর্তি হঠাৎ দেখা যায় শতকালিমার মধ্যেই।"

লাহোরে থাকাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েক জন মনীষী এবং শিল্পী-সাহিত্যিকের রচনা পাঠিয়ে কবিকে সে-সব রচনা সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য অমিয়বাবু তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। ডেনিশ কবি-দার্শনিক কিয়েৰ্কগার্ড (Kierkegaard, Soren) এবং মহান রুশশিল্পী নিকোলাস রোয়োরিখ (Nicholas Reorich) সম্পর্কে কবিকে খবর দিয়ে অমিয়বাবু তাঁর চিঠিতে (লক্ষ্মী ম্যানসন, লাহোর ৮ই ১৯৩৮) লিখছেন:

"Danish কবি-দার্শনিক Kierkegaard এর বইটা পাঠালাম—য়ুরোপে হঠাৎ ওঁর রচনা নিয়ে উৎসাহ লেগেচে। ডায়েরির কিছু অংশ এবং কাব্য সম্বন্ধে Kierkegaard এর মন্তব্য খুব ভালো লাগ্‌লো।

"Roerich এর ওখানে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য জায়গায় আছেন। চারিদিকে বরফের পাহাড় স্তব্ধ অরণ্য; ওঁদের বাড়ির ভেতরে আগাগোড়া কারুসজ্জিত। দাসদাসীও রাশিয়ান। আধুনিক রাশিয়াকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। ছবির ধ্যানে ও রচনায় Roerich পরিবার নিযুক্ত—সকাল থেকে সন্ধ্যা অসম্ভব পরিশ্রম করচেন হিমগিরির অন্তরে মূর্তি বারে বারে আঁকার কাজে।"....

১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যেই বিশ্ব পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক সংকট ভারতের আভ্যন্তরীণ সংকটকেও অত্যন্ত ঘনীভূত করে তোলে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে—এবং প্রধানত তা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নেই।

অনতিকাল পরেই,—আসন্ন ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষেই কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সামনেই কঠিন সংগ্রামের কথা মনে রেখে বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন চাইছিলেন। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা তাঁর পরিবর্তে পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করেন। সকলেই জানেন এই নির্বাচনযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়াই সবচেয়ে বিস্ময়কর। সীতারামাইয়ার এই পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার পর ঘটনাস্রোতের মোড় পাল্টাতে থাকে। যেটা লক্ষণীয়, ১৯৩৪ সালের পর গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ত্যাগ করেই এবং নিজেকে প্রায় আড়ালে রেখেই সাংগঠনিক কাজকর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সূচনাতেই তিনি আবার দেশের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রায় শুরুতেই রাজকোটে দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সমস্যা নিয়ে তিনি হঠাৎ অনশন শুরু করেন। তারে-বেতারে, সংবাদপত্রে এ খবর ফলাও করে প্রচারিত হয়। বড়লাট থেকে শুরু করে সকলের হস্তক্ষেপে অনশনও বন্ধ হয়, আর 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়', 'হিন্দুস্তান কি হিটলার কি জয়' ধ্বনিতে ত্রিপুরীর কংগ্রেসের মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। সুভাষচন্দ্রের শোচনীয় পরাজয় হয়।

কংগ্রেসের ওই নির্বাচন এবং বিশেষ করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই সব ঘটনায় সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যে কি ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লেখা (১৭ই মার্চ ১৯৩৯) তাঁর খোলাচিঠিগুলিতে তার তীব্র নিন্দাবাদ আর ভর্ৎসনা জানিয়েছিলেন, আজ প্রায় সকলেরই তা জানা আছে। এর এক জায়গায় কবি বলেছিলেন,

...."অবশেষে আজ কন্‌গ্রেস মঞ্চ থেকে হিটলারী-নীতির নিঃসঙ্কোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। আমাদেরই গুরুভজা দেশে লাগবার কথা। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্ট সাপ ফোঁস করে উঠেছে।....

"এবারকার কন্‌গ্রেসে এই ফ্যাসিস্টিক মুষ্টিপীষণের আত্মপরিচয় দেখে ভীত হলুম। এই রোগবীজ বিদেশী মহামারীর রোগশালা থেকে অবশেষে এসে পৌছল। ডান হাত দিয়ে নেশ্যনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত মূঢ়তা বিস্তারের উপায়। তুমি তো জানো আমাদের দেশে একদল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে, সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিকে তারা বিশ্বাস করে না। ফ্যাসিস্ট দলপতিরা দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না।..."

ত্রিপুরী কংগ্রেসে কারা ফ্যাসিস্ট জয়ধ্বনি দেয়, কাদের উদ্দেশে কবি এই নিন্দা ও ভর্ৎসনা জানালেন, সকলের কাছেই সেদিন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পাবার পর অমিয়বাবুও কম বিব্রত বোধ করেন নি। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে অমিয়চন্দ্র গান্ধীজীর অনুগামী ছিলেন। তবে তিনি গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। গান্ধীজীর অনেক কথা, অনেক জিনিস তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বমুহূর্তে গান্ধীজীর এই হঠাৎ অনশন করাটাকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কয়েকদিন পর কবিকে তিনি লিখলেন (৩০ মার্চ, ৩৯):

"আমাদের দেশে এখন সত্য কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠেচে—গুরু কিংবা গুরুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অনাহারিক আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে লিখে মহাত্মাজি দলের অনেককে চটিয়েচি কিন্তু মহাত্মাজি নিজে রাগ করেন নি।...জ্ঞানের দিক থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে বাধ্য কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা না দিয়ে পারিনে।...

"...সমস্ত ভারতবর্ষে এবং খৃষ্টান মণ্ডলীতে fasting এর বিচিত্র ব্যাখ্যা চলচে শরীরতত্ত্বে এবং পরমার্থে মিলিয়ে এমন জটলা হয়েছে বলা যায় না। এক এক সময়ে মনে দ্বিধা হয় সুবিচার করছি কিনা কিন্তু তবু চেষ্টা করে মাথা পরিষ্কার রাখতে চাই। এখনকার কালের জন্যে না হোক ভবিষ্যৎ কালের জন্যে সমস্ত জিনিসটার বিষয়ে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই—কোনখানে বাংলায় লেখা থেকে যাক্ যাতে পরবর্তী মানুষ জানতে পারে এমনতরো অলৌকিক তত্ত্বালোচনার কালে কিভাবে আপনি দেখেছিলেন। খ্রীস্টান ধর্মের মূলেই আছে Original Sin —দেহ সেই পাপকে বহন করে এসেচে। সুতরাং ওদের থিওলজিতে দেহনিগ্রহকে বড়ো স্থান দিয়েচে যদিও পাশ্চাত্য ধার্মিক মুখে যাই বলুক কাজে তা স্বীকার করেনি। জুডাইজিম-এর ভূত আজ পর্যন্ত খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে চেপে রয়েচে মহাত্মাজি অনশন দ্বারা সেই ভূতকে ভারতবর্ষে এনেচেন। তার সঙ্গে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও মিলিয়েচেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি গান্ধীজী কর্তৃক বিরলাদের বহু লক্ষ টাকার সেই 'অত্যাশ্চর্য' মন্দির উদ্বোধনের তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। তিনি লিখেছেন:

"বিরলা-দের বহুলক্ষটাকার মন্দির দেখে হতাশ্চর্য্য হয়েছি। এত বড়ো বহুমূল্য মূঢ়তা জীবনে দেখিনি—মূর্তিপূজা কতদূর উগ্র এবং অসুন্দর হয়ে আস্ফালন করতে পারে তার প্রমাণ।...মহাত্মাজি যদি দোতলায় উ...

রক্তাক্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্বছবি মন্দিরের গায়ে দেখতেন তাহলে ব্যবসায়ীর সৌধকে ধর্মস্থান বল্‌তে তাঁর উৎসাহ হ'ত না। উনি দ্বারের কাছে বিশ্রাম করে উদ্বোধন পর্ব সারলেন এবং চির দিনের মত ওঁর নাম জড়িয়ে গেল ১৯১৯ সালের হিন্দুত্বের সঙ্গে। জওহরলালকে সেদিন বল্‌লাম; তিনি বললেন, ঐ মন্দিরে তিনি যান নি, কোনদিন যাবেন না। কিন্তু ওঁরাও মুখ খুলতে চান না। ফলে দেশ জুড়ে আজ আবার ধর্মের আদিমতা আধুনিক হয়ে উঠ্‌চে লক্ষ টাকার বণিকদের কৃপায়।"

* * *

এইভাবে অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর এই অনশন-রাজনীতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ভাষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত দাবী করে চিঠি লিখছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিপূর্বে কয়েকবারই গান্ধীজীর এই অনশনতত্ত্ব এবং তাঁর এইসব মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিহার-ভূমিকম্প নিয়ে বছর পাঁচ আগে উভয়ের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য। অমিয় চক্রবর্তীর এই চিঠির জবাবে কবি গান্ধীজীর এই অনশনতত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পুনরায় তাঁর অভিমত জানাতে গিয়ে লিখলেন (৩রা এপ্রিল ১৯৩৯):

"অনশন সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে একদা আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করেছি,—তখনকার কাগজে বেরিয়েছিল। আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে একাসনে বসানো বিপজ্জনক।......মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষসাধন হয় আমি বুঝতেই পারি নে,—বরঞ্চ ফল উল্টো হবারই কথা। গান্ধিজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষি আবদার দেশে ছড়িয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্চে মহাত্মাজি বলেন এই রীতি একমাত্র তাঁরই অনুষ্ঠেয়। এ রকম আধ্যাত্মিক trade secretকে শ্রদ্ধা করব কী করে। অন্তত তাহলে তিনি বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে যান।

প্রসঙ্গত বলা দরকার,—৩০শে মার্চের (১৯৩৫) চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর অনশনতত্ত্ব এবং ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কবির সুচিন্তিত অভিমত জানবার অনুরোধ জানানর পর প্রবাসীতে প্রকাশিত কবির আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রচনাটির উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছিলেন। কবির মূল রচনাটির সমসাময়িক ঘটনা ও পটভূমিটি সংক্ষেপে বলা দরকার।

সকলেই জানেন, ১৯৩৮ সালের শেষভাগে (২৪-২৫ ডিসেম্বর) কলকাতায় অনুষ্ঠিত *All India Progressive Writers Conference* বুদ্ধদেব বসুর ভাষণে এবং সমসাময়িক নবীন মার্কসবাদীদের কয়েক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলেন। অল্পকাল পরেই অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে 'প্রবাসী'-তে (বৈশাখ ১৩৪৬) প্রকাশিত এক 'খোলাচিঠি'তে (১৭ই মার্চ '৩৯) কবি সেদিন তাঁর এই মানসিক ক্ষোভ ও মনোবেদনার কথা জানালে দেশের সাহিত্যিক মহলে এ নিয়ে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেদিন কবি ক্ষোভ ও উত্তেজনার মুখে তাঁর এই রচনারএক জায়গায় বলেছিলেন:

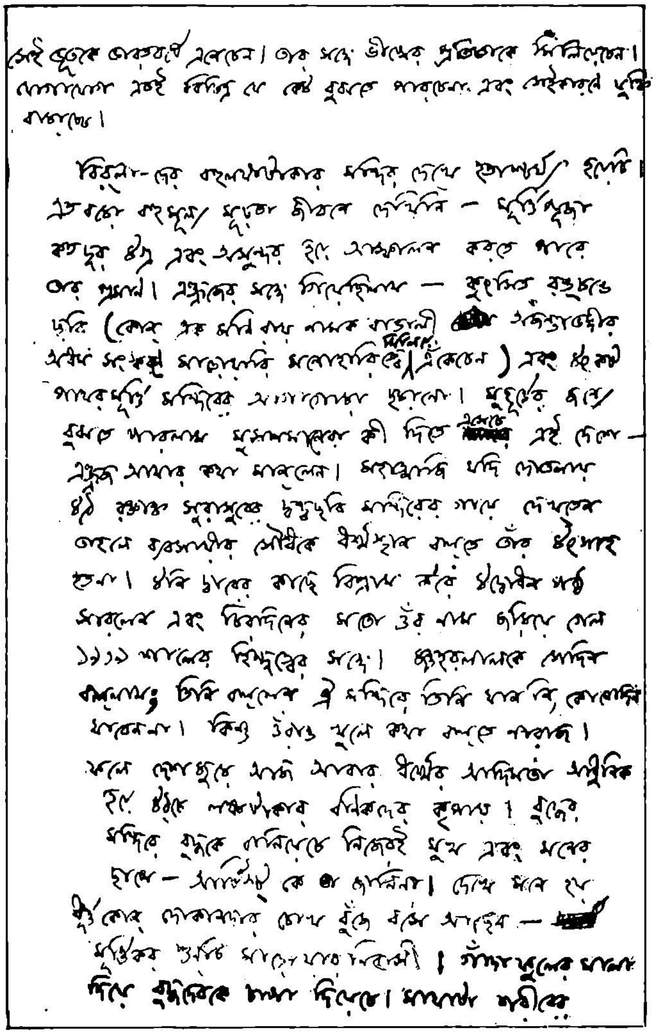
"ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রোলেটেরিয়েট এবং বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষ্যে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নূতনতর রুদ্রমূর্তি ধরল তার উপরে সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো যায় যদি তাহলে তো নৌকাডুবি হবে।"...

অমিয় চক্রবর্তী কবির এই ক্ষোভ ও মনোবেদনার আসল কারণটি ধরতে পেরেছিলেন বলেই কবি অনুযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও বিলেতের অডেন স্পেন্ডার প্রমুখ আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল বক্তব্যটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর ঐ চিঠির (৩০শে মার্চ '৩৯) পরিশিষ্টে লিখলেন:

"বুর্জোয়া ও প্রোলেটেরিয়েট সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আপনার চিঠিখানি এখনি বেরোনো দরকার। সৃষ্টির মূল্য টিকিটের রং দেখে ঠিক করা হচ্চে। য়ুরোপে অনিবার্য কারণে একান্ত পোলিটিকেল চেতনা ঠেলে উঠেচে, হয়ত কিছু পরিমাণে আমাদের দেশেও একই বৃত্তি জাগবেই। কিন্তু আমাদের বিচারে দেশীয় জীবনের সঙ্গে এখনো যোগ স্থাপন হলো না, আমাদের ইতিহাসের ভূমিকা নেই বলে রাষ্ট্রিক মূল্য সাহিত্যে ঠিকভাবে প্রবেশ করেনি, কোথাও তার গভীর প্রবর্তনা দেখতে পাই না। Stephen Spender একবার বলেছিলেন—"I really do not know about political art, but whatever engages the deepest life of a people is subject for a people's art. I suppose politics does engage our emotional life so we can't help politics from influencing our art." এর মধ্যে যে তত্ত্বটুকু স্বীকার করি তার প্রসঙ্গ emotional; emotion এর ধর্ম এই যে তা emotional contextকে art এ টেনে আনে। কিন্তু আমাদের নূতন কবিদের লেখায় politics বা propaganda-র emotional context কোথায়?... আমাদের কাব্যে কোথায় বাংলাদেশ, কোথায় ব্যাপক জনসংঘের জীবন, রাজনৈতিক সংগ্রামের বড়ো দিকও তো কোথাও আঁকা পড়ল না যেমন আঁকা পড়েচে য়ুরোপীয় সাহিত্যে। মনে করা যায় জওহরলাল যদি কবিতা লিখতে পারতেন তাহলে পোলিটিকাল কবিতা জাতীয় একটা কিছু তৈরি হত যা Stephen Spender, Auden এর লেখার সগোত্র। আমরা পাশ্চাত্য বচন আওড়াচ্ছি—'বুর্জোয়া' 'প্রোলেটেরিয়েট আর্ট'—কেননা এ দেশের জওহরলালেরা কবিতা লেখেন না, তাছাড়া জওহরলালের সংখ্যা একের বেশি নয়।".....

এখানে যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়,—বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কয়েকজন তথাকথিত 'প্রগতিশীল লেখকে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের মন যখন মার্কসবাদী সাহিত্যবিচার—এমন কি সোভিয়েট শাসননীতি সম্পর্কেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরূপ হয়ে (সাময়িকভাবে হলেও) পড়েছিল, সেই সময় অমিয় চক্রবর্তী কবির এই সাময়িক ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে অডেন-স্পেন্ডার প্রমুখ কবিদের সংগ্রামী-জীবন এবং বক্তব্য তুলে ধরে সাহিত্য ও রাজনীতির যথার্থ ও সঠিক সম্পর্কটি নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। অমিয়বাবু যে সঠিক অর্থে মার্কসবাদী ছিলেন না, এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অমিয়বাবু এখানে মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটা ব্যাপকার্থে সমর্থন করার চেষ্টা করেছিলেন। অডেন-স্পেন্ডাররা স্পেনের রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই তাঁদের কবিতা এতো প্রাণবন্ত ও উদ্দীপনাময়ী। আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকেরা যদি এত বড়ো কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিতেন তাহলে তাঁদের কবিতা ও শিল্প সাহিত্যও মহান সৃষ্টি হতো—এই ছিল অমিয়বাবুর বক্তব্য।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরোধ সংঘাতে দেশের প্রচণ্ড রাজনীতিক উত্তেজনা, অপরদিকে দেশের আধুনিক শিল্প সাহিত্যের মূল্য বিচার ইত্যাদি নিয়ে অমিয় চক্রবতীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি দীর্ঘ পত্র-বিনিময় হয়। নানাদিক থেকেই সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক বিষয় সংক্রান্ত 'উড়িষ্যার চিঠি' 'কংগ্রেস' শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধগুলির উপলক্ষ্য ও তাৎপর্য ইত্যাদি নিয়ে অন্যত্র



আমরা বিস্তারিত আলোচনা* করেছি। এই সময় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' গ্রন্থখানির আলোচনা উপলক্ষে কবি আধুনিক শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আরও এক প্রস্থ আলোচনা করে অমিয় চক্রবর্তীকে এক দীর্ঘ পত্রপ্রবন্ধ লেখেন (১১ই এপ্রিল ১৯৩৯ দ্র: চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড।। পৃ. ২৫৭-৬৭)। সুধীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মননশক্তি, বৈদগ্ধ্য এবং তাঁর রচনা-শক্তির নানা গুণাবলীর প্রশংসা করেও কবি এক জায়গায় লিখেছিলেন :

".......এই 'স্বগত' বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য করে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলেরই কার্মিংস্, এজরা পৌন্ড ঈডিথ সিটওয়েল এলিয়ট অডেন স্পেন্ডার সম্প্রদায়ের সভাস্থলে অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই তাঁর এই অংশের সাহিত্যালোচনায় সমঝদারদের মাথা নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো শুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্ভোগ করতে পারি, এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি।....."

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'চোরাবালি' শীর্ষক কবিতাটির মর্মগ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন,

"......তিনি বলেছেন, এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে কিন্তু শ্রাব্য হিসেবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়।"....

জবাবে অমিয় চক্রবর্তী লাহোর হতে এক পত্রে কবিকে লিখলেন (১৭ই এপ্রিল '৩৯) :

"....'স্বগত' বইখানির বিষয়ে আপনি যা বলেচেন তাতে গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন করে ভাবতে হলো Art for Art's sake যাঁরা জানেন তাঁরা technique-বিলাসী : ভাষা বা সুর বা পাথরের টুকরো তাঁদের কাছে সাজানোর সামগ্রী। নির্মাণের আদর্শ টেক্‌নীকের সঙ্গে মিলে গভীরতর সৃষ্টির যে আনন্দ জাগায় তা হতে তাঁরা বঞ্চিত। অথচ আনন্দ যে-পরিমাণে এবং যে-ভাবে সত্য তাতেই অনেকখানি সার্থকতা আছে: মন নিয়ে যাঁরা খেলা করে আনন্দ পান, ভাবকে ভাবনাকে নানা সূত্রে বেঁধে, নানা রঙে রাঙিয়ে তৃপ্তি পান তাঁদের হাতে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েচে। মানসিক সৃষ্টিবৃত্তি যখন মানসিকতায় গিয়ে ঠেকে তখনই বিপদ। লক্ষ্যে উপলক্ষ্যে মিলিয়ে সৃজনের জাদু—এর কোনোটা একান্ত হয়ে উঠলে হয় Swin burne এর বাক্যবিহার নয় Samuel Smiles এর Self-Help আমাদের আক্রমণ করে। আপনি তাই দেখিয়েচেন মনকে technique এর নেশায় যাঁরা ব্যবহার করেন বিশেষ দেশের এবং কালের মানসিক প্রসঙ্গে মিলিয়ে, তাঁদের সমজদারেরাও ঐ দলের হওয়া চাই—একই প্রসঙ্গের ভূমিকায় তাঁরা মেলেন।.....

"অমিল ঘটে যেখানে স্বগতোক্তি সাহিত্যের দরবারে জ্ঞানের বা আভিজাত্যের টিকিট নিয়ে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করে। সিংহাসনে বসে আছেন মহাকাল, তাঁর বিচার শুনতে গেলে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, এক জীবনে তো কুলোয় না। অথচ বিচার করতেই হয়, নিজবুদ্ধিতেই এবং ইতিহাসের পূর্ব-সাক্ষ্যকে মিলিয়ে। বলতেই হয়, যেখানে স্বগত মেলেনি বিশ্বগত সত্যের মাধুরিতে সেখানে সৃষ্টির বাণী বড়ো করে জাগল না। আপনি বলেচেন কাব্যে আপনার শ্রেয়োবুদ্ধির দাবীর কথা—Shelley বলেছিলেন Passion for reform এর বিষয়ে—form এবং reform করবার বৃত্তি সৃষ্টির মূলে, এবং reform অর্থে কেবল আকস্মিক যোগাযোগ নয়, আদর্শের যোগ ভাবকে ভাষাকে নিয়ে—আধুনিকেরা এরই নাম দিয়েচেন, "Social Conscience"। য়ুরোপীয় সাহিত্যে নব্বইয়ের দল হাতির দাঁতের কেল্লা বানিয়ে স্বগতোক্তিকে একান্ত সুরে জাহির করেছিলেন, তাঁদের রচনাকে আজ গবেষণার সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নব্বইয়ের মানসিক দল কেউ গভীর পাণ্ডিত্যে, কেউবা স্বপ্নকারুকাজরচনায়, কেউ ভাষাতত্ত্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং তাঁদের রচনার মূল্য দিতে আজও বাধা নেই। কিন্তু যে-মন্দির ধর্মসাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, ইঁটসাজানোর বিলাসেই যার অস্তিত্ব তাতে কারুকাজ থাকে তো প্রশংসা করব, সেখানে গিয়ে পূজা দেবার ভিড় হবে না।....."

আরো কিছু কথা আছে। পরিশেষে কবির চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী ও সুধীন্দ্রনাথকে ব্রাকেটবন্দী করায় অমিয়বাবু আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উভয়ের চিন্তা মানসপ্রকৃতি এবং রচনারীতির পার্থক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। কিছুদিন পুরীতে বিশ্রাম গ্রহণের পর কবি মংপু যাত্রা (১৪ই মে, ১৯৩৯) করেন। পুরীতে এবং পরে মংপুতে থাকাকালেই কবির দুটি ঐতিহাসিক খোলাচিঠি (যা মূলত রাজনৈতিক রচনা) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। এতদিন পর্যন্ত কবি চিঠিপত্রে এবং দূত মারফতে—নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানিয়ে আসছিলেন। কলকাতায় এ আই সি সি-র অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের পর সব খবর শোনার পর কবি তাঁর ক্ষোভ ও

* "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' দ্রষ্টব্য—লেখক।

বেদনাও আর গোপন করতে পারলেন না। মংপুতে গিয়ে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লেখা ঐতিহাসিক 'কন্‌গ্রেস' পত্রপ্রবন্ধটি রচনা করেন (২০ মে ১৯৩৯) এই পত্র-প্রবন্ধ কবি প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের প্রবীণ দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের শুধু তীব্র নিন্দা ও সমালোচনাই করলেন না, পত্রের উপসংহারে তিনি প্রকাশ্যেই কিভাবে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক প্রচেষ্টাকে অন্তত বাংলাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টাকে সমর্থন এবং সহযোগিতাদানের আশ্বাস দিয়ে তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, আজ প্রায় সকলেরই তা জানা আছে।

আগেই বলেছি, রাজনীতিক মতাদর্শ ও নীতিপথের দিক থেকে অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর অনুগামী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের তৎকালীন ভূমিকা তাঁর ভালো লাগেনি। এবং কবিকে তিনি যে কিছুটা এ ব্যাপারে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, বিশেষ করে গান্ধীজীর ভূমিকা সম্পর্কে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কবির ঐ চিঠিখানি পাওয়ার পর জবাবে তিনি কবিকে লিখলেন :

"কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাই নিয়ে এ অঞ্চলে খুব আন্দোলন চলচে। Tribune'এর Editorial পাঠাই। ইংরেজ অঞ্চলেও আলোচনা উঠেচে ; এখানে তার ধ্বনি শুনতে পাই।

"সুভাষবাবু একটু বাড়াবাড়ি করচেন। মনে হয়,—ক্রমে সকলের বিশ্বাস হারাচ্চেন। বাংলার হয়ে তিনি প্রভূত উপকার করতে পারতেন—সেই কথাই আপনি চিঠিতে বলেছিলেন—কিন্তু ওঁর বিশ্বাস উনি ভারতের মুসোলিনী হবেন ভাঙনের পথ বেয়ে। সকলেই ওঁর দিকে থাক্‌তাম যদি কংগ্রেসের বিশেষ এক প্রাচীন দলের প্রভুত্ব হতে দেশকে মুক্তি দেওয়ার কাজে লাগতেন, কিন্তু এখন তিনি মুগুর চালাচ্চেন সমস্ত কংগ্রেসের উপর।"......

অমিয়বাবুর এই মন্তব্য বিস্ময়কর। অন্তত কলকাতায় এ আই সি সি-র অধিবেশন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র অসাধারণ ধৈর্য ও সংযম এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সকলেই তা স্বীকার করেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ত্রিপুরী কংগ্রেসের মাসখানেক পর অমিয়বাবু স্বয়ং গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্পর্কে কবির মনোভাব জ্ঞাপন করলে, গান্ধীজী স্বয়ং শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার ইচ্ছাটা জ্ঞাপন করেন। ১২ই এপ্রিল অমিয়বাবু কবিকে শান্তিনিকেতনে সেই কথাই জানিয়ে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান (লাহোর ১২/এপ্রিল) :

Rabindranath Tagore Santiniketan Mahatmaji Desires spend some time Santiniketan with you towards end of April please advise me whether suitable with your programme. Pranams.

Amiya.

এর থেকেই বোঝা যায়, কংগ্রেসের বিরোধ-সংঘাতে অমিয়বাবু কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অমিয় চক্রবর্তীরও যুক্তি ও বক্তব্য আছে। দেশের এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কবিকে লেখা ঐ চিঠিরই এক জায়গায় তিনি বললেন :

".....এমন সময় গৃহবিবাদকে বিশ্বময় জাহির করা সুবুদ্ধির কথা নয়। কিন্তু বিবাদ যখন ঘরে রয়েচে তখন তাকে চাপা দেওয়া যায় না—চারদিকে ঘরে বাইরে ঝড় উঠবে ভারতবর্ষে ; পৃথিবীর মানুষ-সমাজ একই সঙ্গে কলির সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করবে।

"ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের তফাৎ এই যে, দুর্দিনেও ওখানকার মননশীলেরা হার স্বীকার করেন না,—সাহিত্যে মুক্তবাণী জ্ব'লে ওঠে। আমাদের সাহিত্যে বাণী নিস্তব্ধ অথবা বিকারগ্রস্ত। আপনার চিঠি-প্রবন্ধে দেশের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েচে, তার চাপা-পড়া মন উর্ধ্ব উঠেচে তাই চিঠিখানি এমন ক'রে ভারতবর্ষময় ছড়াচ্চে। কিন্তু কোথাও আমাদের সাহিত্যে বিশ্বভূমিকার পরিচয় নেই ক্ষুব্ধ বেদনায়। এবারকার "কবিতা" এবং "পরিচয়" পড়ে হতাশ্বাস হয়েচি।.....

"Autumn Journal আপনাকে পাঠাচ্চি—অনেক স্থলে কাঁচা লেখা কিন্তু এর মধ্যে যে বীর্যের সুর আছে তা না-স্বীকার করে উপায় কী? য়ুরোপে এবং বিশেষ করে রাশিয়ায় এই বীর্য মানুষের সমাজে মরেনি, আরো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠচে। অন্য দেশেও—চীনে, ভারতবর্ষে এই আত্মার বেগ জাগলে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠত জিওগ্রাফির বেড়া লঙ্ঘন ক'রে। তাই কেবলি খুঁজি বাংলার বাণীতে সেই মুক্তিসন্ধানী বিশ্বমুখী নির্মল সতেজ আত্মার।

* * *

যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আমাদের বাংলার নব্য এলিয়টপন্থী কবিরা যখন In Defence of Decadance-এর সাফাই গাইছেন, তখন 'রবীন্দ্রভক্ত' ও 'রবীন্দ্র-অনুসারী' কবি অমিয় চক্রবর্তী বলিষ্ঠ ঋজু কণ্ঠে সরাসরি Commitment এবং সংগ্রামী সাহিত্যের আহ্বান জানালেন।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মন সাময়িকভাবে হলেও তখন সোভিয়েট রাশিয়ার এবং মার্কসবাদীদের উপরও কিছুটা বিরূপ হয়েছিল। অমিয়বাবু সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সোভিয়েট দেশের

"চমৎকৃত হতে হয় রাশিয়ার নূতন সৃষ্টিবেগের পরিচয় পেয়ে মধ্য-এশিয়ার পথে। আফগান Oxus এর এপার থেকে ওদের খবর যা নিয়ে এসেচি তাতে সমস্ত মন চঞ্চলিত হয়ে উঠেচে। অথচ এসব বিষয়ে এখনো সব কথা বলার পথ বন্ধ আমাদের দেশে।

"হয়তো শীঘ্রই মরুময় সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ওরা জলধারা আনবে। বালির তলে নোনা জলের সন্ধান পেয়েচে তাকে শীতের দিনে জমিয়ে পানীয় জলে পরিণত করবার উপায় বেরোচ্চে। কতদিকে ওরা প্রাণকে প্রয়োগ করচে। এদিকে বেলুচিস্থানের মরা পাহাড় ও মুমূর্ষু মানুষের দিকে চেয়ে যখন নূতন চেষ্টার কথা বলা যায় তখন ইংরেজ রাজের একমাত্র উত্তর—"উপায় নেই"। উপায় আছে কেবল ঐ অঞ্চলে বোমা ছোঁড়বার।"....

এইভাবে সোভিয়েট দেশের বিরাট কর্মকাণ্ডের নানা খবর দিয়ে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কবির অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন,—এটাই দেখা যাচ্ছে।

অমিয়বাবুর এই চিঠি পাওয়ার পর কবির মন যেন বেশ কিছুটা নরম হয়, মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের প্রতি। ১৬ই জুলাই (১৯৩৯) শ্রীনিকেতন থেকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রের (চিঠিপত্র ১১শ॥ পৃ ২৯৩-৯৮) এক জায়গায় কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন :

"স্পেন্ডর ও ফস্টরের দুটি চটি বই পড়লুম। আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মনটা হয়ত সোশিয়লিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজমের ছোঁয়া যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত রেখে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পার রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের জয় জয়কার করব কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হোলেই হোলো।"

কবির এই চিঠি পাওয়ার পর অমিয়বাবু লাহোর থেকে তার জবাবে চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখলেন (২৬শে জুলাই ১৯৩৯) :

"....স্পেন্ডর এবং ফর্সস্টরের সম্পর্কে আপনি যা বলেচেন তাতে আর্ট এবং সমাজনীতির মূল তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেচে। Autumn

[illegible]

Aruni.
Seaside, Puri...
Orissa
২৩ সেপ্টেম্বর

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার চিঠি পড়ে Yeats-এর দুটো কবিতার কথা মনে পড়ল — যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। ওঁদের দেশের আধুনিকেরা যুদ্ধের প্রচণ্ড আয়োজন দেখে ভেবেছিলেন বোধ হয় মানবসভ্যতার চরম দিন ঘনিয়ে আসছে, এই বুঝি মহাপ্রলয়ের নূতন আবির্ভাব! কিন্তু Yeats সে-কথা মানেন নি — ওঁর কাছে ধর্ম বা অতীতের নামে বিপুল নরহত্যার ব্যাপার যন্ত্রবাহিনী বর্বরতা বলেই মনে হয়েছিল।

The Second Coming

x x

Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.

Journal প্রভৃতি আধুনিক কাব্যে 'ব্যবহারিক সাহিত্য' কতদূর সার্থকতা পেয়েচে —এদের চেষ্টার মূল্য আর্টের দিক থেকে কতখানি, তা আপনার কাছ থেকে কোনো সময়ে আরো জানতে পেলে অনেক তর্কের অবসান হত। আপনি বলেচেন Socialism আপনার চিন্তার রাজ্যে বড়ো আসন পেয়েচে গ্রামের কাজে শিক্ষায় শ্রীনিকেতনে তার অনেক পরিচয়—আপনার কাব্যে তার প্রভাব কীভাবে পৌঁছেচে তার বিচার সম্পূর্ণ সাহিত্যগত না হলেও আজকের দিনে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে। এ বিচার বাহির থেকে অনেকেই করবে, ভবিষ্যতেও এই নিয়ে তর্ক চলবেই, আপনার কী মনে হয় জান্‌লে দৃষ্টি আমাদের স্পষ্ট হত।"

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেই, অমিয়বাবু এইভাবে কবিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে তাঁর নিজের মুখ বা লেখনী হ'তেই তার জবাব সংগ্রহ করে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হিসেবে এখানে তিনি যে ধরনের সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন এমনটি তাঁর মৃত্যু বা তিরোধান কাল পর্যন্ত আরো সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটনা, এবং ব্যক্তির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার বা আলোচনা প্রসঙ্গে 'নোট্' রাখতে পারতেন, তাহলে দেশবাসী অনেক বেশী উপকৃত হতো। তবু কবির জীবনের এই অন্তিম পর্বে এবং বিশ্বের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে কবির মানসিক যন্ত্রণা এবং চিন্তাভাবনার বিষয়গুলি নানাভাবে প্রশ্ন করে অমিয়বাবুই কিছুটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েচেন। বস্তুত অমিয়চন্দ্রকে উদ্দেশ এবং তাঁর সঙ্গে কথপোকথনের ছলেই কবি যেন তাঁর গভীর সব প্রশ্নের আলোচনা কিংবা তাঁর মানসিক উদ্বেগ এবং দুঃখ যন্ত্রণার ভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন।

এর মাসখানেক পরেই ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) যুদ্ধের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়েই জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করায় দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জার্মানীর পোলান্ড আক্রমণ এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জোটের যুদ্ধ-ঘোষণার সংবাদে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। তবু এই উপলক্ষেই হিটলারের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাকে প্রতিহত করার জন্যই শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়—যুদ্ধের এই নিদারুণ দুঃসংবাদের মধ্যেও এটাই ছিল কবির কাছে আমার কথা। আবিসিনিয়া স্পেন চীন বিশেষ করে 'মিউনিক প্যাক্ট'এ চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইঙ্গ-ফরাসীদের যে তীব্র ঘৃণামিশ্রিত বাক্যে কবি ধিক্কার ও ভর্ৎ সনা জানিয়েছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য। যুদ্ধের শুরুতেই অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লেখা (২০/৯-৩৯) পত্রপ্রবন্ধে কবি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি বিশ্বাসঘাতকতার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে নিদারুণ দুঃখে ক্ষোভোক্তি করলেন :

".....নিজের সম্মানে খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হোলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে।

কবি পরিষ্কারই বলেন :

"এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় না।"....

কবির এই চিঠি পেয়ে অমিয়বাবু খুবই খুশি হয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবির অসতর্ক দু'একটি কথায় প্রমাদ গণলেন। কবি ফ্যাসিস্টদের ধিক্কার জানাতে গিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সর জয়কামনা করে বসেছেন। স্বার্থান্বেষী মহল—বিশেষ করে ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরেরা পাছে কবির বক্তব্যের এই অংশটির অপব্যাখ্যা করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগায়, এই আশঙ্কায় অমিয়বাবু তাঁর জবাবী-পত্রে কবিকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে (অরুণি-পুরী, ২৮শে সেপ্টেম্বর'৩৯) লিখলেন :

"......কার্তিকের 'প্রবাসিতে বেরোলে এই সময় সকলের পক্ষে ভালো হবে। সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতার বর্তমান ধারাকে আপনি দেখিয়েছেন, কোন পক্ষ হতে নয়, নিরপেক্ষভাবে অথচ গভীর বেদনায়। আমরা হার জিৎ-এর দিক থেকে দেখি—যেমন করে জীবজন্তুদের লড়াই অনেকে দেখে; এই চিঠি পড়ে অনেকের দৃষ্টি শুদ্ধ হবে। এক জায়গায় ইংরেজের জিৎ হোক এই কথাটা আছে—জানিনা এতে কেউ ভুল বুঝবে কিনা। জন্তুর মতো হত্যার নেশায় নেমে, বড়ো বা ছোটো নাম দিয়ে যারা মানুষ ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক আয়োজন ঘটায় তাদের হারও নয় জিৎও নয়, দু দলেরই চোখ খুলে যাওয়া দরকার ;এই পথে সভ্যতা বাঁচবে না। এই জন্যে কোনো পক্ষেরই জিৎকে আমরা ভয় পাই, তাতে সংহারবিধির প্রতিই মানুষের বিশ্বাস পাকা হবে। একবার হত্যাকাণ্ডের পর সবাই মিলে নিপীড়িত দেশে সাংঘাতিক নাৎসীনীতি জাগিয়ে তুললেন, আবার তাকে দমাবার নাম করে পুনর্বার হত্যাকান্ডের বিধান। এর শেষ কোথায় ?

"তাই দুই পক্ষ হার-জিতে এমন একটা জায়গায় পৌছক যাতে বৈজ্ঞানিক হত্যার নেশা, তার আয়োজন, তাতে বিশ্বাস, তাই নিয়ে নকল বীরত্ব, গিল্‌টি করা ফরমাসী কবিতা, মিথ্যে ছবি, রেডিওতে মিথ্যের বন্যা—এসবের প্রতি ধিক্কার জাগে। কোনো এক পক্ষ ভয়ংকর জিৎলে ধিক্কারের জায়গায় ঔদ্ধত্য জাগবে এবং তার আবার প্রতিক্রিয়া চলবে। সৌভাগ্যের বিষয় রাশিয়া নামাতে সেরকম উৎকট জিৎ কোনোদিকেই হবে না, যদিও রাশিয়ার রাষ্ট্র বিধি ষড়যন্ত্রে পূর্ণ—তবু অন্য সকলের চেয়ে ভালো। বিলেত থেকে খবর পাচ্চি ওদের শান্তিকর্মীদের গলা টিপে ধরা হয়েচে—হার-জিৎ-এর হাওয়ায় তাদের পক্ষে কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠেচে। তাঁদের কবিতা প্রবন্ধ শুধু এদেশে নয়, স্বদেশেই যাতে ছড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ বিষয়ে পরে আরও জানা যাবে। মুক্তি যদি য়ুরোপকে কেউ দিতে পারে, বোমা বারুদ ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদীরা দেবে না—যারা সহজ মানুষ, ইংরেজ, জার্মান, রাশিয়া, তারা যদি চরম দুঃখ উন্মাদনায় দৃঢ় সংঘবদ্ধ হতে পারে, হয়ত তখন মুক্তির পথ খুলবে। আপনার চিঠিতে যদি এ বিষয়ে এক লাইন থাকত, তাহলে সর্বদেশে তার ঢেউ পৌঁছত।....."

অমিয় চক্রবর্তীর এই সময়োচিত সতর্কবাণীর ফলে কবি তাঁর রচনা সম্পর্কে অনেকখানি সাবধান হয়ে যান। ৫ই নভেম্বর তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র-প্রবন্ধে যুদ্ধ এবং আমাদের করনীয় বিষয়ে যুক্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে ভাবাবেগের সুন্দর ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

স্মরণ রাখা দরকার, যুদ্ধ তখনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্ররূপ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বিলেতের এবং আমাদের দেশেরও প্রগতিশীল লেখক শিল্পী ও শান্তিবাদীরা তখনও পর্যন্ত এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপেই দেখছিলেন বলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তি আন্দোলনে দেশের জনমত তৈরী করার কাজে তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। বস্তুত, অমিয়চন্দ্রও তখন 'প্যাসিফিস্ট' বা শান্তিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যুদ্ধকে বিচার করছিলেন বলেই বিলেতের কবি ও শান্তিবাদীদের শান্তি আন্দোলনের খবরের উপর গুরুত্ব দিয়ে কবিকে লিখছিলেন।

কিন্তু, যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়াই সব চেয়ে বিস্ময়কর। যুদ্ধর খবর পাওয়ামাত্রই কল্পনানেত্রে তিনি পার্লামেন্ট ভবন, 'ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে' এবং ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে তিনি ব্রিটেনকে নিঃসর্ত সাহায্যদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর ফিরে এসে তাঁর পূর্বেকার ঘোষণায় অটল থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। চার দিক থেকে তাঁর বিবৃতির সমালোচনা হচ্ছিল। গান্ধীজী সমালোচকদের নানা প্রশ্নের জবাবে *'Conundrums'* এই শিরোনামায় 'হরিজন'-এ *Harijan* Sept. 30, 1939) দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার এক জায়গায় গান্ধীজী বলেন,

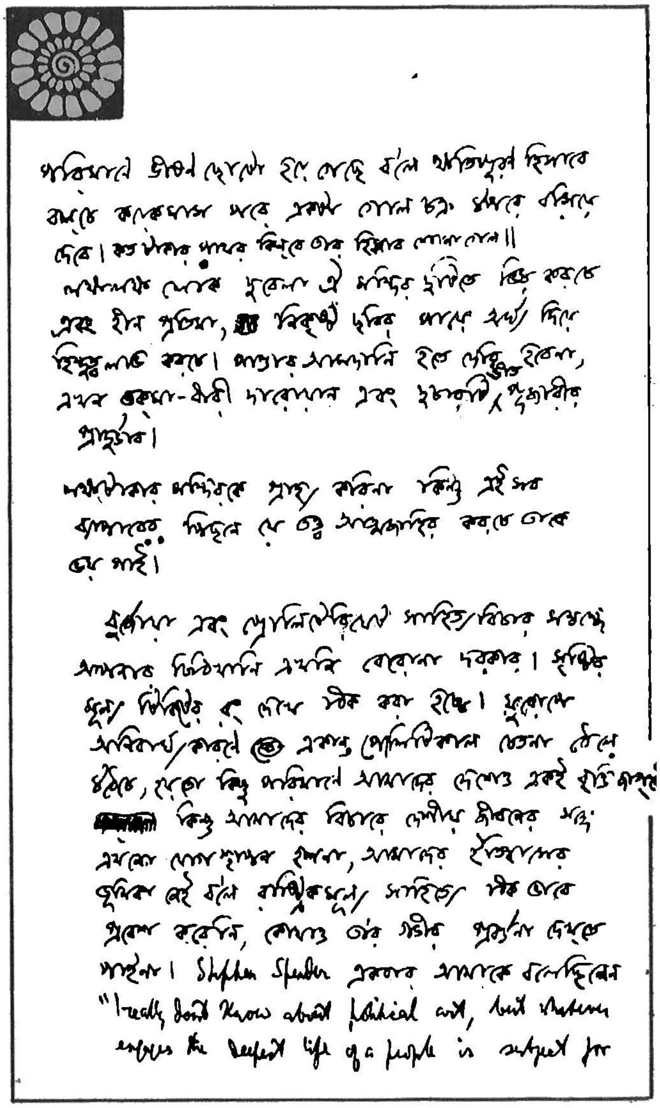
"Unless the Allies suffer demoralisation, of which there is not the slightest indication, this war may be used to end all wars, at any rate of the virulent type that

we see to day. I have the hope that India, distraught though she is with internal dissensious, will play an effective part in ensaring the desired end and the spread of cleaner democracy than hitherto.''....এছাড়া আরো কিছু ভয়ানক বিভ্রান্তিকর কথা এই রচনায় ছিল। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই রচনা হরিজন-এ প্রকাশিত হওয়ার পর, নানা দিক থেকে তিনি আবার ভয়ানক সমালোচনার সম্মুখীন হ'ন।

সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হলো, কবি অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর এই রচনাটি পাঠ করার পর খুবই হতাশ ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দিন দুই পর ২রা অক্টোবর (১৯৩৯) কবিকে এক দীর্ঘ পত্রে অমিয়বাবু তাঁর মনের এই প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ করে লিখলেন :

"ইংরেজ Peopleদের শ্রদ্ধা করি, যেমন করি য়ুরোপীয় অন্য দেশের লোককে, তার আমাদের আত্মীয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী পোলিটিকাল্ ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান বা ভারতবর্ষীয় সমানই আমাদের পর। সেখানে পাপ; মিথ্যার ব্যবসায়ে কে একটু বেশি বা কম তার উনিশ-বিশের হিসেব কেন জানি না অত্যন্ত অলীক মনে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রিক চক্রান্তঘটিত নরমেধ ব্যবসায়ে ধর্মের নাম করে তাল ঠুকে ভারতবর্ষ নামবে বা সমবেদনায় বিগলিত হয়ে মহাত্মাজির মতো লণ্ডনের রাষ্ট্রসৌধ ভাঙবার কল্পনাতেই মূর্চ্ছিতপ্রায় হবে,—একথা ভাবলে ধিক্কার হয়। ওদের জন্যে ব্যবসায়ে চীনকে বলি দিতে, ভারতকে ধূলোয় ফেল্‌তে একটুও বাধবে না যেমন বাধেনি আবিসিনিয়াকে পুড়োতে। যদি ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীন কথা বলাবার একটুও উপায় থাকে, গলায় ফাঁস না-টানে, তাহলে সমস্ত হত্যা নৃশংস পাপের বিরুদ্ধেই বলার দরকার ছিল অথচ মহাত্মাজি তা বলতে পারলেন না।

"এমনি করেই শিক্ষা হয়, নূতন করে বুঝি যে সত্যি বড়ো, কোনো মানুষ, যিনিই হোন না কেন, তার বিশুদ্ধ বাহন নয়। যাঁর কাছে যা পাই তাতে ধন্য হব, কিন্তু যাব ফিরে যেটুকু সত্যকে সমগ্রের প্রতিষ্ঠায় জেনেচি সেই সত্যের কাছে। মহাত্মাজি বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞানের তপস্যায় সত্যকে খোঁজেন নি, তন্ময়তায় হঠাৎ কখনো ছুঁয়েচেন তাই পুণ্যকে পণ্য করতে তাঁর বাধল না—যুদ্ধকে একাধারে কাজে লাগানো এবং মৃদু ভর্ৎসনার দ্বারা দুই কূল রক্ষার বিধান দিলেন। বহু দেশের দুঃখজাগ্রত মানুষের উনি কেন্দ্র ছিলেন, একনিষ্ঠ শান্তিমন্ত্রের, ঘটনাক্রমে তাঁকে বর্তমান সভ্যতার আহত যন্ত্রপিষ্ট মানুষ প্রতীক বলে জেনেছিল ভাবী সভ্যতার অহিংস্র আঙ্গিক বানাবার চেষ্টায়। আজ উনি দাবী করচেন 'I have grown from truth to trouth', এবং বলচেন শেষ 'truth' এই যে, 'Unless the Allies suffer demoralization, of which there is not the slightest indication, this war may be used to and all wars'। এই 'War to end War' এর বুলি আজ য়ুরোপের ছেলেবুড়ো সকলের কাছে 'Stock joke'—এর মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্যে ওদের মহাত্মার প্রয়োজন হয়নি, গত যুদ্ধে এমনিই মরতে মরতে বুঝেচে। এবং War যে কীরকম Ended হল তার প্রমাণ আজ সর্বত্র। ও পথে End বলে কোনো জিনিষ নেই—তা মহাত্মাজির বোঝা উচিত ছিল বলে মনে হয়। Europe এর যুদ্ধে মরা ঐ সব বুলি উনি আজ পুণ্যের গলায় এবং জোর গলায় ভারতবর্ষে বিতরণ করচেন, যাতে Viceroy এর কান পর্যন্ত পৌঁছয়। এবং তৎপরে বলচেন 'I have the hope that India, distraught though she is with internal dissension, will play an effective part in ensuring the desired end'—অর্থাৎ সাদা কথায় আমাদের মানুষদের খামকা পরদেশীদের খুন করবার জন্য পাঠাতে এবং হাজারে হাজারে জন্তুর মত মরতে দিতে ওঁর ধর্মে আপত্তি নেই।


... Stephen Spender ...
"I really don't know about political art, but whatever expresses the deepest life of a people is subject for

"কিন্তু চিরন্তর ধর্মের মাহাত্ম্যও উনি রাখতে চান। তাই পাওনার হিসেবে বহু কথা জাহির করে ধার্মিকের সুরে বলচেন : সব শুদ্ধ মরা সেই আরো ভালো, অন্তত সে কথা বলে অহিংসতা ভোগ করা যাক্। এমন সব কথা প্রহসনের মতো শোনায়: The english would (should) dieunresistingly and go down to history as heroes of Non-violence. I would further invite Indians to co-operate with Englishmen in this godley Martyrdom. It will be an in dissoluble partnership drawn up in letters of blood of their own bodies' অর্থাৎ সবশুদ্ধ মরা এবং সবশুদ্ধ মারার ভিতরে কোনো মধ্যপথ নেই। আমাদের বিশ্বাস ছিল এই মধ্যপথ খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই ক্ষতবিক্ষত বহু দেশের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা দিয়েছিল। আজ উনি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাবার উৎসাহে মানুষের প্রতি.....করলেন।

অমিয়বাবু আরও লিখলেন

"য়ুরোপকে প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি বলেই যন্ত্রণার দিনে ওদের লক্ষ লক্ষ সন্ধানী মানুষ যখন রক্তকাণ্ডের বাহিরে যাবার পথ খুঁজচে তখন ভারতবর্ষকেও শ্মশানের পথে নৃত্য করতে বলাকে এমন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়। জানি কত সহস্র লোক য়ুরোপে আজ

আমাদের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর যোদ্ধা নয়, যথার্থ বীরের বাণী খুঁজচে। মহাত্মাজির এই আশ্চর্য রচনা এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে.....নানা আধুনিক খবর পেয়ে আকণ্ঠ ভরে উঠেচে তাই এমনভাবে অসংযত চিঠি লিখলাম।"

গান্ধীজীর পরে অমিয়বাবুর শ্রদ্ধা ও আস্থা কি গভীর এবং আন্তরিক ছিল, পূর্বেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, গান্ধীজীর এই সব বক্তব্য ও ভূমিকা তাঁকে যে কী পরিমাণ হতাশ ও বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল, এই পত্রই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

পরিশেষে তরুণ ইংরেজ কবি ম্যাকনিসের সদ্যরচিত একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে অমিয়বাবু লিখছেন :

"এমন সময় ইংরেজ যুবা কবির বেদনা এসে পৌঁছালো। কি সাড়া দেব এর ? Macneiceএর এই কবিতা, অন্তিম বেদনায় উনি বলেচেন—

The sunlight on the garden
Hardens and grows cold.
We cannot cage the minute
Within its nets of gold ;
When all is told
We cannot beg for pardon.
"Our freedom as free lances
Advances towards its end ;
The earth compels, upon it,
Sonnets and birds descend ;
And soon my friend,
We shall have no time for dances.

"বলা বাহুল্য, উনি চাইচেন না, যে আমরাও মরচেপড়া বেয়নেট নিয়ে রক্তপাতে নামব, এবং তাতে ইংলণ্ড বাঁচবে। ওসব চাতুরী ওঁরা ঢের জেনেছেন। এবং তাই শেষ নিভৃতে নিবেদন করচেন :

And not expecting pardon,
Hardened in heart anew
But glad to have sat under
Thunder and rain with you
And gratefull too
For sunlight in the garden.

"আপনার চিঠিতে এই কথা আছে। যে কেন্দ্রের কথা আপনি লিখেছেন সেখানে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাবার নকলী বীর্য পৌঁছায় না। এবং সেই কেন্দ্রের কথা, ভারতবর্ষের নূতন করে একবার য়ুরোপের লোকেরা শুনেত চেয়েছিলেন।......"

প্রশ্ন হতে পারে, গান্ধীজীর ওই বিবৃতি প্রসঙ্গে অমিয়বাবু বিলেতের আধুনিক কবিদের এই শান্তিবাদী ভূমিকাকে এতখানি উচ্চে তুলে ধরলেন কেন ? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় এই সময় কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবী যুদ্ধে ইংরেজের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথেরও স্বাক্ষর ছিল। অমিয়বাবু কি সুকৌশলে কবিকেও এই সব প্রশ্নে পুনর্বিবেচনা করার জন্য এত কথা লিখছেন ?

অবশ্য ইংরেজ কবি সাহিত্যিক মনীষী—এক কথায় মুষ্টিমেয় বিবেকী ইংরেজ বুদ্ধিজীবী এই যুদ্ধ সম্পর্কে কি চিন্তাভাবনা করছেন, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে অবহিত করার জন্যও অমিয়বাবু এই সময় এবং এর পরও অনেক কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠি লিখেছেন।

এই চিঠির দিনকয়েক আগে—২৬শে সেপ্টেম্বর, পুরী থেকে ইয়েটস -এর দুটি যুদ্ধ-বিরোধী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে অমিয়বাবু কবিকে এক পত্রে লিখলেন :

"আপনার চিঠি পড়ে Yeats এর দুটো কবিতার কথা মনে পড়ল—যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। ওঁদের রণমত্ত আধুনিকেরা যুদ্ধের গর্বিত আয়োজন দেখে ভেবেছিলেন বোধ হয় মানবসভ্যতার চরম দিন ইংলণ্ডে আসন্ন, এই বুঝি বাইবেল বর্ণিত নূতন আবির্ভাব ! কিন্তু Yeats সে-কথা মানেন নি—তাঁর কাছে ধর্ম বা অধর্মের নামে বিপুল নরহত্যার ব্যাপার যন্ত্রবাহিনী বর্বরতা বলেই মনে হয়েছিল।

The Second Coming

Things fall apart ; the Centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned ;
The best lack all conviction, while the world
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand ;
Surely the second coming is at hand.
The Second Coming / Hardly are those words out
When a vast image out of *Spiritum Mundies*
Troubles my sight : somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its a slow things, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again ; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born ?

"বৃটিশ নৃসিংহ অবতারের উপাসকরা এটা পড়ে খুসি হননি। আপনার নৈবেদ্য কবিতায় শ্মশানে যে-জন্তুদের চীৎকারে কথা আছে রণসঙ্গীত-বিলাসীরা তাদেরই সগোত্র। ট্রেঞ্চের দুপারেই তাদের বাসা—বিশেষ করে দুই পারের ডিপ্লোম্যাট্‌দের মন্দিরে।....এক দিকে ভীত লাঞ্ছিত নির্লজ্জ নাৎসী বর্বরতা যুদ্ধের ভিৎ গাঁথছিল—অন্যদিকে চতুর কপট লুণ্ঠনস্ফীত সাম্রাজ্য শাসকেরা অতি সাবধানে এই যুদ্ধের জন্যে কামনা করছিলেন এবং আজ তা ঘটিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেচেন। ওদের সমস্ত রেকর্ডে এ বিষয়ে প্রত্যহ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে। ইম্পীরিয়ল্ বা অন্য প্রকার যুদ্ধ-সংগীত লেখ্‌বার অনুরোধ পেয়ে Yeats ঠাট্টার সুরে লিখলেন

On Being Asked for A War Poem

I think it better that in times like these
A poets mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right ;
He has had enought of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,
Or an old man upon a winters night."

যুদ্ধ ক্রমেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। অমিয় চক্রবর্তী এই সময় নানা সমস্যা সম্পর্কে কবির কাছ থেকে তাঁর অভিমত, সেই সঙ্গে কবিতাও দাবী করে চিঠি লিখেছেন। কয়েকমাস পর লাহোর থেকে সেসিল ডে-ল্যুইস এর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে কবিকে এক পত্রে লিখছেন (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০):

"Day Leuis এর কবিতাটি পাঠাতে ভুলেছিলাম। আধুনিক ভয়ের কথা আধুনিক ভাষায় বলেচেন অথচ কবিতা হয়েচে। আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

Behold The Swan

Behold the swan
Riding at her image anchored there
Complacent, A water-lily upon
The ornamenetal water :
Qween of the mute October air,
She broods in that unbroken
Reverie of reed and water.

Now from the sticken
Pool she hoists and flurries,
And passes arrhead
In hoarse, expressive flight :
Her wings beat hard
On threat and pulse of weings, the throat
Levelled towards the horizon, see—
They are prophecy.

"Ezra Pound সুস্থ অবস্থায় যে 'hard sophoclean light' এর কথা বলেছিলেন, আধুনিক দু-চারটে কবিতার শব্দ-সংহতি এবং ঘনভাবে তা ফুটে উঠচে। য়ুরোপীয় কাব্যে Yeats সবার উপরে। এরকম কবিতার তুলনা নেই—

"My fifteenth year had come and gone,
I sat a solitary man,
In a crowded London shop,
An open book and empty cup
On the marble table-top.

While on the shop and street I gaged
My body of a sudden blazed ;
And twenty minutes more on less
It seemed, so great my hapiness,
That I was blessed and could bless."

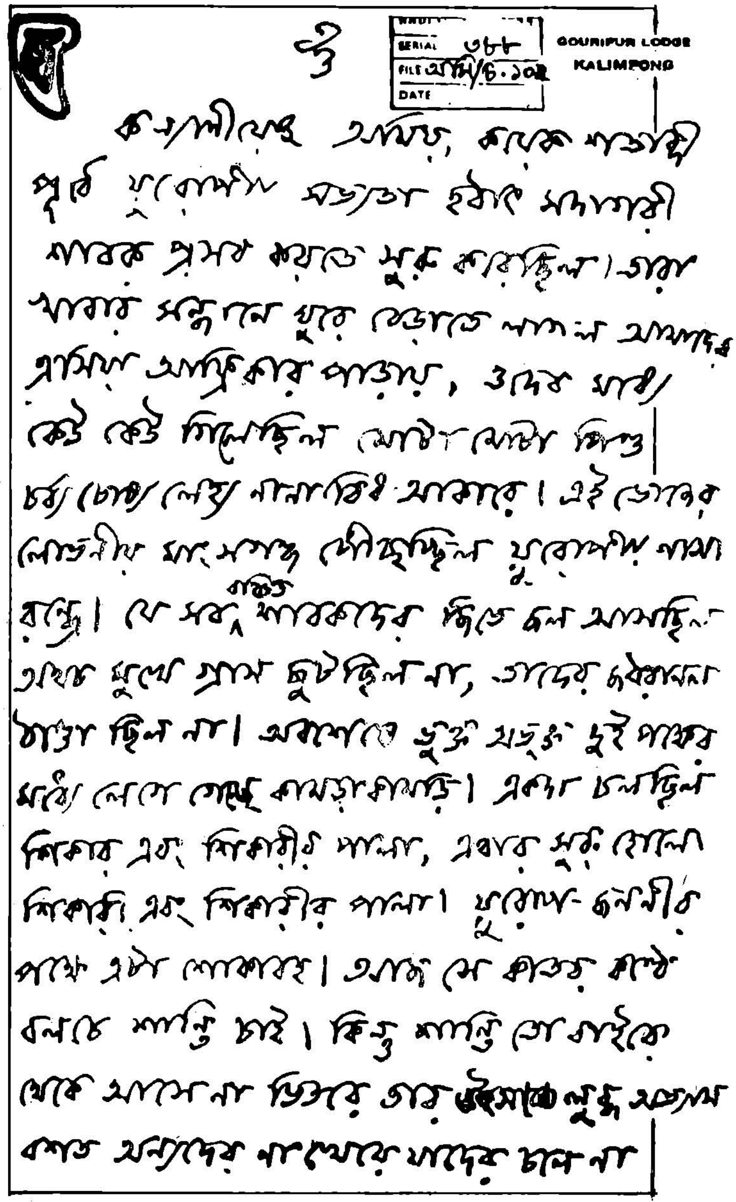
এটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মহাযুদ্ধজনিত সমসাময়িক ঘটনাবলীর অভিঘাতে অমিয় চক্রবর্তী যেন ইয়েটসের কবি-সত্তা ও মহত্ত্বকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন। আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে ইয়েটসের কবি-সত্তা এবং কাব্য-রীতি ও রচনা-শৈলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এইভাবে বারেবারেই ইয়েটসের এই সব কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই খুবই উত্তেজক এবং জটিল হতে থাকে।

১৭ই মার্চ (১৯৪০), রামগড়ে ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশন (৫৫তম) শুরু হয়। ১৯শে মার্চ, রামগড়ে কংগ্রেস-মণ্ডপের অদূরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপোষ-বিরোধী সম্মেলন হয়। পরদিন ২০শে এপ্রিল, লাহোরে মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন শুরু হয়। আর এই অধিবেশনেই মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি জিন্না তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং 'পাকিস্তান' এর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেন,

"The Muslims are a nation, according to any definition of a nation and they must have their homelands, their territory and their state."

যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়,—লাহোর সম্মলনে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হলেও, ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের বেশ একটা বড়ো অংশ কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবকে প্রথমে সমর্থন করেন নি। অবশ্য 'লীগ'-এর কট্টর সাম্প্রদায়িকরা ধর্ম, সামাজিক আচার-আচরণ, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক



ওঁ

SERIAL ৩৮৮
FILE অমি/৮.১০২
DATE

GOURIPUR LODGE
KALIMPONG

কল্যাণীয়েষু অমিয়, কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সমুদ্রগামী শাবক প্রসব করতে সুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এসিয়া আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা কিন্তু চর্ব্য চোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসখণ্ড জোগাচ্ছিল য়ুরোপীয় নানা রাষ্ট্র। যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিভে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের বেদনা চাপা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার সুরু হোলো শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। তাই সে কাতর কণ্ঠে বলচে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না ভিতরে তার [illegible] লুব্ধ অভ্যাস বশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না

স্বার্থ,—এমন কি ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নেও উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবলভাবে উদ্বেলিত ও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাও প্রথম দিকে তেমন সফল হয়নি বিশেষ করে, বাংলায়। এমনই একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছিল, কবি অমিয় চক্রবর্তীকে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই।

৩১ শে মার্চ, (১৯৪০) 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে প্রয়াত প্রখ্যাত কবি ইকবালের এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আজিজুল হকের ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে আব্দুর রহমান সিদ্দিকী (এম এল এ) কিছুক্ষণের জন্য এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় কবি অমিয় চক্রবর্তী, মিঃ বেন আজিব আহ্‌মদ প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যক ইকবালের কাব্যকৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর মিঃ হাফিজ ইসাকের উর্দুতে আলোচনাকালে বাংলায় বলার দাবীতে সভায় বেশ হট্টগোল শুরু হলে সভাপতি সিদ্দিকী বলেন, যে উর্দু ভাষার কবি 'এক্‌বালের স্মৃতিসভায় উর্দুতে বক্তৃতা হইবে এবং তিনি সভাপতি হিসাবে অ-বাঙ্গালী বক্তাদের ইংরাজি বা অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিবার অনুমতি

দিলেও দিতে পারেন; কিন্তু কোনো বাঙ্গালী মুসলমান বক্তাকে তিনি এই সভায় বাংলায় বক্তৃতা করিবার অনুমতি দিবেন না। তিনি আরও বলেন যে, যাঁহার উর্দু জানেন না, তাহারা সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন।'

সভাপতির এই নির্দেশের পর প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়। সিদ্দিকী চলে যাওয়ার পর আব্দুল ওয়াহেব খাঁ সভাপতিত্ব করেন। এই গোলমাল ও উত্তেজনার মধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সম্পাদক মিঃ হাবিবল্লাহ বাহার বলেন যে, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছে, এবং সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই বাঙ্গালী, অতএব এই সভায় বঙ্গভাষার অধিকার অবিসম্বাদিত। বঙ্গভাষা আজ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বঙ্গভাষাই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা (করতালি) ....তিনি আরও বলেন যে, সভায় বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করতে দেওয়া হইবে না বলা এবং বাঙ্গালা ভাষাকে অপমান করা একই কথা। তবে বাঙ্গালার মুসলমানগণ এত ক্ষুদ্রচেতা নহেন যে, তাঁহারা অন্য কোনও ভাষাকে অপমান করিবেন। আমরা উর্দুকে শ্রদ্ধা করিব কিন্তু মাতৃভাষার উপরে তাহাকে আসন দিতে পারিব না।'....এরপর মৌঃ মহম্মদ ইয়াসিন কাজি সাহিত্যরত্ন (বয়স-৯২) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, বাঙ্গালী আরবী উর্দু ইংরাজি যে ভাষাতেই পাণ্ডিত্যলাভ করুন না, তাঁহারা চিরদিন স্বপ্ন দেখিবেন বাঙ্গালায়। মাতৃভাষাই মানুষের প্রাণের ভাষা। মিঃ মহম্মদ সুলতান, মিঃ হাবিবুল্লাহ বাহার ও মিঃ এ সবুর ইকবালের কতকগুলি কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করেন। *

মুসলিম লীগের কট্টর সাম্প্রদায়িক নেতারা যখন সারা দেশের মুসলমান সমাজের মন এবং চিন্তা-ভাবনাকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, সেইসময় বাঙ্গালার 'মুসলমান সাহিত্য সমাজে'র সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখে অমিয়চক্রবর্তী আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখলেন :

188, Rashbehari Avenue
Ballygaung, Calcutta
৩রা মার্চ † ১৯৪০

শ্রীচরণকমলেষু,

সেদিন মুসলমান সভায় গিয়ে এই কাণ্ড।—খুব ভালো লাগল যে বাঙ্গালী মুসলমান-সাহিত্যিক ছাত্র এবং সাধারণ আপিস-দোকানের কত লোক—বাংলা ভাষা ছাড়তে কিছুই রাজি নয়। কবি ইকবালের নামে সাহিত্যসভা, সেখানে আমাদের সকলের স্থান, সভাপতি জোর করে রাজনীতি ঢোকাবেন।........

অমিয়চন্দ্র এর পর রামকৃষ্ণ মিশনের এবং এ ধরনের ধর্মীয় ও সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের, এমনকি আনন্দকুমার স্বামীর মত শিল্পসমালোচক ও নন্দনতত্ত্ববিদের মনও যে কি পরিমাণ রক্ষণশীল ও কুসংস্কারে আছন্ন, সেই প্রসঙ্গ তুলে ঐ চিঠিতেই কবিকে লিখছেন :

"কদিন রামকৃষ্ণ মিশনের নানা জনের কাছে ঘুরলাম—বেলুড়ে এবং এখানে।.....অনেকদিন ধরে ওঁদের কাজের ভূমিকা বুঝতে চেয়েচি—কামটা বড়ো অথচ ভূমিকা অনেকখানি কুসংস্কৃত অন্ধকার। একথা বরাবরই আশ্চর্য লাগত !! কিন্তু দুটোই একত্র থাকে অনেক অনুষ্ঠানে এবং ব্যক্তিমনে—যেমন দেখি, কুমারস্বামী বিশ্বাস করেন "সতীদাহে" (এবারে Quarterly-তে লিখচেন। Edward Thompson-এর সঙ্গে সব বিষয়ে মেলে না কিন্তু কুমারস্বামীর সতীদাহের আধ্যাত্মিক উৎসাহ দেখে তিনি যে তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন তা খুবই ভালো লেগেছিল। বেলুড়ে আছে কালীপূজা, মূর্তিভক্তি এবং মার্কিন প্রেরণায় বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব তাছাড়া নারীজাতিকে ওঁরা বলেন মেয়েমানুষ 'ধর্মের' বাহিরে, অনুকম্পায় আশ্রিত। সমালোচকের নয়, সম্পূর্ণ গ্রহণের হৃদয় নিয়েই যাই আঘাত নিয়ে ফিরি। তর্ক করতে গেলে ঔদ্ধত্য শোনায়, কিন্তু আমরা তো এসব বিষয়ে চুপ করেই থেকেছি।"

এর পর নিদারুণ ক্ষোভ ও দুঃখেই বলেন ঃ **যখন দক্ষিণ সমুদ্র তীর থেকে উত্তর হিমালয় পর্যন্ত ভারতবর্ষে আরেকবার ধর্মের নামে ধার্মিকতার ধ্বজা উঠল, বৈজ্ঞানিক হিন্দুয়ানি বা গর্বিত সংঘবদ্ধ স্পিরিচুয়ালিটি দেখা দিল তখন চুপ করে থাকাই দোষ বলে মনে হয়।** অথচ এসব নিয়ে তর্ক করতে গভীর অপ্রবৃত্তি হয়। বরঞ্চ হিন্দুমহাসভা ভালো—তারা ধর্মের কথা তোলে না, সোজাসুজি পলিটিকাল লাঠি তোলে—কিন্তু এই কি ভারতের জাগরণ?"

যখন ভারতবর্ষে অমিয় চক্রবর্তীর মত কবি বলিষ্ঠ ও উচ্চ কণ্ঠে এসব বলতে চেয়েছেন, সেই সময় প্রগতিশীল ইংরেজ কবিদের কেউ-বা Christian theology কেউবা ভারতীয় বেদান্তবাদের আধ্যাত্মিক মৌতাতেবুঁদ হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে পরে আচছি।

ইউরোপীয় ভূখণ্ড ক্রমেই অতি ভয়াল রূপ গ্রহণ করতে থাকে। নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড 'ব্লিৎস্‌ক্রীগ'-আক্রমণের মুখে ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। ডেনমার্ক, নরওয়ে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড—অবশেষে যখন মহাপরাক্রমশালী ফ্রান্সেরই পতন (১৫ই জুন, ১৯৪০) ঘটল,—সারা বিশ্বে সে কী ভয়ঙ্কর উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ত্রাস। এরই মধ্যে ব্রিটেনে চেম্বারলেন সরকারের পতন এবং চার্চিলের নেতৃত্বে আপৎকালীন 'জাতীয় সরকার' (১০ জুন) গঠন।

নাৎসীদের হাতে উপর্যুপরি স্বাধীন দেশগুলির শোচনীয় পরাজয়ের এবং যুদ্ধের পৈশাচিক বর্বরতা এবং ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত হৃদয়-মন যেন দলিত-মথিত ও বিধ্বস্ত করে দেয়। তারই প্রচণ্ড বেদনা ও যন্ত্রণার অভিঘাতে রচিত হয়, কবির 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা। 'রক্তমাখা দন্ত পংক্তির'-র (২১ সংখ্যক, ২০শে মে, ১৯৪০) কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরণ ঃ

"রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শতশত নগর-গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ভিন্ন করে,
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্চ্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্য নামে যমলোক হ'তে
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষ মানা শ্বাপদের মতো,
দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্ব সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলো ছিন্ন করে
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।"

এর কয়েকদিন পরে (৩১শে মে) লেখা 'দামামা ঐ বাজে' কবিতাটিও আজ সকলেরই সুপরিচিত।

যুদ্ধের ঠিক এই সময়টাতে কবি যতখানি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন, এমনটি বুঝি তাঁকে আর কখনো দেখা যায় নি। যেদিন ফ্রান্সের পতনের সংবাদ (১৫ই জুন, ১৯৪০) এলো, সেই দিনই তিনি

* দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ১লা এপ্রিল, ১৯৪০

† স্পষ্টই বোঝা যায় অসাবধানবশত অমিয়চন্দ্র চিঠিতে তারিখ ভুল লিখেছেন: ৩রা এপ্রিলের জায়গায় ৩রা মার্চ হয়ে গেছে।

The Second Coming! Hardly are those words out
'When a vast image out of Spiritus Mundi —
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

[illegible] [illegible]সিংহ অবতারের প্রত্যাবর্তন এখন পর্যন্ত
সূচিত হয় নি। আমাদের দেশের কবিতায় পুরাণে
যে-বস্তুদের চরিত্রের কথা আছে [illegible]
তাদেরই সন্তান। প্রেমের দুই পাশেই তাদের বাসা —
বিশেষ করে দুই পারের [illegible]দের মন্দিরে। আজ
সভ্যতার অর্জনার অভিযানে ঢাকতে ভয় যে দুই পাশেই —
এক পক্ষে নয় — সর্ব পশুসর্বস্বতায় এই যুদ্ধকে
ডেকে আনা হয়েছে। একদিকে জীত লাঞ্ছিত [illegible]
[illegible] [illegible] বর্বরতা যুদ্ধের [illegible] গাঁথছিল — [illegible]
সাম্রাজ্য/মাংসলের [illegible]
চতুর কপট লুণ্ঠন স্ফীত [illegible]
সাবধানে এই যুদ্ধের জন্যে কামনা করছিলেন এবং
যখন তা ঘটিয়ে [illegible] হয়ে উঠলেন। [illegible] রেখেছে এ দিন,

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক তারবার্তায় আমেরিকার হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালেন। এই আবেদনের শেষে কবি এই বলেই তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আশা প্রকাশ করে বলেন ঃ

"even if necessary that she will not fail her mission of stand against the Universal disaster that appears so imminent."—বস্তুত এটা দ্বিতীয় ফ্রন্ট বা যুদ্ধে আমেরিকাকে সরাসরিভাবে অবতীর্ণ হওয়ারই আবেদন। মনের এই প্রচণ্ড ক্রোধ ও উত্তেজনার মধ্যে কয়েক দিন পর এই ফ্যাসিস্ট নরপিশাচদের হিংস্র ও উন্মত্ত ধ্বংসলীলাকে প্রচণ্ড ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আক্রমণ করে অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে কবি লিখলেন (২০শে জুন, ১৯৪০):

"ডারুয়িন বলেছেন বানরের অভিব্যক্তি মানুষে কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল, তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিঁকতে পারল না——আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলচে পিষে....প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, সেই রাস্তা দিচ্চে দেখিয়ে।"* * *

অমিয় চক্রবর্তী তখন পুরীতে। রুজভেল্টকে পাঠান কবির তারবার্তাটি পাঠ করে তিনি একটু আহত হন। কবিকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন:

"Roosevelt-কে পাঠানো আপনার কথাগুলি পড়ে মনে ধাক্কা লাগল, নানা দেশের লোক শক্তি পাবে; আশা করি আমেরিকার লোক যথার্থ দায়িত্ব নিতে নামবে। যুরোপে শান্তি এবং সুবিচার অনিবার্য করবার শক্তি তাঁদের যথেষ্ট আছে—যুদ্ধে হানাহানি করে সে-শক্তির প্রয়োগ নেই কিন্তু ভীত এবং উগ্র শত্রুপক্ষেদের তারা শান্তিব্যবস্থার কক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে। **বাধ্য করতে পারে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা মৈত্রী এবং পরামর্শ করতে রাজি হয়।** নরহত্যায় নেমে বীর্য দেখাতে হলে পাপেরই ঘূর্ণাবর্ত বাড়বে এবং ফলও অবশ্যই হবে না। আমেরিকা যুদ্ধে জড়ালে ওদিকে জাপান এবং সোভিয়েটের জটিল বিরুদ্ধতা এবং সুবিধার পথ খুলবে। খুনের স্রোত ফুলবে। আপনার আহ্বান যুদ্ধের আহ্বান নয়,—পাপ প্রলয় থামাবার জন্য প্রকৃষ্টবুদ্ধিকে আহ্বান—এই বুঝেচি।" * * *

অমিয়বাবুর আশঙ্কা, সাধারণ মানুষ রুজভেল্টের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঐ আবেদন-বাণীর প্রেরণের পশ্চাতে কবির আসল ইচ্ছে বা মনোভাব এবং উদ্দেশ্যটা ধরতেই পারবে না। লোকে বুঝবে, এই মহাযুদ্ধে 'মিত্রপক্ষ'কে সমর্থন করে আমেরিকাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই যেন কবি রুজভেল্টের কাছে ঐ আবেদন জানিয়েছেন। (যদিও 'যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলি কবি খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করেছিলেন)। যার ফলে ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

অমিয় চক্রবর্তীর মতে, শুধু আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধান হতে পারে,—'যদি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা মৈত্রী এবং পরামর্শ করতে রাজী হয়।' এটা সুপরিকল্পিতভাবে না-হলেও বস্তুত ঘটনাক্রমে পরবর্তীকালে কিন্তু কিছুটা তাই-ই ঘটলো। এর বছরখানেক পরে,—হিটলারের সোভিয়েট দেশ আক্রমণের পরে (২২শে জুন, ১৯৪১) ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত উদ্যোগে যখন ফ্যাসি-বিরোধী বিশ্বমহাজোট গঠিত হয়, তখনই যুদ্ধের চরিত্ররূপ অনেকটা পরিষ্কার বা স্পষ্ট হয়। সে-ইতিহাস আজ প্রায় সকলেরই জানা।

কিন্তু তবুও ফ্রান্সের পতনের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রুজভেল্টের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই তারবার্তা প্রেরণ করায় কবি রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। বরঞ্চ এই পৈশাচিক হত্যালীলা ও তাণ্ডবনৃত্য দেখার পরও কবির নীরব থাকাটাই, ইতিহাসে নিন্দিত ও সমালোচিত হতো বেশি করে। যখন সভ্যতা ও সকল ভদ্র আচরণবিধি এবং যখন সর্বজনমান্য সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে হিটলার-মুসোলিনীর দল, একটির পর একটি দেশে বিনা-প্ররোচনায় সরাসরি নগ্ন আক্রমণ এবং নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে ধূলিসাৎ করে চলেছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের এই সব ক্রুদ্ধ ধিক্কার ও অভিসম্পাতপূর্ণ কবিতা এবং রচনা ও সৃষ্টিকর্ম ইতিহাসের চোখে কবিকে প্রোজ্জ্বল ও সহনীয় করে তুলে ধরেছে।

বিশ্ব সভ্যতার ঠিক এমনই একটা চরম সংকট মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি সমকালীন আধুনিক ও প্রগতিশীল ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকাটা স্মরণ করলে, কী দুঃসহ করুণ ও মলিন নিষ্প্রভই-না-দেখায় তাঁদেরকে! স্মরণ রাখা দরকার, অডেন স্পেণ্ডার, ঈশারউড্ প্রমুখ প্রগতিশীল ইংরেজ কবিরা—যাঁরা স্পেনের রণাঙ্গনে ফ্যাসিজম এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন (এবং বেশ কয়েকজন প্রাণও দিয়েছিলেন),—তার মাত্র বছর দেড়েক পরে, ১৯৩৯ সালে যখন সত্যি সত্যিই ফ্যাসিস্ট শক্তিজোটকে নিরস্ত ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে মহাযুদ্ধ বেধে গেল, সেই সংকটকালে তাঁরা রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে এসে হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেলেন। এবং শুধু রণাঙ্গন ত্যাগ করেই নয়—মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডকে ত্যাগ করেই কেউ কেউ আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের শুরুতেই অডেন ও ঈশারউড্ দুজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিলেন। অবশ্য তাঁদের এই দেশত্যাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণের বিরুদ্ধে সেদিন ইংল্যাণ্ডের পত্রপত্রিকায় কম নিন্দা ও সমালোচনা হয়নি। স্পেণ্ডার অডেনদের এই দেশত্যাগের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *'World Within World-'* এ লিখেছেন (P-297-301):

"In the same comment of February 1940, Conolly wrote 'the departure of Auden and Isherwood to America a year ago is the most important literary event of the decade.' It did, indeed, signify the end of a literary movement. For them, also, leaving England marked a turning point.

"They were both criticized surely for having left, when they did and their departure helped discredit the movement of the 1930's...."

বিলেতের পত্রপত্রিকায় এই ফ্যাসি-বিরোধী কবিদের এই নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা হয়। স্পেণ্ডার লিখছেন:

"Journalists sometimes complained in the Press that the anti-Fascist writers who had shown such zeal in 1936 and 1937 seemed perversely will uninterested now that the action against Hitlerism for which they had been clamouring, was really taking place."....

এই সমালোচনাতেও স্পেণ্ডার বিচলিত নন। প্রশ্ন হচ্ছে, অডেন-ঈশরউড্ প্রমুখেরা আমেরিকায় গিয়ে কি তাঁদের সেই ধারা বজায় রাখতে পেরেছেন;—তাঁরা কি আরো ভালো কবিতা লিখতে পেরেছিলেন? যুদ্ধের বাকি কয়টা বছর এবং তাঁর পরবর্তীকালে এইসব কবি (স্পেণ্ডারও) যে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা আজ প্রায় সকলেরই জানা আছে। অডেন Christian theology আর ঈশারউড্ হিন্দু বেদান্ত-বাদে * 'শান্তি' খুঁজে পেলেন। অডেনের পরিবর্তন সম্পর্কে স্পেণ্ডার লিখছেন (P 299):

---

*বহু আগেই অগ্রজ কবি T. S. rliot একদিকে Christian Theology অপরদিকে বৌদ্ধ ও হিন্দু বেদান্তের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

"He now had two main intellectual interest. One theology the other Italian opera. Just as previously he had fitted the world around him in to a Frendian or a Marxist pattern, now he fitted it into a Christian one. But now he accepted a doyma which criticized him and which was not simply an instrumentfor criticizing others."

তবু ঈশারউড্ শান্তিবাদী হিসেবে আমেরিকায় 'কোয়েকার'-পরিচালিত একটা রিফিউজি বা উদ্বাস্তু শিবিরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। স্পোণ্ডার ঈশারউড সম্পর্কে লিখছেন (P. 301) :

"He (Isherwood) was a pacifist, and was one of the group of gerald Heard and Aldous Huxley, who became interested in the Hindu philosophy of Vedanta....... Isherwood was opposed to the moral dogma of the Church and found *Vedantism* an all-embracing mystical conception....ইত্যাদি। এই হলো ইংরেজ তথাকথিত 'প্রগতিবাদী' কবিদের অবস্থা। *

ভারতবর্ষে তখন 'মুসলিম লীগ' লীগএর 'পাকিস্তান' এর দাবীতে রাজনীতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত ও জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। ঐ বৎসরে নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ অমিয় চক্রবর্তী দেশের এই বিষাক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর মনোবেদনা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখছেন :

"...এই ভারতবর্ষে আমাদের থাকতে হবে। হয় আলাদা হয়ে বেড়া তুলে পরস্পরবিরোধী জন্তুদের মতো।—না-তো সাম্য বিষয়ক আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থায় মিলিত হয়ে। ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা মানুষকে জাতির খাঁচায় বন্দী করে স্বাতন্ত্র্য এবং নির্বিঘ্নতা দিতে চায়,—জিন্না প্রভৃতিও তাই মানেন। পাকিস্তানের কথাটা তাই। এই নিয়ে ইক্‌বালের সঙ্গে তর্ক করেচি। তাঁদের ধারণা হিন্দুমুসলমান কখনো একত্রে থাকবে না,—ভারতবর্ষকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে হিন্দুমুসলমানকে গাড়ি করে চালান্ করতে থাকো। শান্তি হবে। পৃথিবীতে মাইনরিটি সমস্যার অন্য উত্তর সোভিয়েটেরা দিচ্চে তাদের ন্যাশনাল মাইনরিটি ব্যবস্থায় তাতার ইহুদি, মুসলমান খৃস্টান, ইত্যাদিকে একই সাম্যবিধানের অন্তর্গত করে। একই জায়গায় পাশাপাশি থাকবে মানুষ—উৎকর্ষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই। মিলনের ভিত্তি আর্থিক ক্ষেত্রে, সকল প্রকার শক্তির সমবেত সাধনায়। আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তারা ধর্ম বলে মানেন নি, মানুষের ধর্মকে মেনেচে। পরমার্থিক ধর্মসাধনা ব্যক্তিগত,সেখানে তো রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কথাই ওঠে না।"

সোভিয়েট নীতির প্রতি অমিয়বাবু আরও জোর সমর্থন করে কবিকে ওই পত্রেরই পরিশিষ্টে লিখছেন :

"আমরা সোভিয়েট জুলুমবিধিতে বিশ্বাস করি না—আপনি ওদের বলেছিলেন Tsarist এর কাছ থেকে ওরা উত্তরাধিকারসূত্রে এই মনস্তত্ত্ব পেয়েচে—কিন্তু স্বীকার না করে পারি না যে ওদের চেষ্টায় বৃহৎ মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎবিধান রয়েছে।....হিন্দু যদি হিন্দুয়ানি ছেড়ে যথার্থ মহাভারতকে কালে দেখতে পারে তাহলে মুসলমান আর্মানি চৈনিক বা অন্যের সংযোগ তাদের কঠিন বলে মনে হবে না যেমন মনে হয়নি প্রাচীন ভারতের নানা জাতিকে একত্র করার সময়ে।"

আগেই বলেছি, সাময়িক কোনো কারণে এক সময়ে, রবীন্দ্রনাথের মন 'সোভিয়েটের' প্রতি বিরূপ হলেও সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কবির সর্বশেষ রচনা 'সভ্যতার সংকট' এবং মিস্ র‍্যাথবোন-এর উদ্দেশে লেখা খোলা-চিঠিতেও কবি বারে বারে সোভিয়েটের শাসন-ব্যবস্থার,—বিশেষ করে সোভিয়েটের সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত মরুচর জাতি-গোষ্ঠীগুলি সার্বিক উন্নতিবিধানে তাদের সার্বিক প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সর্বোপরি—মহাযুদ্ধের ঐ অমানুষিক বর্বরতা ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় কবি ইউরোপের 'সিনিক্' বা হতাশাগ্রস্ত মানবদ্বেষীদের মত 'মানব-মহিমা'-কে উপহাস কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন নি। মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থা—মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামী সত্তার, মানুষের আত্মিক শক্তি ও সংগ্রামী মনোবলের প্রতি তাঁর অগাধ-অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং প্রণতি জানিয়ে কবি বলেছেন,—'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর শেষ মানব-বন্দনাগান রচনা করে গেলেন,—'ঐ মহামানব আসে'। অমিয় চক্রবর্তী তার ইংরেজি তর্জমা করে দিলেন ঃ

Supreme Man Comes
Earth's grass shivers with joy
Sweeping across the dust"

বস্তুত, এসব কথা কবির একান্ত এবং সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তীর সম্পর্কেও বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মত বিশাল ও অতুলনীয় প্রতিভার কবির বিস্তর মূল্যবান তথ্য এবং তাঁর চিন্তাভাবনা ও জীবনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নষ্ট হয়েচে, উপযুক্ত সেক্রেটারীর অভাবে। সে-রকম উপযুক্ত বেতনভুক সেক্রেটারী রাখার সামর্থ্যও রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই হয়নি। এ নিয়ে কবি কম কৌতুক ও হাস্য-পরিহাস করতেন না। তবু, অন্তত শেষ জীবনে, অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর মানস ও চিন্তাভাবনার খুব কাছাকাছি একজন বিদগ্ধ স্নেহভাজন বন্ধু হিসেবে। অমিয় চক্রবর্তীও তাঁর তরুণ বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথকে তার আদর্শ পুরুষ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যে অল্প 'গুরুবাদী' ভক্তিতে নয়, এটা বলাই বাহুল্য। অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে যেটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: তিনি 'মার্কসবাদী' না হয়েও সোভিয়েট রাশিয়ার এবং সেই সঙ্গে ইউরোপের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং সে-সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সদা-সর্বদা নানাভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বা ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করে গেছেন। অমিয়বাবু খুব অল্পকালই কবির সাহিত্য-সচিবের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর কম দায়িত্ববোধের পরিচয় তিনি দেন নি। ইতিহাসের বিরাট পরিপ্রেক্ষণিতে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব কোথাও খর্ব কিংবা তার হানি যাতে না—ঘটে, সে-দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। অবশ্য সব সময় তাঁর বিচার যে ঠিক হয়েছে, এমন নয়। বিশেষ করে, ভারতের এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তিনি যে কবিকে কিছুটা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি, তা নয়। তবুও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এবং তার মহত্ত্বকে (অবশ্য তাঁর নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার মত) তিনি শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছিলেন।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিপত্র এবং তার আলোকচিত্র ইত্যাদির জন্য রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতী কতৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। লেখক



* মুষ্টিমেয় ইংরেজ কবিদের কথা দিলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে 'আরাগঁ', আঁদ্রেমালরো, পিকাসো চ্যার্লি চ্যাপলিন পল রোবসন, ডলরেস, ইবারুরি, নেরুদা প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক শিল্পীরা যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলে তা আজ প্রায় সকলেরই জানা আছে।



রবীন্দ্রনাথের কলকাতা

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

পঞ্চানন কুশারী ও তাঁর অনুজ সতেরো শতকের মাঝখানে খুলনা থেকে এসে গোবিন্দপুর গাঁয়ে বসতি স্থাপন করলেন। তখন কলকাতা নামেও একটি গাঁ ছিল, গোবিন্দপুরের গা-ঘেঁসে। গাঁয়ে শুধু জেলে ও অন্য সমশ্রেণীর মানুষের বসবাস। বামুন ছিল ঐ এক রকম, তাই গাঁয়ের লোক বলত ঠাকুর। শব্দটা ফার্সী।

পঞ্চাননের দুই নাতি—নীলমণি ও দর্পনারায়ণ। এঁরা ভদ্র ও অভদ্রভাবে বহু অর্থ রোজগার করে গণ্যমান্য মানুষ হলেন। দর্পনারায়ণ থেকে পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ি আর নীলমণি থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর গোষ্ঠী । নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। পঞ্চানন থেকে দ্বারকানাথ—কলকাতার শহর জীবনের সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি। বহু গ্রাম এই নতুন কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজধানীরূপে গড়ে উঠল। জোব চার্নক কলকাতায় যখন এলেন, তখন এটি ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, যখন তিনি মারা গেলেন, তখনও এটি গ্রাম।

দ্বারকানাথের সর্বকনিষ্ঠ নাতি হলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি জন্মেছেন এই শহরে, দেহরক্ষা করেছেন এই শহরে। জোড়াসাঁকোয় তাঁর সুতিকাগৃহ, এবং তাঁর মৃত্যু আঙ্গিনা।

স্বভাবতই এমন এক হাড়ে-মাসে কলকাতা-বাবুর অভিজ্ঞতার কুঠুরীতে উঁকি দিতে কার না ইচ্ছা জাগে!

যখন তিনি জন্মেছেন তখনও কলকাতার গা থেকে গেঁয়ো গন্ধ মুছে যায়নি। তখনও জোড়াসাঁকো বাড়ির আশপাশে খোলা জমি ছিল, ছিল বাড়ির হাতার মধ্যে পুকুর, ছিল বৃদ্ধ বটগাছ, তৎসহ একটি বাগান। তা আকারে খুব ছোট্ট নয়। বাগানের পাশে একটি ঢেঁকি ঘর, আর ছিল একটি বাতাবি নেবু গাছ। এছাড়াও একটি ফাঁকা জমি ছিল, যেখানে নাকি একদিন রাজামশাই থাকতেন। আর রাস্তার ধারে ধারে ছিল বাঁধানো নালা। সেই নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল ঢুকে পড়ত জোড়াসাঁকোর পুকুরে। রবীন্দ্রনাথ অপরূপ মায়াময় গ্রন্থ 'ছেলেবেলায়' লিখলেন। ঠাকুরদাদার আমল থেকে তাই নাকি ছিল বরাদ্দ। তবে এ বরাদ্দটা আরো পূর্বের বলেই বিশ্বাস।

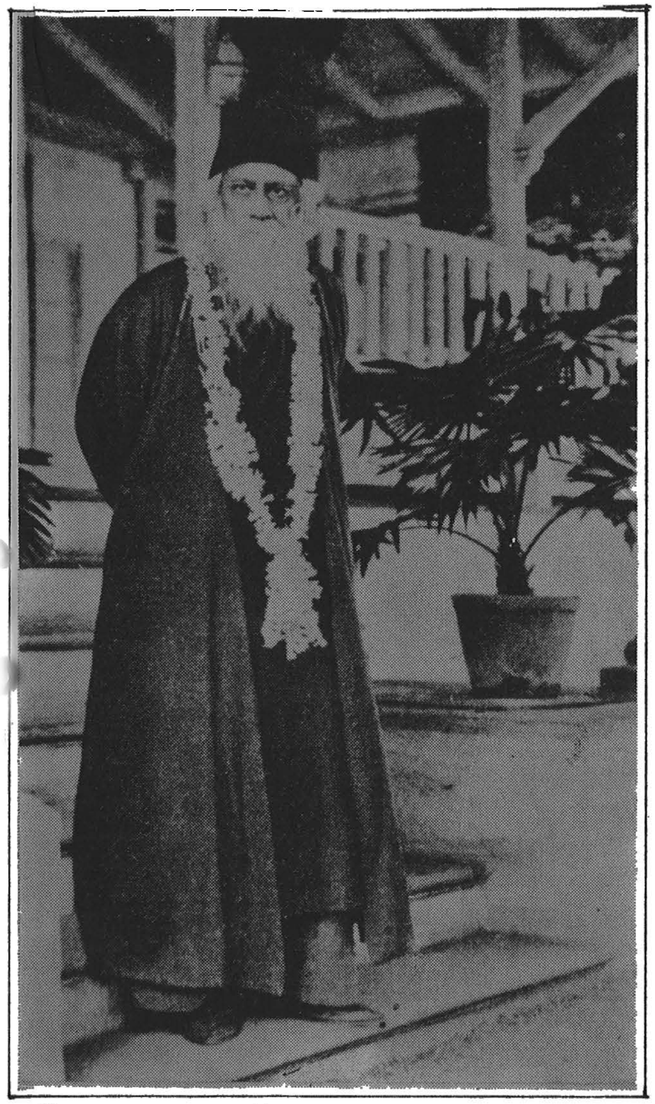
রবীন্দ্রনাথ কলকাতাকে দেখেছেন শহর গাঁয়ের মাখামাখি অবস্থায়। শহর কলকাতা কোনদিন তাঁর মন ভোলাতে পারেনি। যেটুকু ভালো লেগেছে, তা কদাচ তার শহুরে স্বভাব নয়। রাজধানী মেজাজ নয়। ভালো লেগেছে আঙ্গিনার পুকুর, ভালো লেগেছে দু'হাত দিয়ে ময়লা জল ঠেলে স্নান করছে যে বাতিকগ্রস্ত স্নানার্থী, তাকে। মন কেড়েছে ফেরিওলার ডাক, নীল আকাশে নিঃসঙ্গ চিলের চীৎকার। কলকাতার দুপুরের দুটি কাকলি, এক ফেরিওয়ালার ডাক, দুই চিলের ডাক। কলকাতার প্রতি কোন অভিজাত আকর্ষণ তিনি বোধ করেন নি। বরং ডেঙ্গু জ্বরের আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে কয়েকদিন তাঁদের কাটাতে হয়। সেই সামান্য কটি দিনের স্মৃতি ছয়-সাত বৎসরের স্মৃতিকে টপকে গেল। "গঙ্গার তীরভুমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল।" বিলেত থেকে ফিরে জ্যোতিদাদার সঙ্গে চন্দননগরে গঙ্গার তীরে আর একবার আশ্রয় নেন। তখনকার মনোভাবও একই

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা—
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।



রবীন্দ্রনাথ : অশোক ঘোষের সৌজন্যে

রকম। "আমার গঙ্গার তীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কলকাতার গা-ঘেঁসা গঙ্গা একবারও এই আদর পেল না। রবীন্দ্রনাথ শুধু স্কুল-পলাতক নন, কলকাতা -পলাতকও বটে।

॥ ২ ॥

অথচ এই কলকাতা শুধু জন্ম-মৃত্যুর দীর্ঘ ইতিহাস দিয়ে জড়িয়ে নেই, তার কবিত্ব উন্মেষ, যা আরও সদর্থকভাবে। বলা যায় জীবন বোধের উন্মেষে হিমালয় বা অন্য কোন মহীয়ান প্রাকৃতিক প্রকাশের দাক্ষিণ্য থাকল না। এবারও সেই বহু-উপেক্ষিত কলকাতা। বিস্ময়কর ব্যাপার।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি, ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তর হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটা অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্র তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"

তারপর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। সেখানে "ভাঙ্ ভাঙ্ কারা" এই আহ্বান এসেছে; সে কি শুধু আত্মিক বিষাদমগ্নচারিতা সম্পর্কে প্রযুক্ত হবে? বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে কি হবে না?

'প্রভাত সঙ্গীতে কবি গাইলেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমনস্ক হলেন কবে থেকে? বোধহয় বোধের ইতিহাসের কোন তারিখ নির্ণয় করা যায় না। এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আর সামনেও একটি ইতিহাস তৈরি হয়ে চলে।

॥ ৩ ॥

'মানসী' কাব্যে কলকাতা-বীতরাগ একটু কড়া সুরে কথিত। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা এক পত্র-কবিতায় লিখছেন।

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙ্গায় বড়ো কিচিমিচি। এই ডাঙ্গাটি হল কলকাতা। তখন আর্যামির কুশাঙ্কুর গজিয়ে উঠে ভদ্র ও অনুভূতিপ্রাণ মানুষের পথ-চলা কষ্টদায়ক করে তুলেছে।

শুধু চিঠিতে নয়, কারণ বেসরকারী বিবৃতি হোল চিঠি ও ডাইরি, রোজনামচা। কিন্তু একটি বড়ো কবিতায় এই ভাবনা রয়েছে।

হায়রে রাজধানী পাষাণ কারা।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।

বালিকার জবানীতে কবির নিজের মনোভাব দুই-এক ফোঁটা কি বের হয়ে আসেনি?

তখনকার কলকাতার তর্ক-বিতর্ক কবির কাছে অনুমোদনযোগ্য মনে হয়নি। তখন বাস্তব-বর্জিত ফাঁকা স্বদেশীয়ানার যুগ এবং অন্তঃসারশূন্য আর্যামির আস্ফালনের কাল। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সব শহুরে মত্ততার স্রষ্টা, তার নাম বলার দরকার নেই। কবি এই কলকাতাকে প্রীতির চোখে দেখেন নি—কলকাতার ভৌগোলিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমানভাবে তাঁর বিরক্তির কারণ হোল।

দুই-একটি কবিতায় যা বলেছেন, ছোটগল্পে তার পুনর্কথন হয়েছে। ছুটি গল্পে কলকাতার সব থেকে নিষ্ঠুর সমালোচনা। ফটিক তাঁর মামার আগ্রহাতিশয্যে মানুষ হতে কলকাতায় এল। কলকাতায় নদী নেই, নদীতীর নেই, নেই অবারিত মাঠ। আছে দুই কামরাসম্বল এক ছোট্ট মাথা গুজবার ঠাঁই। আর এই কলকাতা শহরেই ছাত্রজীবনে মোহিতচন্দ্র হেমশশী নামে এক বালিকার সর্বনাশ করেছিল; পরে বিচারকরূপে সেই মোহিতচন্দ্রের সঙ্গে হেমশশীর দেখা হোল, তখন হেমশশী হয়েছে মোক্ষদা। এই কলকাতা শহরের ধনী নাগরিক গোপীনাথ তার স্ত্রী গিরিবালাকে লাথি মেরে তার গা থেকে অলংকার জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গান্ধর্ব থিয়েটারের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গ-র চরণে সমর্পণ করল। একদিন গিরিবালা গৃহত্যাগিনী হয়ে ঐ গান্ধর্ব থিয়েটারে লবঙ্গ-পরিত্যক্ত ভূমিকায় মঞ্চে নামল। "সমগ্র কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল।" কত বড় মর্মান্তিক নাটক এর অন্তরালে চাপা পড়ে রইল, কলকাতার কৌতুক-রঙ্গ লোভী দর্শক তার খোঁজ জানে না।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রায় সব কয়টি কলকাতা-কেন্দ্রিক। উপন্যাস প্রত্যক্ষ জীবনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে সে উপন্যাস থাকে না। হয় উপকথা। 'চোখের বালি' মধ্য কলকাতায় হাঁটাচলা করেছে, 'নৌকাডুবি' হেদোর আশপাশের বাসিন্দাদের গল্প। মহেন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, যখন-তখন ইচ্ছে করলে বা রাগ করলে কলেজে যেত, তাতে মনে হয় আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলেই সে থাকত। তখন বাগবাজারও ছিল দূরবর্তী স্থান। বাগবাজারের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে



ডাকঘরের স্মরণ নিতে হোত! বাগবাজারে বাগান সংলগ্ন বাড়িও ছিল—পশুপতি বসুর মত ধনবান ব্যক্তিদের গৃহ যেমন।

নৌকাডুবির অন্নদাবাবুর গৃহ মধ্য কলকাতায় অবস্থিত ছিল। কারণ ধারে-কাছেই কলেজের ছেলেরা 'মেস' ঘরে থাকত। এই রকম একটা মেসেই রমেশ থাকত। কারণ অন্নদাবাবুর মেয়ে হেমনলিনী স্নানের পর ছাদে চুল শুকোতে যেত, রমেশচন্দ্র দেখতে পেতেন। তখনকার সময়ে মেয়ে দেখা, এবং তাদের সঙ্গে কথা বলা সহজ ব্যাপার ছিল না। ভাগ্যক্রমে অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহপাঠী ছিল। তার মধ্যস্থতায় রমেশ হেমনলিনীর সঙ্গে পরিচিত হল।

'গোরা' উপন্যাসে কৃষ্ণদয়ালবাবুর বাসাবাড়িও মধ্য কলকাতায় ছিল। এবং বিনয় কাছেই একটা মেসে থাকত। পরেশবাবুর গৃহও খুব দূরবর্তী ছিল না। তাঁর পথদুর্ঘটনা বিনয়ের বাসার সম্মুখেই ঘটে। তখনকার ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনা বড়ো সাংঘাতিক খবর। পরেশবাবুর গৃহ থেকে বিনয়ের গৃহ খুবই কাছে, কারণ একটি বালক পর্যন্ত একা ঐ গৃহে যেতে পারত। নিকটে বিধায় বিনয়ের কিছু সুবিধে হয়েছিল। সুবিধার কথা থাক্‌সংকটের কথা বলি। সংকট বিনয় আর ললিতার ব্যক্তিগত, কিন্তু সে তর্কটা পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। একটি সামাজিক অসবর্ণ বিবাহ বিধি নিয়ে। বিনয় কি সেই আইনের সুযোগ নেবে? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এই সংকটের ফয়সালা করেছেন তা একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের। কলকাতায় কি ব্রাহ্ম সমাজ, কি হিন্দু সমাজ-কেউ এটা অনুমোদন করত না। কলকাতা শহর ছাড়া এই দুই তরুণ-তরুণী মিলিত হতে পারত না, কিন্তু তাদের মিলন সংঘটিত হোল কলকাতার বাঞ্ছিত বা স্বীকৃত পথে নয়।

গোরার তর্ক একাকী গোরার নয়, সমগ্র দেশবাসীর। এই তর্ক রাজধানী কলকাতা ছাড়া অন্যত্র এত প্রকট হতে পারত না। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে কেশবচন্দ্র সেন যে কলকাতার বাসিন্দা, সেখানেই পশেরবাবুরা থাকেন। হেদোতলায় পরেশবাবু থাকেন, বিবেকানন্দের গৃহ পাঁচ মিনিটের মধ্যে। পরেশবাবুর বাড়িতে চা-পানের রেওয়াজ আছে। তাঁরা মাটিতে বসে আহার করেন না। মেয়েরা অনাত্মীয় পুরুষের সম্মুখে বের হতে সংকোচ বোধ করে না। এতো গেল বাইরের খবর। ভিতরের খবর বাইরের কিছু কিছু উপকরণ থেকে অনুমান করা যায়। গৃহের দেওয়ালে কেশব সেনের ছবি আছে, যীশুখৃষ্টের ছবি আছে। পড়েন এমার্সন ও থিয়োডার পার্কারের বই। কন্যা রাধারাণীর নাম পালটে সুচরিতা করা হয়েছে; রাধারাণী বন্ধুকন্যা, কিন্তু সেই পৌত্তলিক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে বিঘ্ন ঘটে নি। কিন্তু নামটা মনে করা গেল না। পরেশবাবুর মেয়েরা স্কুলে যায়, গান শেখে, আবৃত্তি শেখে, পশম দিয়ে টিয়া পাখি বানায়। তখন কালীপুরের বাগানবাড়িতে তিন বঙ্গীয় সন্তানকে সম্বর্ধনা দেওয়া হোল, তাঁরা আই সি এস হয়ে এসেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু ও উদারনীতিক ব্রাহ্ম আর আলাদা থাকতে পারবে না। সেই মিলনের জন্য অন্যবিধ আলোড়ন সমাজ-দেহে দেখা দিচ্ছে। গোরা উপন্যাসের কলকাতা নগরের নাড়িতে নাড়িতে সেই কলরবের স্পন্দনধ্বনিত, পরিবর্তনের আহ্বান শোনা যাচ্ছে।

এই কাহিনী বলার জন্যই কলকাতার আমন্ত্রণ। কলকাতা ব্যতীত এই গল্প কে বলবে? উপন্যাসের সূচনায় দেখি (অর্থাৎ বিনয় দেখছে), শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই—ফেরিওলা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাঁহারা অফিসে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায়- বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনুন জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে তবু এত বড় কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আকাশের ধারা যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ লইয়া চলিয়াছে।

* * * *

ক্ষুদ্র বাসা কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল।

(গোরা)

কলকাতার প্রতি এই নিন্দা শুধু বিশেষণে স্তব্ধ হোল না। একটি অলংকৃত বাক্যও দেখা দিয়েছে। "বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নিচে কলকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মত লেজের মধ্যে মুখ গুজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।" 'কঠিনহৃদয়, কুৎসিত' প্রভৃতি বিশেষণ দুটির পাশে এই সারমেয়-সান্নিধ্য প্রেমের অবকাশ আর রাখে না। কিন্তু ভর্ৎসনা সত্ত্বেও কলকাতা ছাড়া বিনয় গোরা, ললিতা সুচরিতা, হেমনলিনী রমেশের চিত্ত উন্মেষের আর স্থান কই? সদর স্ট্রীট বা কলকাতা এদের স্রষ্টারই কি কেবল হৃদয় জাগিয়েছে?

নৌকাডুবিতে একটা উপমা আছে, সেটিও উৎকলিত করা গেল, "তাহার (রমেশের) দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার ছুটির কলিকাতা জোয়ারের নদীর মতো তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চল মুখর হইয়া উঠিয়াছে।" ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতায় তার লক্ষ্য হোল গ্রামবাংলা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র এমন বাগ্‌বৈদগ্ধ্য আর কোথায় পেতাম, কলকাতা ছাড়া। প্রমথ চৌধুরী যতই কৃষ্ণনগরের বুলির স্তুতি করুন, তার যা কিছু শক্তিসামর্থও ভারতচন্দ্রের হাতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল (হাসির গানে) কৃষ্ণনাগরিকতার সার্থকতা দিয়েছেন এরকম ভাবা হয়ত বা বেশি অঞ্চল-প্রেমজনিত।

চতুরঙ্গ, চার অধ্যায় এমনকি শেষের কবিতা কলকাতার কঠিন বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন নাগরিক জীবন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম 'ঘরে বাইরে'। ঘরে বাইরে বাংলাদেশ যখন একটা ভাবের প্লাবনে শহর ও গ্রামকে একটি অনুভবে নিমজ্জিত করেছিল, সেই মহাকালের হাতের আখরে লেখা। নিখিলেশ বা সন্দীপেরা কলকাতার তর্কগুলো গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে। ভাব যখন বহমান হয়, তখন তা আন্দোলনের রূপ নেয়। আর তখন তা কোথা থেকে এল, এ প্রশ্ন জরুরী নয়।

শেষের কবিতার ঘটনাংশ ঘটেছে শিলং পাহাড়ে, এমনকি বিয়ে দু' জোড়া হবে, তারও একটি হবে রামগড় পাহাড়ে। কলকাতায় ঝুড়ি ঝুড়ি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, অথচ লাবণ্যের জন্য অন্য অঙ্গন চাই। কিন্তু গোটা উপন্যাসের চত্বর তীব্র প্রখর নাগরালির আলোকে উদ্ভাসিত। শহর না জন্মালে, আধুনিক শহর ব্যতীত উপন্যাস রচিত হতে পারে না।

॥ ৫ ॥

ভর্ৎসনা প্রায় সব সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতায় জুটেছে। পলাতকার সেই মৃত্যুপথযাত্রিনী বধূটির কথা বলি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে লেখা 'বধূ' কবিতার মত সর্বাত্মকভাবে কলকাতা শহরকে পাষাণনির্মিত কারাগার বলেন নি, কিন্তু কলকাতায় মেয়েদের জীবনে কোন ছুটি নেই, বাইরের পৃথিবীর কোন নিমন্ত্রণ নেই। কলকাতা তাদের সুখের বাসস্থান নয়।

একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি বসেই এক চাকাতেই বাধা
পাকের ঘেরে বাধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।

আর এক ভদ্রমহিলা বলেছেন, তোমাদের গলিকে আমি ভয় করিনে। তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবগাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠেছে সেদিন জানতুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে।"

অতঃপর ভদ্রমহিলা সিদ্ধান্ত নিলেন 'তোমাদের সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আর ফিরব না।' মানসীর বধূ বয়সে বালিকা, মৃণাল মধ্যবয়সী। তাদের অভিজ্ঞতা বয়সের পার্থক্য ঘুচিয়ে কলকাতাকে একই অক্ষরে সম্ভাষণ করল, শুধু দেবনাগরী হরফের সঙ্গে বঙ্গলিপির যে পার্থক্য শুধু মেয়েদের অভিজ্ঞতায় কলকাতার এই মর্মান্তিক রূপ কেন ফুটবে? অফিসে-আদালতে দৌড়াদৌড়ি করেন বলে পুরুষেরা কি কানের বা চোখের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? দুটি শক্তিই যাদের টিকে আছে, এমন একটি মধ্যবিত্ত কেরাণীর মারফত কলকাতার এক বাস্তব বর্ণনা পাই।

আমি ছাড়া ঘরে থাকে আর একটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি
তফাৎ আমার সঙ্গে এইটুকু শুধু
নেই তার অন্নের অভাব।

কলকাতা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি মনোহারী নয়, তাই বলে তাকে কি লুকিয়ে রাখতে হবে? ধলেশ্বরী নদীতীরে যে থাকে, থাকুক, ছোটগল্পে তাদের ত' কতবার এনেছেন। কলকাতার এই সব গৃহ থেকে একটি রতন বা মৃন্ময়ী বের হোল না।

১৯০০ সালে জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা এক চিঠিতে পাই, "আমি রঘুপতি সাজিব, সেই জন্য সঙ্গীত সমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়েছি।"

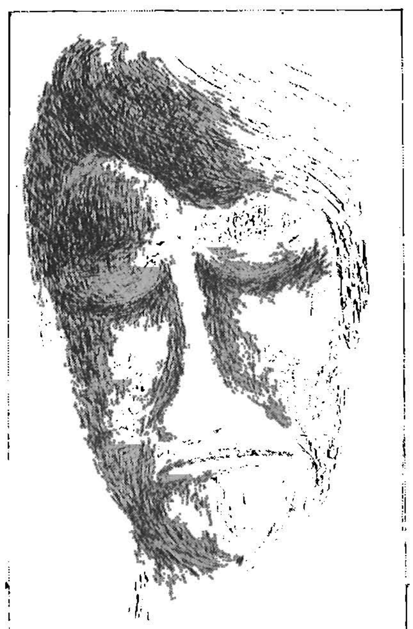
দুই দশক পর এক চিঠিতে লিখেছেন, "ক্লান্তির বোঝা লইয়া কলিকাতা হইতে উড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি।" এর চোদ্দ বছর পর বাসন্তী দেবী মহাশয়াকে লিখছেন, "পরদিনই পালিয়ে এসেছি জোড়াসাঁকো থেকে। ত্রিশের দশকে কলকাতায় এলে উঠছেন বরানগরে প্রশান্ত মহালানবীশের গৃহে।

সত্তর বৎসর বয়সে পা দিলে তখন তিক্ততা ফিকে হয়ে গেছে। কলকাতাকে নিয়ে রঙ্গরস করেছেন। যৌবনের সাহিত্যে বির্জিতলা ছিল, ঐ এলাকা তখন নির্জন। কিন্তু টেরিটিবাজার কলুটোলার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি।

আজ তাদের নিয়ে রহস্য জমাতে আপত্তি নেই। আর সেই সব রহস্য শুনবার উদগ্রীব শ্রোতা দেখা দিয়েছে। 'সে', 'ছড়ার ছবি,' 'খাপছাড়া'তে ভিড় করে থাকে কলকাতার কুশীলব, পথঘাট। সাহেব আলি জোনাব আলি মির্জার গৃহ কোথায় তার তরে এতদিন মাথাব্যথা একদিনও দেখিনি। আজ দেখছি শিশুর কৌতূহল প্রয়োজনের চরণে সেলাম ঠুকে শান্ত হয় না। তাকে খুশি করতে দাদুকে লিখতে হোল ওর বাসা আর্মানি গির্জার পাশে। ঐ শিশুর কৌতূহল মেটাতে লেখা হোল ছেলেবেলা নামক কলকাতা-কেন্দ্রিক অপরূপ রূপকথা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় এক শত বৎসর আগে লিখেছিলেন কলিকাতা কমলালয়। চমৎকার বই, কিন্তু বয়স্কদের জন্য।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও একবার কলকাতাকে ছুঁয়ে আজগুবি গল্প ফেঁদেছিলেন। সেখানে গল্পের গোরু গাছে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ আজগুবি গল্প বলেন নি, আজব বই লিখেছেন। নিজের ছেলেবেলার কালটি যেন রহস্যময় এক কাল, আর কলকাতা যেন 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা'র সেই অপূর্ব পুরী। সমুদ্র নেই, আছে ত' নদী। ব্যস্।

এইভাবে বিরক্তিতে-কৌতুকে কলকাতাকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভাষিত করেছেন। কলকাতার সাধ্য কি সেই পরস্পরবিরোধী সম্ভাষণকে অগ্রাহ্য করে!





বর্ণ, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

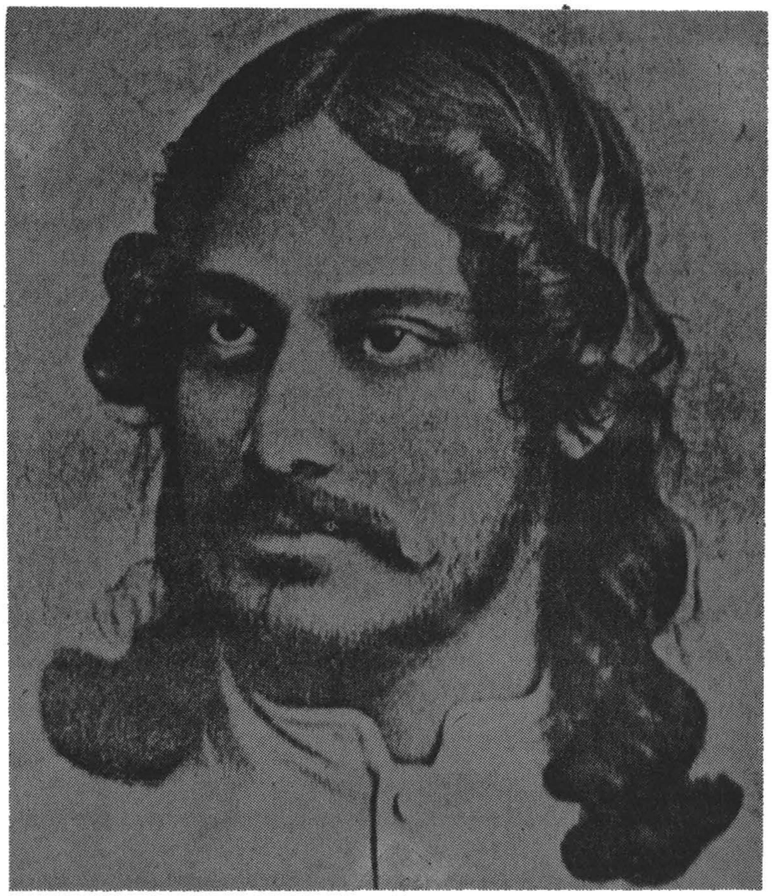
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ মধ্যবর্তী বাংলার সমাজের মানস-উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো রবীন্দ্র প্রতিভা। বিচ্ছেদ বিভঙ্গে বিশ্লিষ্ট বাংলার তরঙ্গহীন সমাজে ইংরেজ এনেছিল তরঙ্গ, সৃষ্টি করেছিল নতুন দ্বন্দ্ব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন শক্তির সংঘাতে ভূমি-নির্ভর মধ্যযুগীয় সমাজের দেওয়াল ভেঙে এক ধরনের গতিশীলতা এসেছিল। মার্কস যথার্থই বুঝেছিলেন পুঁজিশাসিত অর্থনীতির ক্রম প্রভাব ভারতীয় সমাজের সাবেকী ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করবে। শিল্পায়ন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অচিরেই নতুন এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর জন্ম হলো। আঠার শতকের এই আমিন-গোমস্তা-সেরেস্তাদার-ঠিকাদাররাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী ধনী ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ভিত রচনা করে। ইংরেজের ভূমি, বাণিজ্য ও শিল্পনীতি এবং তার প্রয়োগের সঙ্গে ছিল এদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এই মধ্যবর্তী ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্তই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস। তাই নবজাগরণের কুশীলবদের সঙ্গে প্রথম যুগে কোম্পানীর অর্থনৈতিক এজেন্টদের মিতালীর সম্বন্ধ অনিবার্য ও ইতিহাস নির্দিষ্ট।

অষ্টাদশ শতকের সামাজিক গতিধারার দ্যোতক কর্মোদ্যোগ, উদ্যমশীলতা, আত্মবিশ্বাস, নব্য-সাংস্কৃতিক চেতনা অর্থাৎ নবজাগরণের বীজমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বারকানাথ, রামমোহন প্রমুখ। পুঁজি যে সৃষ্টিশীল দ্বারকানাথের জীবন ও কর্ম তার মূর্তরূপ। সামন্ত অভিজাত দ্বারকানাথ একের পর এক জমিদারী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাশাপাশি নবীন সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু কলেজে, মেডিকেল কলেজ, সতীদাহ নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসংস্কারমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিল্পপতির সন্তান, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তরুণ ডিরেকটর দেবেন্দ্রনাথের চেতনায় কিন্তু দেখা দিল প্রথাবিরুদ্ধ জীবন জিজ্ঞাসা ও বৈরাগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতিভেদ বিরোধিতা,

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কার-সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর-আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭



ব্রাহ্মণে-শূদ্রে পারস্পরিক ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপন প্রয়াস, আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, ঈশ্বর ভাবনাকে শাস্ত্রাচার থেকে মানব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নবজাগরণের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, মানবতাবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দ্বারকানাথ ছিলেন ধনসম্পদ সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা, আর দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী মানবসম্পদ সৃষ্টিতে আগ্রহী। বস্তুতঃ পিতার সচল অর্থচেতনা, ফলিতবিদ্যা ও বিজ্ঞান মনস্কতার বাস্তব উৎস থেকে দেবেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের জন্ম। নবজাগরণের মানবতাবাদ, আত্মচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দ্বারকানাথের কর্মযোগ, সৃষ্টিক্ষমতা সতর্ক উদ্যম, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞান এবং দেবেন্দ্রনাথের নিরাসক্তি, ঐতিহ্যবোধ ও পরিশীলিত সাংস্কৃতিক চেতনার শোণিত ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। সুতরাং সহজেই অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথের সতত বিকাশশীল প্রতিভার অনেক বৈশিষ্ট্য মূল—আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ, সর্বভারতীয় ঐতিহ্য-চেতনা, আত্মশক্তি সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা, আত্ম চেতনাশ্রয়ী ধর্ম-বোধ, কর্মযোগ, বিজ্ঞান মনস্কতা, চলমানতা সম্পর্কে নিগূঢ়চেতনা এবং গভীর নিরাসক্তি—দৃঢ়বদ্ধ ছিল ঐতিহ্যের বিভিন্ন স্তরের গভীরে।

স্বভাবতই শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের কর্মানুশীলন ও ভাবচর্চায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান ঘটেছিল। একদিকে ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম ও দর্শন, অপরদিকে নব্য ইয়োরোপীয় প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও দর্শন; একদিকে প্রাচ্য প্রতীচ্য ক্লাসিক চর্চা, অপরদিকে নবজাগরণোত্তর ইয়োরোপীয় রোমান্টিক শিল্প-সাহিত্যচর্চা। বস্তুত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পচর্চার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্পদৃষ্টির সমগ্রতা-উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্র প্রতিভার এই অতলান্ত নির্যাসশক্তির মূলে ছিল তার পারিবারিক ও ঐতিহ্যিক পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়ী এবং সামঞ্জস্য বিধানকারী সমগ্রতা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মধ্যবর্তী শ্রেণীর ইংরেজ-সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দেশীয় ধনিক শ্রেণীর উচ্চরেখ গতিশীলতা ঔপনিবেশিক পরিবেশে সীমিত হয়ে যায়, অপরদিকে মোঘল আমলের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার কালে যে জনগণ সাময়িক স্বস্তি পেয়েছিল তার দ্রুত মোহমুক্তি ঘটতে লাগল, ফলস্বরূপ পাগলা বিদ্রোহ, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, করাজি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। এই বিদ্রোহগুলি যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের বিস্তার ঘটিয়েছিল তেমনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে জনগণকে সাহসী করে তুলেছিল। পাশাপাশি শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে যে জ্ঞানালোকের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল তাও জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল অনিবার্যভাবে। রামমোহন রায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্বে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই উভয় ধারার প্রভাবেই বাংলাদেশে সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন জয়লাভ করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রটি গড়ে ওঠে প্রধানতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কেন্দ্রে এবং ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেন্দ্রিক দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং রবীন্দ্রভ্রাতাদের স্বদেশ চেতনামূলক নিগূঢ় প্রেরণায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উদ্দীপিত হন। হিন্দু মেলা, স্বদেশী মেলা সঞ্জীবনী সভা ইত্যাদি ছিল স্বাদেশিকতার রোমান্টিক চর্চার ক্ষেত্রসমূহ। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় সংস্কার প্রয়াসের পাশাপাশি হিন্দু পুনরুত্থানবাদের উদ্ভবও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণের ধাত্রী ক্রোড়ে যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও বিকাশ ছিল সাবজেকটিভ্ তাই যৌবনে পল্লী বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। শুধু ভাবরূপে নয় বস্তুরূপে যেমন দেশ তাঁর দর্পণে মূর্ত হয়ে ওঠে তেমনি দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশ্ব বিবেকের অন্যতম পুরোধা পুরুষরূপে গড়ে তোলে।

নবজাগরণোত্তর ইয়োরোপীয় ধনবাদী সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ও বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের চেতনা প্রবাহে নবতর শক্তি ও প্রাণাবেগ সঞ্চার করে। ইয়োরোপীয় ধনবাদী সভ্যতার প্রগতিশীল চরিত্র যখন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, ইয়োরোপ যখন তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি প্রসারিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ যখন ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদী তখনই তাঁর জীবন শেষের তীর্থদর্শন রাশিয়া ভ্রমণ। রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশমান চিন্তা-চেতনায় রুশ ভ্রমণের প্রভাব কী অতলস্পর্শী হয়েছিল তা তাঁর রাশিয়ার চিঠি এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠি পত্রে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা সুদীর্ঘকালের এই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বহমান।

।। দুই ।।

জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের বড় পরিচয় ছিল 'গুরুদেব' অভিধায়। এই সম্বোধন শুধু শান্তিনিকেতনের আবাসিকদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল তাই নয়, বিদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আজানুলম্বিত পোষাক, শ্মশ্রুমন্ডিত সৌম্যকান্তি, মানবিক ক্ষুদ্রতা বর্জিত ঊর্ধ্বমুখী জীবনদর্শন তাঁর গুরুদেব পরিচয়কে এতখানি মহিমময় করেছিল যে তাঁকে অনেকে সাধুসন্ত ভাবতে শুরু করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী উপনিষদের কবি বলে তাঁকে মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন জনমানব থেকে নির্বাসিত রাখার প্রচেষ্টা হয়েছিল। আজ খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব পরিচয়ে অভিহিত করেন।

ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম, বহু সম্প্রদায় এবং জাতপাত জল চল-অচলের দেশে আজও ধর্মীয় সমস্যাটি ক্রমশ প্রকট হয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। সুতরাং যে রবীন্দ্রনাথ সমকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে সরব, তিনি ধর্ম, জাতপাত, সম্প্রদায় এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কী চিন্তাভাবনা ও পথ নির্দেশ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে আজ এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে।

বলাই বাহুল্য অন্যান্য প্রসঙ্গের মতোই ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত সম্পর্কে রবীন্দ্র চিন্তাভাবনা সারাজীবন এক ক্ষেত্রিক ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। এক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তার বিবর্তন বিস্ময়করভাবে প্রগতিমুখী। যিনি কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের সচিব পদে বৃত হয়েছিলেন, ব্রহ্ম মন্দির ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত সাধনা-উপাসনায় কিছু সময় ব্যয় করতেন তিনিই ধর্মকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণের অন্যতম অস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে তিনটি উদ্ধৃতি রবীন্দ্রচিন্তার প্রগতি রেখা সূচিত করবেঃ

ক. ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না, চাহিও না (ভারতীঃ মাঘ ১২৯১)

খ. অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোন সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করিনে। (পত্র ১০৩, চিঠিপত্র ৯)।

গ. এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। (রাশিয়ার চিঠি)

বিভিন্ন সময়ের এই বক্তব্যকে কেউ কেউ রবীন্দ্র ভাবনার বৈপরীত্য বলে ব্যাখ্যা করেন প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর উপলব্ধির উত্তরণ। গোরা, অচলায়তন, রক্তকরবী, রথের রশি'র ক্রমধারা অনুসরণ করলে এর সত্যতা প্রতীয়মান হবে।

মনুষ্যত্ব ও ধর্ম এই উভয় বিষয়ে সারা জীবন দার্শনিক ভাবনার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীতিলাভ করেছিলেন তার মর্মকথা মানুষের ধর্ম। "জিগীষা" নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে

বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো।" (বিশ্ববোধ ঃ শান্তিনিকেতন—২)। তিনি ধর্ম ও আচার সর্বস্ব ধর্মতন্ত্রকে পৃথক করেছিলেন। তাঁর মতে "মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং... মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র। (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ঃ কালান্তর)।

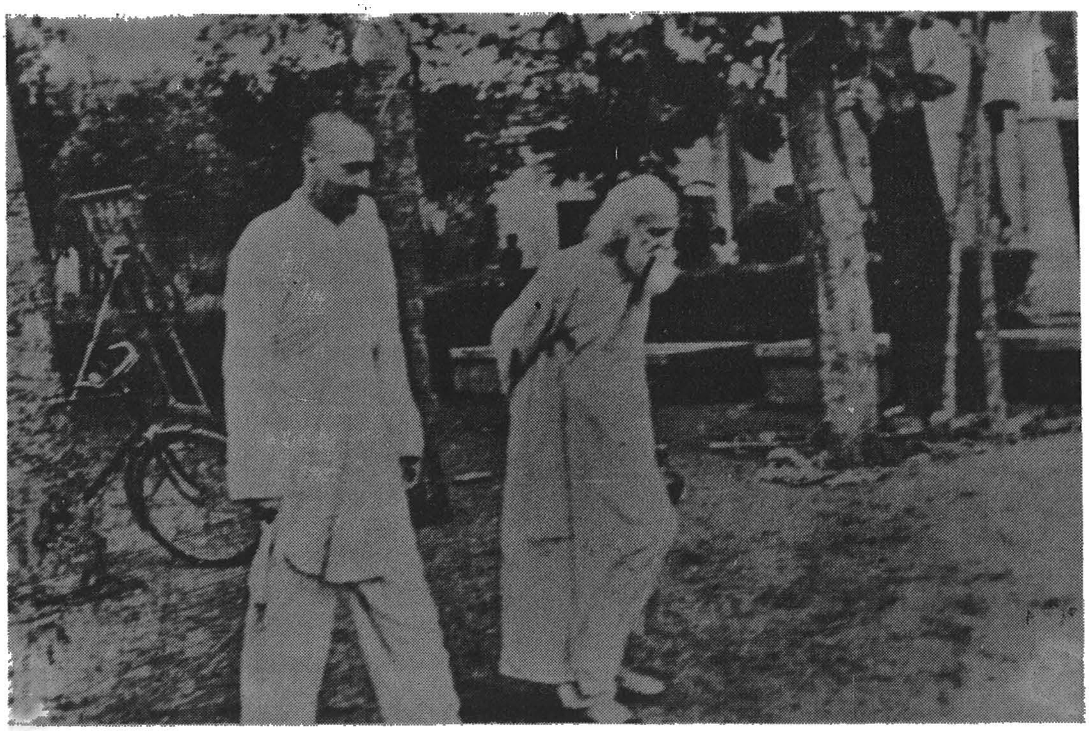
।। তিন ।।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় হিন্দু- মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ, হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্ণ বিভাগজনিত ভেদাভেদ অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সমস্যা স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের পথে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা করেছে। আজও এর অভিশাপ থেকে ভারতীয় জনগণকে মুক্ত করা যায় নি বরং তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে নিত্য দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হরিজন হত্যার মাধ্যমে। অস্পৃশ্যতার বর্তমান রূপের জন্য বর্ণাশ্রমকে অধিকতর দায়ী করা চলে। বর্ণাশ্রম ধর্মানুযায়ী হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত। জন্মসূত্র ছাড়া যেমন হিন্দু হওয়া সম্ভব নয় তেমনি বর্ণপ্রাপ্তিও ঘটে জন্মসূত্রে। জন্মগতভাবে এই বিভাগের সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের শূদ্রদের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচান সম্ভব ছিল না। বস্তুত দীর্ঘকাল শ্রমজীবী জনসাধারণকে অশুচি ও নিম্নবর্ণের আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে শোষণের প্রক্রিয়াটি জোরদার রয়েছে। মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাব একই দোষে দুষ্ট। শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ভোগ করেছে। ফলে বাংলার নবজাগরণের যা কিছু সুফল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা লাভ করেছে বলে পরবর্তীকালে অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ কালবারণ দোষে দুষ্ট। বাংলার নবজাগরণ শিল্প বিপ্লবোত্তর কোন ধনবাদী দেশে ঘটে নি, ঘটেছে একটি ঔপনিবেশিক দেশে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ে বিশেষ না হলেও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে আন্দোলন সেকালে বেশ প্রবলই হয়েছিল। আর হয়েছিল বলেই ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাংলায় এই সমস্যা অনেক কম। অস্পৃশ্যতা বিরোধী গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন যে সমস্ত প্রদেশে সংঘটিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা কোন গভীর প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। যদি পারত তাহলে আজ এত হানাহানি ঘটতো না। জাত ধর্ম অস্পৃশ্যতা বিরোধী রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এ-দেশে এখনও কমই আলোচিত, যদিও এক্ষেত্রেও তিনি সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী আদি ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা। এখানেই প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক মতামত ও অস্পৃশ্যতা তথা বর্ণাশ্রম বিরোধিতা কি প্রথম জীবন থেকেই ছিল? না, ছিল না। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে পল্লী বাংলায় অর্থাৎ ১৮৯১ সালে।

১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে দ্বিধাচিত্ত ছিলেন, কখনও কখনও সমর্থনও করেছেন। এই দ্বিধার অবসান দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটে। সমাজ ও ধর্মভাবনায় পিতার মতাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্তি (দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৯০৫ সালে) এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথকে রক্ষণশীলতা মুক্ত হতে সাহায্য করে তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ দুটি দশকে তিনি বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

।। চার ।।

'গীতাঞ্জলি' রচনাকালের পূর্ব পর্যন্ত অনেক সামাজিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দিলেও জন্মগত সংস্কারসমূহের প্রশ্নে দ্বিধা গোপন করতে পারেন নি। সমাজে অস্পৃশ্যতা থাক আধুনিক উদার বুদ্ধির প্রেরণায় তা তিনি চান নি,



৩১ আগস্ট ১৯৩৪ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও খান আবদুল গফ্ফর খান
প্রয়াত হরেন ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, অশোক ঘোষের সৌজন্যে

কিন্তু অস্পৃশ্যতাকে লালন করে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তাকে তিনি শ্রেয় বলে কখনও কখনও মনে করেছেন। পল্লী বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রে তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হন। তিনি উপলব্ধি করেন পেশাগত দিক দিয়ে তো নয়ই, কোন দিক থেকেই এরা অপমানিত বা ঘৃণিত হওয়ার যোগ্য নয়। বরং এদের লোকায়ত ধর্মের মধ্যে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত মানব ধর্মের পরিচয় দেখে তিনি মুগ্ধ হন। শুরু হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় লালিত রবীন্দ্রনাথ ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব।

সংস্কারমুক্তির প্রেরণা তিনি সামান্যভাবে হলেও পরিবারের মধ্যে পেয়েছিলেন। পিতামহ দ্বারকানাথ আচার-বিচারের ক্ষেত্রে অনেকখানি উদার ছিলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে অনেক ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন। রামমোহনের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রকাশ্যে বেদপাঠ হতো না, পাছে অব্রাহ্মণ কেউ তা শুনে ফেলে। ১৮৪২ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন প্রকাশ্যে বেদপাঠ হবে। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহনের পরে ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ নিজে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং উপনয়ন প্রথমে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মনোভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমের প্রতি প্রবলভাবে মোহগ্রস্ত হন। তিনি যখন উপবীত ত্যাগ করেন তখন সুধী রাজনারায়ণ বসু তাঁকে একাজ থেকে নিবৃত্ত হতে পত্র দিয়েছিলেন। সেই রাজনারায়ণ বসুকেই ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন বাসর থেকে অব্রাহ্মণ বলে অপসারিত হতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের এই রক্ষণশীলতা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দিকে জড়তায় আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বাস্তব জীবনের অভিঘাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শহর কলকাতার পরিবেশে জাত-ধর্ম অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তত বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল না। বিশেষতঃ ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে মেলামেশার সুযোগও ছিল না। তত্ত্বগত কিছু ধারণা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেন পল্লী বাংলায়। ১৮91 সালের লোকগণনার বিবরণ থেকে জানা যায় নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৮%, ৭৪% ও ৭৯%। এদের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। হিন্দুদের মধ্যে মাত্র ১০% ছিল উচ্চবর্ণের বাকী বিপুল সংখ্যক হিন্দু ছিল নিম্নবর্ণের অর্থাৎ অন্ত্যজ। জমিদারি তদারকি উপলক্ষ্যে তিনি নিবিড়ভাবে জনসমাজের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক সম্পর্কের চরম অবনতি প্রত্যক্ষ করেন। নীচের দুটি উদ্ধৃতি থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণের পরিচয় মিলবেঃ

ক. আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেই স্থানে তাকে স্থান দেওয়া হত। (হিন্দু-মুসলমানঃ কালান্তর)।

খ. আমি পল্লীগ্রামে দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরী করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবী করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে, বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। (কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ)।

অথচ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের বর্ণাশ্রমপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। এর প্রধান কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, পিতা দেবেন্দ্রনাথের কঠোর অনুশাসন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) পশ্চাদপদতা। ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে (১৯০১) কঠোর হিন্দু অনুশাসন পালিত হত। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক তবে আহার স্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক।" রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাব এর অনুকূলে ছিল। কায়স্থ শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা প্রণাম করবে কি না এ নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করে এক পত্রে জানান, "যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পদস্পর্শপূর্বক প্রণাম এবং অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" স্বভাবতই এই বিধান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেন নি, তাই পত্রের শেষে লিখেছেন, 'অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই?'

যা কিছু প্রাচীন তাই শ্রেয় এবং আধুনিককালের সব কিছুই খারাপ এই প্রচলিত মনোভাব থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্ত ছিলেন না এই যুগে। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় তবে স্কন্ধ ও গ্রীবাকে (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-লেখক) একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।" (ব্রাহ্মণঃ রচনাবলী ৪। পৃঃ ৩৯৫)। প্রসঙ্গত বলা যায় 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়'মাল্যদান'একটি আষাঢ়ে গল্প প্রভৃতি গল্পে, বর্ণাশ্রম সমস্যাকে প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন ঠিকই কিন্তু সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করেন নি। প্রথম অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে। কিন্তু নাটকে প্রকৃতির অন্ত্যজ জীবনের জন্য তার জন্ম দায়ী নয়, দায়ী পিতার ধর্মভ্রষ্টতা। এখানেও কবির উদার মানবিকতা সমস্যাটির সামাজিক দিকের উপর প্রলেপ দান করেছে। অথচ এই পর্বেই একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেনঃ "প্রথমত আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্যায়-অবিচার, অমূলক অহংকার পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানব ঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লান মুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি। আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানব ঘৃণার উৎপত্তি হয় কিনা, এবং কোনো একটি জাতির আপামর সাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করার অধিকারী কিনা তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।" (নূতন ও পুরাতনঃ রচনাবলী ১১, পৃঃ ৪৭৯)। ১৮৯৫ সালে 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের অস্পৃশ্যতা বিরোধী কার্যকলাপকে উচ্চমূল্য দিয়ে বলেন, "তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানব ধর্মবশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"

।। পাঁচ ।।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে সমাজ ভাবনায় আরও উদার করে তোলে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্ব থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে একটা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ থেকেই যায়। ব্রিটিশ সরকার এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করে এবং সদ্য গঠিত মুসলিম লীগ তার প্রতি সমর্থনও জানায়। রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক ঘটনার তাৎপর্য শুধু অনুধাবন করেছিলেন তাই নয় এক মহামিলন মন্ত্রে

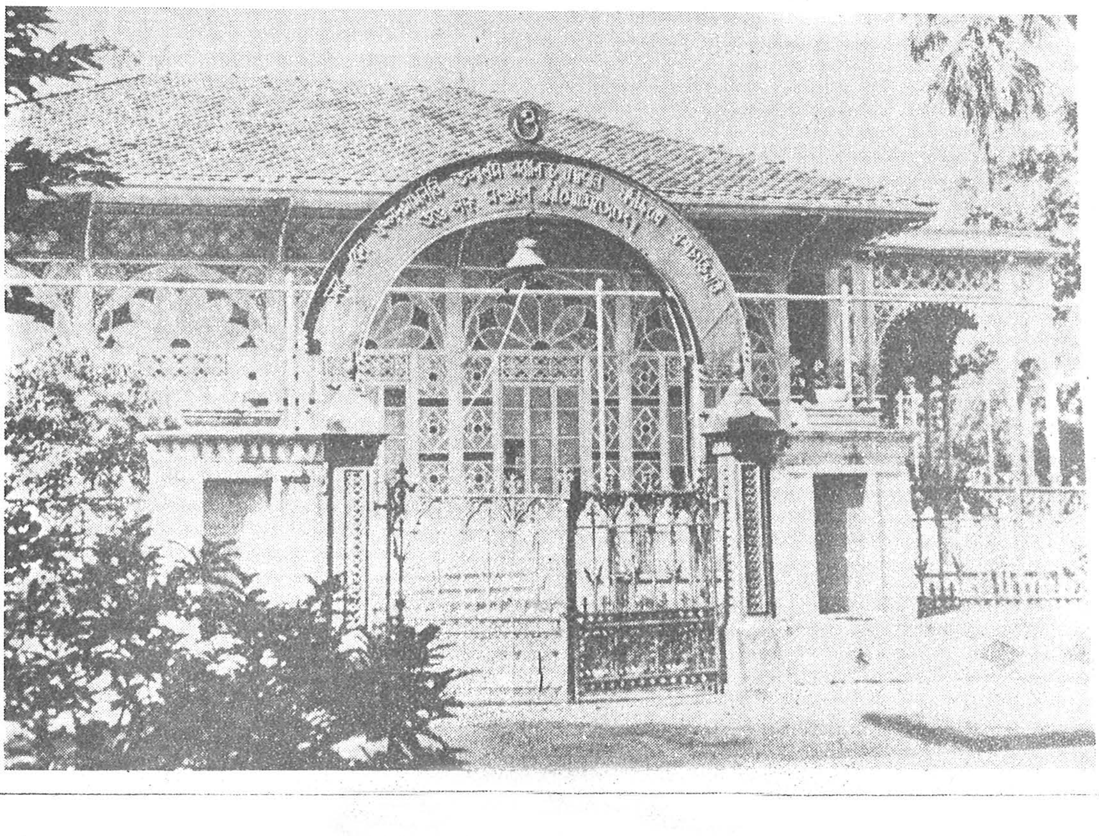
সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। এই পর্বে রচিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যভেদ লুপ্ত করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুর ধ্বনিত হয়, তাঁর কামনা "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে/মুক্ত করো হে বন্ধ।" ভারততীর্থ কবিতায় আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন ঃ

"এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করো মন
ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

যে রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতীয় শাস্ত্র ও হিন্দুধর্মের আনুগত্যে ব্রাহ্মণত্ব তথা বর্ণাশ্রমের শ্রেয়ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন তিনি জাতির দুর্দিনে জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কম্বুকণ্ঠে সামাজিক ভেদাভেদকে বিনিপাত জানিয়ে আগামী সর্বনাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায়। কবি বলেছেন, বড় দেরী হয়ে গেছে এখনো সবারে না যদি ডাক তাহলে সর্বনাশের চরম লগ্নে 'মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান'। ঐ সময় আর কেউ জাতিকে এমন করে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে জানা নেই।

কথা সাহিত্যের মধ্যে 'গোরা' উপন্যাসে সমগ্র সমাজের সার্মাগ্রক সমস্যাবলী আলোচিত হয়েছে। 'গোরা' বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস, যে উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ, সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নতুন আদর্শ সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিন্তা বিপর্যয়, যুক্তি তর্কের উত্তাপ, অনুভূতির উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি, এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী এক শ্রেণীর সমগ্র জীবনধারা রূপ গ্রহণ করেছে। গোরা চরিত্রটি যেন আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মপ্রতিকৃতি। গোরার মতোই রবীন্দ্রনামেতেও হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বমানবতায় উত্তরণ ঘটেছিল। গোরা প্রত্যেক দিন সকালবেলায় নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পাড়ায় মেলামেশা করতে যেত এবং তাদের আতিথ্য গ্রহণের জন্যই তামাক খাওয়া ধরেছিল। তাকে তারা দাদাঠাকুর বলে ডাকত। মানবতাবাদী গোরা তাই পুনর্জন্ম লাভের পরে সগর্বে আত্ম ঘোষণা করে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" এই উপন্যাসেই পরেশবাবুর কণ্ঠে রবীন্দ্র উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোন দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান ও ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব?" 'ঘরে বাইরে' উপনাসে নিখিলেশের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।"

"অচলায়তন" নাটকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য সমস্যা ও রক্ষণশীলতাকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। শোনপাংশু ও দর্ভকদের রূপকে তিনি মুসলমান ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের মুখ্য ভূমিকায় এনেছেন তাই নয় অচলায়তন ভাঙার কাজে তারাই শরিক হয়েছে। রবীন্দ্র-চিন্তাদর্শ বিভিন্ন নাটকে ঠাকুরদা বা ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকে ঠার্কুদা তথাকথিত ম্লেচ্ছদের নিয়েই হিন্দু ধর্মের তথা হিন্দুপ্রধান সমাজের অচলায়তন ভেঙেছেন এবং তাও সশস্ত্র উপায়ে। এই নাটকে



শান্তিনিকেতন উপাসনাগৃহ ঃ ছবি ঃ অশোক ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ সমস্যার ভাগবত রূপের অতিরিক্ত কার্যকরী ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ করেছেন জনসমাজকে।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরে ভারতবর্ষের রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নিল। দীর্ঘকাল অপমানিত ও অবহেলিত হওয়ার ফলে মুসলমান ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনেও বহু ক্ষেত্রে যোগদান করেনি। বিলাতি পণ্য বয়কট আন্দোলন ব্যাপক হলেও মুসলমান ও নমঃশূদ্ররা সেই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেনি। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা বিরোধের জন্য কোন কার্যকরী পন্থা কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার পথের বাধাটা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাধাটা কোথায় গভীর বিশ্লেষণে ধরিয়ে দিলেন—"জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, তারপর এদের ডেকে বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, 'আমরা পৃথক'। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম তোলা আসলে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে।" (কালান্তর)

তাই হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে ইংরেজ কাজে লাগাচ্ছে, এই অভিযোগকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব না দিয়ে বলতে চেয়েছেন নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে আত্মানুসন্ধান করো। তিনি বলেছেন, "মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।" অন্যত্র বলেছেন, "বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেন না, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না।" সুতরাং রাজনৈতিক গরজে নয় মনুষ্যত্বের দাবীতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ অস্পৃশ্যতার অবসানের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন।

।। ছয় ।।

শান্তিনিকেতনে জাতিভেদ দূরীকরণে রবীন্দ্রনাথকে বেশ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি কোন কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন ফলে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। ১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের বিশ জন ছাত্রের শান্তিনিকেতনে আগমন এবং ১৯১৫ সালে গান্ধীর শান্তিনিকেতন ভ্রমণ আশ্রমের পরিবেশ পরিবর্তনে এবং জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছিল। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষে সৌকত আলী বাংলাদেশে আসেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করেন। বিধর্মী এই মাননীয় অতিথির আগমনে আশ্রমের সমস্ত বাধানিষেধ দূরীভূত হয়ে যায়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"এখানে এতকাল মুসলমানদের সম্বন্ধে যে গোঁড়ামি কর্মীদের মধ্যে ছিল, তাহা আজ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বয়ং সৌকত আলীকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আহার স্থানে বসাইলেন। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান বালক ছাত্ররূপে আসিবার প্রার্থী হয় তখন তাহাকে কোথায় কিভাবে আহার করিতে দেওয়া যাইবে, তাহা লইয়া অনেকের কী দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সাময়িক উত্তেজনায় ও আশু রাজনৈতিক ফললাভের আশায় মানুষ হঠাৎ বড় কাজ করিয়া ফেলে—ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত।.... রবীন্দ্রনাথের শত উপদেশও একাজ এতদিনে হয় নাই কারণ সেখানে উত্তেজনা ছিল না, ছিল বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধির উপর নির্ভর। বস্তুত যুগপ্রভাব রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াসে শান্তি- নিকেতন জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। একাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় ১৯২১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিশ্বভারতীতে রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে। তিনি বিশ্বভারতীকে সমস্ত মানুষের তপস্যার ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ অভিযান সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা নিরোধ সমিতি' গঠন করেন। এই সময় কেরালায় কেলাপান নামে একজন গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দাবিতে আমরণ অনশন করেন। রবীন্দ্রনাথ কোচিনের মহারাজের কাছে লিখিত এক পত্রে দাবী স্বীকার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে সখ্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বহু প্রশ্নে মতবিরোধিতাও ঘটেছে। গান্ধীজী বহু ঘোষিত 'হরিজন' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ 'হরিজন' বলতে একটি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে তাই নয় একটা অনুকম্পার ভাবও বিজড়িত রয়েছে। বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ' নামটিও রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গঠন করলেন 'সংস্কার সমিতি' আর অস্পৃশ্যদের নাম দিয়েছিলেন 'দুর্গত', একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে শান্তিনিকেতনের সমস্ত কর্মীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল ঃ "এতকাল হিন্দু সমাজে যাহারা অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।" রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই সার্বজনীন ভোজের আসর বসিয়ে সমস্ত বর্ণ ধর্মের মানুষকে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতেন। এমন একটি আসরে তিনি বলেন, "আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র বচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকার মগ্ন করে রেখেছি, আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে?" এই পর্বে রচিত প্রথম পূজা, শুচি, মুক্তি, স্নান সমাপন, রঙরেজিনী, অচলা বুড়ি প্রভৃতি কবিতায় অস্পৃশ্যতা ও আচরণিক ধর্ম বিষয় স্থান পায়। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে চণ্ডাল কন্যার বেদনাকে তিনি মানবিক আবেদনে মহান করে তুলেছেন। অপর দিকে 'রথের রশি' নাটকে সমগ্র সমাজকে একত্র করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শূদ্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাজের রথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। এই শ্রমজীবী জনগণই সমাজের মূলশক্তি।

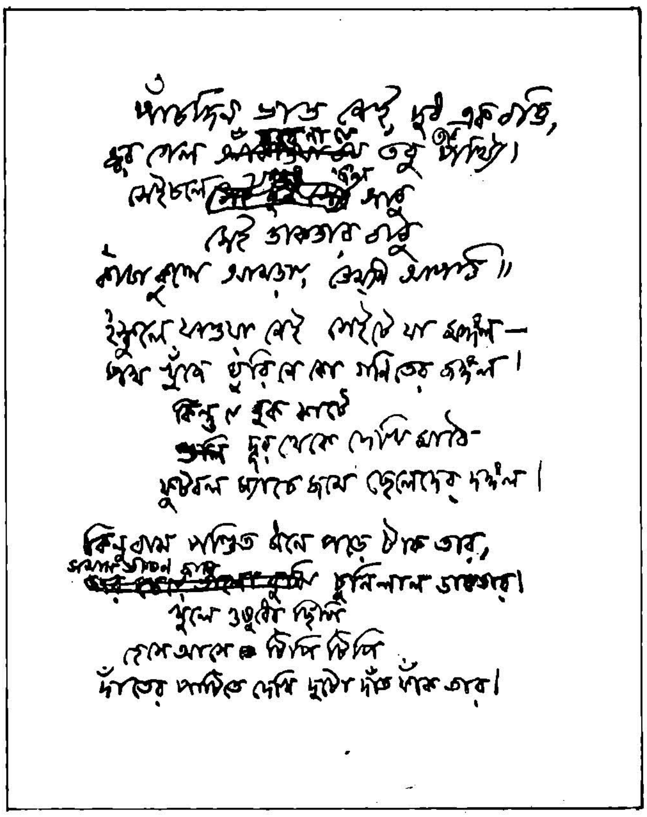
শ্রীনিকেতনের একটি উৎসবে তিনি বলেন, "আমাদের দেশে আমরা পরবাসী অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য। যখনি দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখেই যাই বলি মনে মনে আমরা জানি সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব?" সমাজ ও দেশ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাও হাত মিলিয়ে চলে। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন তিনিই উত্তরকালে ধর্মের তকমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেস্টার কলেজে 'The Religion of Man' নামের বক্তৃতায় এবং ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে দেখা যায় পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বস্তুতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে ঈশ্বর নামে মাত্রই উপস্থিত মানব কল্যানের প্রেরণা এবং প্রেম সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। মানবপ্রেম নির্ভর রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম উপেক্ষা করে সমস্ত প্রকার সংকীর্ণ জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, এমন কি মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর সমস্ত প্রকার সংস্কারসমূহকে। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের অধিকতর অস্পৃশ্যতা বিরোধী

হয়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর ধর্মভাবনার এই বিকশিত রূপের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

।। সাত ।।

১৯৩২ সালের পুনা চুক্তিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় জনসংখ্যার অনুপাতে সব সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের এ চুক্তি মনঃপুত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। শরৎচন্দ্র যিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্ণের মানুষের ব্যথা-বেদনার রূপ দেন তিনিও এই চুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, "পুনাচুক্তি মানিয়া লওয়ায় তাহাদের স্বার্থ সংস্কৃতি বিপন্ন"। রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা যে সম্পূর্ণ স্বার্থচিন্তা শূন্য ছিল, এ তথ্যে তার প্রমাণ মেলে। অতি আবেগে ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলারও তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারে নিদারুণ ভূমিকম্পে বহু মানুষ হতাহত হয়। গান্ধীজী এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও বিধাতার কোপ হিসেবে বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে লেখেনঃ "অস্পৃশ্যতার পাপে যাহারা হত বা আহত হইয়াছে যাহাদের গৃহাদি ধ্বংস হইয়াছে বিধাতার শাস্তি তাহাদের উপর পড়িল। আর সারা দেশময় যাহারা স্পর্শদোষ মানিয়া চলিতেছে তাহারা তো দিব্য বাঁচিয়া থাকিল... এই যুক্তি মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে।"

গান্ধীজী ছিলেন রাজনীতিবিদ্, তাঁর কার্যপদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মিল না হওয়াই সম্ভব। তাছাড়া গান্ধীজীর মন ও চিন্তা- ভাবনার ভিত্তিমূলে বিজ্ঞানের ভূমিকা সামান্যই ছিল। রবীন্দ্রনাথে ঠিক উল্টোটা। বিজ্ঞান নির্ভরতা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মূলে। একারণে মতের অমিল হেতু তাঁকে অনেক সময় কংগ্রেস নেতাদের বিরাগ ভাজন হতে হয়েছে। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম- ভাবনাও এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছায় যার মধ্যে কোন সামাজিক কুসংস্কারের ছায়াপাত ছিল না। 'মানুষের ধর্ম' নিবন্ধে সেই বিশ্বজনীন মানবতা মহিমময় রূপে প্রকাশিত। এই আলোচনায় তিনি উপনিষদের কোন কোন শ্লোকের যেমন নতুন ব্যাখ্যা দেন, তেমনি বাউল ও সুফী মতবাদকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুতঃ তাঁর মানবধর্ম পরিণতিতে পাশ্চাত্যের নাস্তিক হিউম্যানিজমের এক আস্তিক সংস্করণ। সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরোপলব্ধি এই মানব-ধর্মের মূলকথা। অস্পৃশ্যতার আন্তরিক বিরোধিতা ও তথাকথিত অস্পৃশ্য সাধারণের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা সামগ্রিক মানবতাবোধের পরিচায়ক। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী এক সৃষ্টিশীল মহান পুরুষ। পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, কৃষিকাজের সুবিধার্থে পতিসরের ব্যাঙ্কে নোবেল পুরস্কারের টাকা গচ্ছিত রাখা— এ সবই তাঁর সেই মানবপ্রেমিক ভাববাদী গণতান্ত্রিক মহৎ মনের প্রকাশ। গ্রামবাংলার গণজীবনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত মানসকে কোন দিন বিশীর্ণ হতে দেয়নি, কালের দাবীতে নিত্য সচল প্রাণ প্রবাহে তিনি ছিলেন চলমান, প্রগতিমুখী। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা একারণেই জীবনবিমুখ অকর্মক নয় সকর্মক। বিশ্বজগতাশ্রয়ী চলমান মানবপ্রেমই তাঁর সর্বাস্তিবাদী ধর্ম বিশ্বাসের মূল উৎস।



ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা শুধু নয় নাস্তিকতাকেও রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় মনে করেছেন জীবন সায়াহ্নে এবং এই ধর্মকারার প্রাচীর ভাঙার উদাত্ত আহ্বান জাগিয়েছেন তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতায়। বর্তমান ভারতের ধর্মান্ধতাজনিত বিকারগ্রস্ত পরিস্থিতিতে এই কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম তাই পুরোটাই উদ্ধৃত হলোঃ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ যে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া।
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

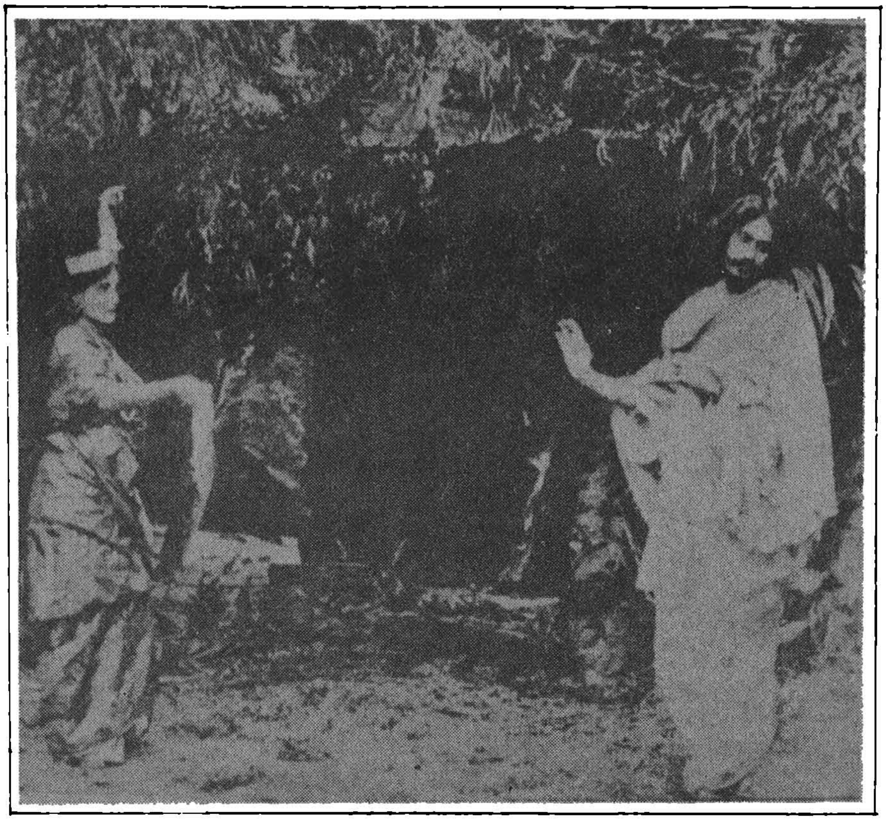
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রহানো,
এ অভাগাদেশে জ্ঞানের আলোক আনো।



রবীন্দ্র-নাটকে ভারতীয় চেতনা

জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে কিছু বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। অবশ্য বিশাল শেকস্‌পীয়রীয় আলোচনা সাহিত্যের বিচিত্র বহুমুখী বিশ্লেষণের তুলনায় তা অতি সামান্য। বর্তমান নিবন্ধের ক্ষিপ্র পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাট্যের গভীর ও বিস্তৃত মনন সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না নতুন কথা বলা কয়েকটি স্বাভাবিক কারণেই। তন্মধ্যে প্রধান কারণ, বলাবাহুল্য লেখকের অক্ষমতা। তবে একথা বলা দুঃসাহসিক হবে কিনা জানি না যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, অনন্য বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, উত্তরসূরী-বঞ্চিত নিঃসঙ্গ সম্রাট। প্রথমেই স্বীকার্য যে, গিরীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ রচনা, অভিনয় ও প্রযোজনার মাধ্যমে বাংলার নাট্য আন্দোলনে যে আভিজাত্যের স্পর্শ দিয়েছেন, মর্যাদায় যে কৌলীন্য দান করেছেন, সারা ভারতের নাট্যকার ও প্রযোজক, অভিনয় শিল্পী ও নাট্যরসিক, দর্শক ও মহিলামহলকে যে উদ্দীপনা, সাহস ও সুরুচির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার তুলনা বিশ্বের আর কোন অভিজাত পরিবারে খুঁজে পাওয়া যাবে না।



'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী

ঠাকুরবাড়ীর দান তাই নাট্য ইতিহাস রচনাকালে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিতে হয়। বস্তুত ঠাকুরবাড়ীর নাট্যপ্রচেষ্টা একটি বিশিষ্টতা দাবী করে, আলাদা একটি নাট্যরীতির প্রবক্তা হিসাবে। তাই বাংলার নাট্য ঐতিহ্যে ঠাকুরবাড়ীর সাধকদের প্রতিভার দীপ্তি একক মহিমায় উজ্জ্বল। পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো এই দুই ঠাকুরবাড়ী বাংলার নাট্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে রইল। চিহ্নিত রইল ১৮৩১ খৃঃ, ২৮শে ডিসেম্বরের প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রচেষ্টায় কলকাতার প্রথম জাতীয় নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন। নাটক ও নাট্যশালাকে জাতীয়তাধর্মী করার প্রথম প্রচেষ্টা দেখি ঠাকুরবাড়ীর এইসব নাট্য উৎসাহী প্রতিভাধরদের কর্ম প্রচেষ্টায়। একটি জাতীয় নাট্যশালা গঠনের প্রথম অনুপ্রেরণা আসে পশ্চিমী শিক্ষায় সুশিক্ষিত গণেন্দ্রনাথ (জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে কোন যুরোপীয় সূত্র থেকে নয়, গ্রামবাংলার গোপাল উড়ের যাত্রা থেকেই। সেইসব নাট্যশালা ক্ষণস্থায়ী হলেও একটি বিশেষ প্রচেষ্টাকে সূচিত করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৯০৭ খৃঃ 'জুলিয়াস সীজার' অনুবাদ যখন করেন তখন তাঁর ত্রিশখানিরও উপর নাটক লেখা শেষ হ'য়ে গেছে, সংস্কৃত অনুবাদসমেত। শেকস্‌পীয়রকে দূরে সরিয়ে নাটক লেখা তখনকার যুগে প্রায় অসম্ভবই ছিল।[১] 'হ্যামলেট', 'ম্যাক্‌বেথ', 'লীয়র' বা 'ওথেলো'-কে বাদ দিয়ে 'জুলিয়াস সীজার'কেই বা কেন তিনি বেছে নিলেন? এই নির্বাচনের মূলে কি কোন ভারতীয় চেতনা কাজ করেনি? ব্রুটাস-এর 'স্টোয়েসিজম্', সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল নিঃসন্দেহে।

রবীন্দ্র জীবন ও কর্মে, চিন্তায় ও সাহিত্যে য়ুরোপীয় জীবনদর্শনের কিছুটা প্রভাব অস্পষ্ট নয়। তবে,

"অতীত ভারতবর্ষের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও ধারণায়, স্বপ্নে ও কল্পনায়, যেখানে যা কিছু তাঁর কাছে অর্থবহ ও সৃষ্টিগর্ভ বলে মনে হয়েছিল, বেদ-উপনিষদ কাল থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত, তার সমস্ত সূত্রই তিনি আহরণ করেছিলেন একটি একটি ক'রে, পরমযত্নে ও ভালবাসায় এবং নিজের চিন্তায় ও কর্মে। ধ্যান ও কল্পনার সঙ্গে সেই সব সুতো টানা-পোড়েনের জমাট করে বুনে আপন সমগ্র

(১) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'সেকস্‌পীয়রের নাটক আমাদের নিকট বরাবর নাটকের আদর্শ, তাহার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।' [দ্রঃ 'মালিনী'র ভূমিকা]

ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রজীবন ও কর্মে ঐতিহ্যের সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ এইভাবেই সম্ভব হ'য়েছিল।

[ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র ও ভারতীয় ঐতিহ্য, রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড), পৃঃ ২২]।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়ের প্রভাবই এই সাঙ্গীকরণ ও সমন্বয় সাধনে কার্যকরী হ'য়েছিল। বৈষ্ণব কবিতা থেকে যেমন 'আমি' ময়তা পেয়েছেন, তেমনি উপনিষদ থেকে পেয়েছেন বিশ্বজনীনতা।

[দ্রষ্টব্য 'জীবন-দেবতা', কবি কথিত অনুলিপি, দেশ, ১৩ই জানুয়ারী'৬৮, পৃঃ ১০৫৩]।

নাটকের মাধ্যমেও 'আমি' ও 'বিশ্ব' হাতে হাত রেখে আনন্দ উৎসবে উপস্থিত হয়েছে। এই মাধ্যম নির্বাচনের মূলেও যে দেশীয় যাত্রার প্রেরণা কাজ করেছে তার প্রমাণ 'ছেলেবেলা'তেই পাওয়া যাবে। যদিও ডঃ সুকুমার সেন বলেছেনঃ

"প্রথমবার বিলাতে গিয়া সেখানকার পারিবারিক মণ্ডলে স্বাধীন আনন্দচর্চার আস্বাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের পরিবারে সেই আনন্দ পরিবেশ আনিতে মন করিলেন। এই সূত্রেই তাঁহার নাট্য রচনায় আরম্ভ।"

[বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৩১]।

কবি প্রায় পঞ্চাশটি নাটকের রচয়িতা। একথা স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বাল্মীকি প্রতিভা' (ফাল্গুন ১২৮৭), গানের মালায় গাঁথা 'সুরের নাটক' । রামায়ণের কাহিনীই তাঁকে আকৃষ্ট করল ও তিনি খাঁটি স্বদেশী জিনিস নিজ প্রতিভার রঙে রঞ্জিত ক'রে তৎকালীন পশ্চিমী প্রভাবে আচ্ছন্ন রসিক সমাজের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন। ('কাল-মৃগয়া' আর একখানি মাত্র রামায়ণের কাহিনী ভিত্তিক নাটক, ১২৮৯ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত ও 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উপলক্ষে অভিনীত)। লক্ষ্যণীয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় পশ্চিমী অপেরা নয়, যাত্রার প্রভাবই বেশি; যদিও আইরিশ সুরের প্রভাব তিনি স্বীকার করেছেন। ১৮৮১ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৬ই ফাল্গুন, শনিবার ১১৮৭) 'বিদ্বজ্জন সভা'র এক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস প্রভৃতি সে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ উপলক্ষে একটি গানও রচনা করেন। গানটির আরম্ভঃ

ওঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকোনা আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি;
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইত পুনর্বার.....

কবির বয়স তখন বিশ, বঙ্কিমের তেতাল্লিশ, গুরুদাসের সাঁইত্রিশ। কবির সেই সাধারণের সম্মুখে প্রথম অভিনয় বাল্মীকির ভূমিকায়। পরে ১৮৮৬ সালে, স্টার থিয়েটারে আবার বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। উপলক্ষ আদি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ। মঞ্চে এই প্রথম অভিনয়। এখানে একথা বলা অবান্তর হবে না, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঘরোয়া অভিনয় (১৮৭৭- এর আগে) 'বিবাহ উৎসব' নাটকে। শোনা যায় এই নাটকে তিনি একটি নারী ভূমিকায় অভিনয় করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করবো না' নাটকে অলীকবাবু চরিত্রে প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

যাই হোক, 'বাল্মীকি প্রতিভা' পালা নাটক থেকেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু। আমরা জানি দেশীয় ছড়া ও রূপকথাই তাঁর পাঠ্যারম্ভের প্রথম সোপান। তারপর এল রামায়ণ, মহাভারত, দাশরথির পাঁচালী। কৈশোরে দেখলেন পালাগান, লীলাগান, তর্জা, বাউল গান, কবির লড়াই, যাত্রা। পড়লেন বৌদ্ধ সাহিত্য। এইসব অভিনয়ের মধ্যে ছিল উপদেশমূলক কাহিনী, সঙ্গীত, নৃত্য, রস-রসিকতা, রূপক আর লোকশিক্ষার জন্য ছিল উপসংহারে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়। কবির মন ছোটবেলা থেকেই এইসব মুক্তাঙ্গন অভিনয় দ্বারা যে পুষ্ট হয়েছিল তার স্বীকৃতি 'ছেলেবেলা'র মধ্যেই পাওয়া যাবে। বিদেশী পণ্ডিতরাও এই মত মেনে নিয়েছেন যে লোকসাহিত্যই রবীন্দ্র-নাটকের উৎস মূল। (Rabindranath and the Folk-Literature of Bengal-by Dusan Zbairtal, Prague.)

এথেন্সে যেমন, ভারতবর্ষেও পালাগান তেমনি বহু প্রচলিত আনন্দ ও শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী 'মিস্ট্রী' বা 'মিরাক্ল্ প্লে'-ও তাই ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই মুক্তাঙ্গনে অভিনেয় পালা নাটকবিশেষ, একটি মুক্তচিত্ত মানুষ হবে যার মধ্যমণি — অনেকটা গ্রীক নাটকে কোরাসের মত যার ভূমিকা। টমসন সাহেবও বলেছেনঃ

....his drama is more acceptable in open courtyard than in packed theatre ....they do give the drifting pageant of an Indian Road (Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist)

আদর্শে ও আঙ্গিকে তাই রবীন্দ্রনাথের নাটক খাঁটি দেশীয় পালাগানের সুমার্জিত, স্বতন্ত্র, অভিনব, আশ্চর্য রূপ। কোন কোন নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাজন ও মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগকে পাশ্চাত্যধর্মী মেনে নিলেও পাশ্চাত্যের আধুনিক 'টেকনিক' রবীন্দ্র নাট্যকলায় বিশেষ কোন প্রভাবই বিস্তার করেনি।

সাধারণ নাটকের বন্ধন হল কয়েকটি অঙ্কে ও দৃশ্যে নাটকের বিভাজন, ঘন ঘন দৃশ্যান্তর, যান্ত্রিক চমক, সিন ফেলা, ড্রপ ফেলা ইত্যাদি। কবি বিদ্রোহ করেছেন এইসব বাইরের ম্যাজিকের বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেনঃ

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার এইজন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।....শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে রথ ছোটানো বন্ধ করিতেন। ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চটি আছে। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইয়া থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল। কোন কৃত্রিম মঞ্চ, কৃত্রিম পট কবি- কল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

[দ্রঃ 'রঙ্গমঞ্চ', বিচিত্র প্রবন্ধ]।

দৃশ্যপটের যে আড়ম্বর পাশ্চাত্য নাট্যকলা থেকে আমরা অনুকরণের চেষ্টা করি তার প্রতি কবির বিরক্তি তপতীর ভূমিকায় দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত হয়েছেঃ

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রকাশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। ....অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত। ....আমাদের দেশে যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকে এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

স্পষ্টই এখানেও নির্ভেজাল ভারতীয় মনই ধরা পড়েছে। তবে ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও নাট্যমঞ্চের কোন বর্ণনা নেই, কবির এই মন্তব্য ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, মত্তবারণী, যবনিকা, চতুরঙ্গ মঞ্চ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[২]

---

(২) নাট্যশাস্ত্র ও অভিনব গুপ্তের টীকা ছাড়াও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্যঃ

Ancient Indian Theatre : Dr. D.R. Mankad, pp.I--100 ; Theatre Architecture in Ancient India : Dr. V. Raghavan ; Natya, Nritya-Natya : K.M. Varma.

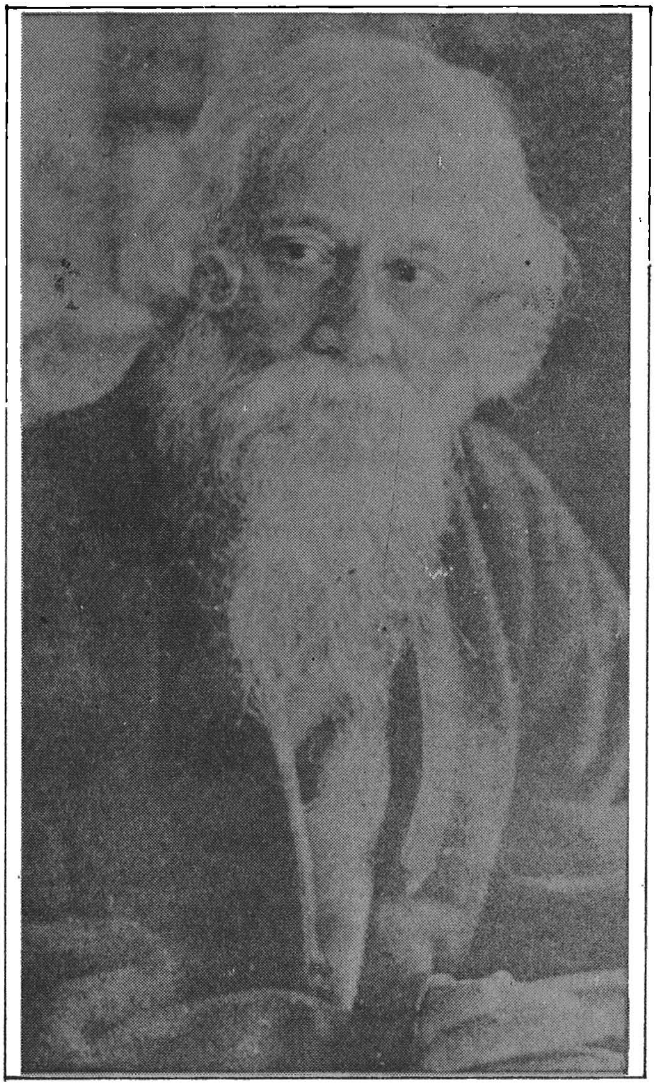
১৮৯০ সালে এল 'রাজা ও রাণী'র রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরম সংঘাতের পদ্ধতিকে শেকস্‌পীরীয় বলা হয়ত অসঙ্গত নয়—বিশেষ করে, 'তপতীতে'। কিন্তু জীবন-বোধ ও দর্শন-চেতনা দুইই ভারতীয় এখানে। গদ্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই প্রথম ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ। মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটকে মাত্র দুশ লাইন পদ্য ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন, একত্রিশ বছর আগে গিরিশচন্দ্র যে ছন্দ ব্যবহার করলেন তা মাইকেলের ছন্দ রীতি থেকে ভিন্ন, যার নাম 'গৈরিশ ছন্দ'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বিল্ব-মঙ্গল', 'রাজা ও রাণী'-র তিন বছর আগে লেখা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার 'বিসর্জনে'ও, এক বছর পরে লেখা। মাইকেল, গিরিশ ব্যবহৃত ধারা থেকে তা কিছু ভিন্ন। পয়ার ও ত্রিপদীর সঙ্গে মিলেরও কারুকার্য কিছুটা শেক্‌স্‌পীরীয় আদর্শে রচিত, কিন্তু বলিষ্ঠতার অভাবে প্রভাবশালী নয়।

'রাজা ও রাণী' নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রভাব 'অত্যন্ত স্পষ্ট' বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। (দ্রঃ রবীন্দ্র নাট্যধারা, পৃঃ ৫৩) অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কে বিভাজন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, রেবতী ও লেডি ম্যাক্‌বেথ, চন্দ্রসেন ও ম্যাক্‌বেথ চরিত্রে সাদৃশ্য প্রভৃতি গৌণ ও আকস্মিক মিলগুলিই এই অনুমানের ভিত্তি। এছাড়া ইলা ও কুমার সেনের প্রণয় ও রোমিও জুলিয়েটের প্রণয় পরিণতির মূলে একই নিয়তির চক্রান্ত, বিক্রমদেব ও ওথেলোর অন্ধ হৃদয়াবেগের সহধর্মিতা, চিত্রাঙ্গদার ক্ষণস্থায়ী রূপলাভ ও 'এ মিড্‌—সামার নাইট্‌স্ ড্রিম্'-এর হেলেনা, হারমিয়া এবং লাইজাণ্ডার—দিমিত্রিউসের স্বপ্ন-বিভ্রমের ভাব-সাদৃশ্যও স্মরণীয়। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা গীতি-নাট্য বা নাট্যকাব্যের কোন কোনটি সার্থক ট্র্যাজেডি না হওয়ার মূলে শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডির অতি নাটকীয়তার প্রভাব সম্পর্কেও কোন কোন সমালোচক ইঙ্গিত করেছেন। [কৌতুক নাটকগুলি য়ূরোপের 'সারাদ' Charade-হেঁয়ালী নাট্য) অনুকরণে লেখা কবি কর্তৃক স্বীকৃত।

কিন্তু মাত্র তেরো বছরের বালক 'ম্যাক্‌বেথ' অনুবাদের অপরিণত মনন মুহূর্তে এমনভাবে প্রভাবিত হবেন যে পরবর্তী জীবনের সকল নাট্যকর্মে সেই প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারবেন না এমন কথাও ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান সুর প্রেম, আদর্শবাদী কবিদৃষ্টি, গীতিময়তা, অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনা ও রোমান্টিক ভাবস্বপ্ন। শেক্‌স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির মূল ভাব জীবন - বিরক্তি ও তিক্ত অসন্তোষ, যদিও গভীর অন্তর্দর্শন ও মানবিকতার মহৎ সুরটি অনুচ্চারিত নয়।

শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সর্ববিদিত। যেমন ভলতেয়ারের সমালোচনা 'হ্যামলেট' ও 'ওথেলো' নাটকদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডগুলির সম্বন্ধে। জীবন-দৃষ্টির সংঘাত ও সত্যানুসন্ধানের নানা বিবাদরত মত ও পথকে কি করে মঙ্গলকর সমাধানের পথে প্রতিভাত করা যায় তার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সম্পূর্ণ ভারতীয় জীবনধর্মকে অবলম্বন করেই। তাই সুমিত্রা ও জয়সিংহের আত্মত্যাগ হৃদয় ও বুদ্ধির সমন্বয়সাধনের পথেই; উন্মত্ততা, হিংসা, দ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের উত্তাল, অন্ধ আবেগের কুটিল অন্ধকারের আবর্তে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতে Catharsis আছে কিন্তু Pity ও Terror নেই।

প্রিয়জনের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা ও তার মনকে জয় করার সমাধান এই ত্যাগ ও আত্মস্বার্থ বিসর্জনের পথেই হয়েছে ["রাজা ও রাণী"(কুমার সেন), "প্রকৃতির পরিশোধ"(অনাথ বালিকা), "বিসর্জন"(জয়সিংহ)]। সংস্কৃত নাটকেও মৃত্যুর পথে সংঘর্ষের সমাধান অনুপস্থিত। এমন কি ইবসেনের 'ডলস্ হাউসে' ও বিচ্ছেদের পথেই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের পরিণতি। 'মালিনী'তে সুপ্রিয়র মৃত্যু বন্দী ক্ষেমঙ্করের আঘাতে হওয়ায় আমরা চমকে উঠি। কিন্তু মালিনীর ক্ষমার জন্য আবেদন আমাদের আশ্বস্ত করে। সেখানেও ভারতীয় মন কাজ করেছে। 'মালিনী' যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যাদর্শের বিরোধী সেকথা কবি নিজেই ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। রচনারীতিতে গ্রীক নাটকের সঙ্গে মিলটিও স্বেচ্ছাকৃত নয়।



সমালোচকেরা যাই বলুন, হ্যামলেটের মৃত পিতার প্রতিহিংসাত্মক প্রেতাত্মা দর্শন বা ম্যাক্‌বেথের ব্যাঙ্কোর অনুমিত উপস্থিতিজনিত অব্যবস্থিতচিত্ততার মূলে কোন গভীর সত্যদর্শন নেই, আছে সমসাময়িক কালের অন্ধ বিশ্বাস। অপরপক্ষে জননী ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের কারণ সত্ত্বেও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র ট্র্যাজিক নায়ক কর্ণের মুখে শোনা যায় শুধু চাপা কান্নার সুর, কখনো কোথাও অভিমানের প্রচণ্ড বিহ্বলতায় না-পাওয়ার বেদনা ত্যাগের সান্ত্বনায় রূপান্তরিত হয়েছে। হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অতিনাটকীয়, গ্যালারী-সন্তোষ তৎকালীন নাট্যপরম্পরায় ধারাবাহিকতা রক্ষায় নয়। তাই রাজার চৈতন্যোদয়ের জন্য সুমিত্রার আত্মবিসর্জনের প্রয়োজনে, রঘুপতির মতান্তরের জন্য জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের, জননীর অনুতাপ উদ্রেকের জন্য কর্ণের অভিমানের, সমাজপতিদের সংকীর্ণতা, প্রাণহীন, নির্দয়, অযৌক্তিক নিয়মাচারের বিরুদ্ধে পঞ্চকের বিদ্রোহ, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দুঃসাহসিক সত্য ভাষণ, দাদাঠাকুর, ঠাকুর্দার নতুন যুগের প্রতীকিতা, বয়স্ক শাসনের মনভাঙা বাধা-নিষেধের প্রতিবাদে অমলের আপাতশান্ত মৃত্যু, এই সবই খাঁটি ভারতীয় দৃষ্টির সমাধানের সূত্র। হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথের সমস্যাও হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় অন্য সমাধান খুঁজে পেত, এই বিশ্বাস লালন করার একাধিক কারণ আছে। ১৯২০ থেকে পাশ্চাত্যে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষের হৃদয়কে যন্ত্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র কবিকে ব্যথিত করে তুলল।

তাই দেখি 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-র চরিত্রগুলি হৃদয়বত্তার প্রতীক হয়ে যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। যন্ত্রবৎ জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় শেক্‌স্‌পীয়র 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা'-র কল্যাণকর পথে খুঁজে পেতেন না। ইয়াগোর প্রতি ওথেলোর উক্তি, 'O, blood, blood,blood'-এমনকি 'টুয়েলভ্‌থ্‌ নাইটে' ম্যালভেলিওর, 'I'll be revenged on the whole pack of you' রবীন্দ্রমানসে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা হয়েই দেখা দিয়েছিল। ব্যক্তিজীবনের বিষণ্নতা, ক্লান্তি ও হতাশাই ইউরোপীয় ট্র্যাজেডির ভিত্তি, রবীন্দ্রমানসের যা পরিপন্থী। আদর্শ, প্রেম, যৌবন, আলোর যেখানে পরাজয় রবীন্দ্র-নাটকে সেখানেই ট্র্যাজেডি। সে ট্র্যাজেডিও ঘনীভূত কিছু নয়।

একথাও স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ, গ্যোতে, শেলী, মেটারলিঙ্ক ও ইবসেন দ্বারা যতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র দ্বারা ততটা নয়। অপর পক্ষে যেমন গিরিশ-অমৃতলাল প্রভৃতি শেক্‌স্‌পীয়র, মার্লো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্যোতের 'আরো আলোর' দীপ্ত চেতনা, মেটারলিঙ্কের মরমিয়াতত্ত্ব[৩] ও ইবসেনের নরনারীর অন্তর্বেদনাজাত আবেগাকুল সংঘর্ষের মধ্যে কোথাও যেন একটি ভারতীয় বেদনা-চৈতন্য ফল্গু ধারায় প্রবাহিত, যার শান্ত কল্লোল রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করতে অসমর্থ হয়নি। ফাউস্তের দ্বিতীয় পর্বে আত্মশুদ্ধি ও চিত্তজয়ের মহিমা স্মর্তব্য। কিন্তু গ্যোতে, মেটারলিঙ্ক, ইবসেনের প্রেরণা সত্ত্বেও 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটক ভারতীয় প্রাচীন নাট্যনীতিকে লঙ্ঘন করেনি শুধু অঙ্ক-বিভাজন, স্থান-কালের নিয়ম ভঙ্গের ভিন্নতায়ই নয়, বিষয়বস্তু ও জীবনের মূল্যবোধেও। সর্বোপরি কাব্যের অপরূপ লাবণ্যে কবির ট্র্যাজিডিগুলি অলৌকিক গৌরবের অধিকারী। তাই তিনি 'The Poet of the stage.'

এই প্রসঙ্গে "প্রোলোগ ফর দ্য থিয়েটারে' ম্যানেজার-কবি—কমিক একটরদের সংলাপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নটরাজ কবি—রাজার সংলাপের কথা মনে পড়া অপ্রাসঙ্গিক নয়। কবি কাব্য লিখেই পালিয়েছে, তবু নটরাজের ভাষায় 'ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালায় নি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ ছড়িয়ে আছে।' গ্যোতের কবি অসহিষ্ণু; প্রতিবাদে, বিক্ষোভে মত্তপ্রায়,

'ফিরায়ে দাও গো মোরে সে নিবিড় ভাবের আবেশ
সে সৌভাগ্য, ব্যর্থ — সমাকুল,
সেই শক্তি ঘৃণা করিবার,
সেই প্রাণ ভালবাসিবার
ওগো! আমারে ফিরায়ে দাও আমারি যৌবন'

[শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী কর্তৃক মূল জার্মান থেকে অনূদিত]

রবীন্দ্রনাথের কবি আরো বলছে, "যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার, তা ছাই হয়; যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নব যুগের!" স্বর্গদৃষ্টির সঙ্গে এই যে যুগ-যন্ত্রণার সমন্বয়, এ একমাত্র কোন ভারতীয় স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।

পাশ্চাত্য নাটকের প্রচণ্ড প্রকাশভঙ্গিকেও রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করেছেন, অন্তরের রূপের চেয়ে নাটকের বহিরঙ্গের দিকেই পশ্চিমী নাটকের ঝোঁক।

'যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মত বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তার সাহস হয় না....। '[দ্রষ্টব্য — "পথের সঞ্চয়"]

(৩) মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড' ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'য় একই অনন্ত সন্ধিৎসা, হারিয়ে যাওয়া মনের মানুষের জন্য সেই ব্যর্থ আকুলতা। গ্যোতের 'ফাউস্ত'-এর রেনেশাঁস প্রতীকিতা ও শেলীর প্রমিথিউসের (ইস্কাইলাসের নয়) রোমান্টিক মুক্তিকামী বিপ্লব চেতনা কবির সাঙ্কেতিক নাটকেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

তাই "ফাল্গুনী"-তে শুনিঃ 'চিত্রপটের প্রয়োজন নেই, আমাদের দরকার চিত্তপট'। আবার 'কালের যাত্রা'য় ভারতীয় জীবনের আর এক ধর্ম প্রতীকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বের জয়গান কবির জবানীতে বলিষ্ঠ ঘোষণায় উচ্চারিতঃ

'ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি, ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে দিলেন কাত ক'রে। সমান ক'রে নিলেন তাঁর আসনটা।'

আর একটা কথা মনে হয়। 'নষ্টনীড়'-এর (শেষ দিকে লেখা, 'চতুরঙ্গ', 'রবিবার'ও বটে) মত গল্প সে যুগে লিখলেও রবীন্দ্রনাথ ইউজিন ও'নীলের—'ডিজায়ার আন্ডার দ্য এলমস্' যা শ'-এর মিসেস ওয়ারেন্স প্রোফেশন'-এর মত নাটক কখনই লিখতে চাইতেন না। কারণ বাস্তবতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য নাটকীয়তার চেয়েও কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা ও আধ্যাত্মিক হৃদয়বত্তা এসবের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রবণতাকেই বেশি প্রশ্রয় দিয়েছে। তাই 'চিরকুমার সভা' ইংরেজি ধারায় Comedy of Manners ও 'শেষরক্ষা' ও 'শোধবোধ' Comedy of Errors হতে পারেনি, হয়েছে খাঁটি বাঙালী নাটক। নির্মল কৌতুক ও মার্জিত পরিহাসটুকু নির্ভেজাল রাবীন্দ্রিক, রেস্টোরেশন কমেডিপন্থী বা শেভিয়ান নয়। রেশিড্যানের 'দ্য রাইভালস্' নাটকের স্যার এন্টনি এ্যাবসোল্যুট-এর সঙ্গে শিবচরণের ও ফক্‌ল্যান্ড—জুলিয়ার খণ্ড ঘটনার সঙ্গে বিনোদ-কমল ঘটনাচক্র ('শেষরক্ষা')-টির সামান্য মিলটিকে প্রভাবজাত বলা অযৌক্তিক।

একথাও অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ মূলত আমি-ময়—গ্যোতের মত আত্মকেন্দ্রিক ভাবধর্মী শিক্ষাগুরু, subjective ও didacatic. অপরপক্ষে শেকস্‌পীয়র objective, নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক। শেকস্‌পীয়রের নাটকে (প্রায় আটশত) বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের ভিড়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে দুটি কি তিনটি টাইপের বারবার আনাগোনা। গিরিশচন্দ্র তাঁর গুরুর কথানুসারে 'যত মত তত পথ' দেখাবার উদ্দেশ্যেই মানবমেলার হাট বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নাটকের খাতিরে নয়, আদর্শের মুখপাত্ররূপেই চরিত্র করেছেন। কবি অবশ্য এলিজাবেথীয় ধারায় রচিত গিরিশ ও গিরিশযুগের নাট্যরীতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অভাব অনুভব করেছিলেন, তাকে দূর করার জন্যই তাঁর গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য, সামাজিক ও সাঙ্কেতিক নাটকে একটা ভিন্ন ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়নি; আজও 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকি প্রতিভা' শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র জন-মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়; যেমন হয় বহুরূপী প্রযোজিত 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' বা অন্যান্য প্রগতিশীল গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত নাট্যরূপান্তরিত 'চতুরঙ্গ', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' এবং 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ', 'শেষরক্ষা' নাটকগুলির অভিনয়। একটা কথা এখানে মেনে নেওয়া যায়ঃ ১৯৩৫ নাগাদ অমিয় চক্রবর্তী লণ্ডনের ওল্ডভিক থিয়েটারে গ্রীক নাটক দেখে কবিকে কোরাসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তাঁর নাট্যচিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে থাকতে পারেন। ফলে, 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকায়' দেখা যায় সমস্বরের গভীর ব্যঞ্জনা।

কবির গীতিনাট্য ধারার প্রথম পর্বে গানের ভূমিকা গৌণ, নাট্য সংঘাতই মুখ্য। আবার দ্বিতীয় পর্বে গানই প্রধান, নাট্যবস্তু দুর্বল। পদ্যে সুরারোপ তৃতীয় পর্যায়ের গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য। শেষ পর্বে নৃত্য ও গানের সুষ্ঠু সমন্বয় দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে অতৃপ্ত প্রেম, দেহজ আকর্ষণ, পাপ চেতনা ও বিবেক দংশন, আত্মাহুতি ও কর্তব্যবোধ নৃত্য ও গানের মাধ্যমে নাট্যগুণের আভিজাত্য লাভ করেছে। তাঁর নাট্যকাব্যে, নৃত্যনাট্যে ও ঋতুনাট্যে পাশ্চাত্য অপেরার নাট্যরীতি-বিরোধিতা স্পষ্ট,—যদিও রূপক নাট্যে Ensemble-এর ব্যঞ্জনা স্বীকার্য। কবির কাব্যনাট্যে ব্রাউনিঙ-এর কাব্যনাট্যের প্রভাব আছে,

একথা বিশ্বাস করেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতটি গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিচারসাপেক্ষ।

অনেকে হয়ত বলবেন বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যের মত সার্থক ট্র্যাজেডি নেই, রবীন্দ্রনাথের মত সুগভীর অন্তর্যামী রস-চৈতন্য ও বহুবিধ অন্তর্জ্বালা অভিজ্ঞ প্রতিভার পক্ষেই যা রচনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমরা ভুলে না যাই ভারতীয় মন দুঃসহ উপভোগ করার আধার নয়। ইহলৌকিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে জীবনকে ভোগ করার লালসা, জায়া, জননী ও প্রেমিকাকে রস উপভোগ করা যায় না। ভাগ্য ও পরলোক চেতনা, কর্মফল-বোধ, বৈরাগ্য ও সংযম, ত্যাগ ও তিতিক্ষাকেই ভারতীয় মন অগ্রাধিকার দেয়। তাই বোধ হয় ভারতীয় নাট্যকার ও দর্শক উভয়েই ট্র্যাজেডির অন্তহীন, ক্ষমাহীন যন্ত্রণাকে কোনদিন নাটকের বিষয়বস্তুরূপে ভাবতে চায় নি। তবে ট্র্যাজিক মুহূর্তে যে জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করে, অনুভূতিকে পরিশোধন করে, চৈতন্যকে কল্যাণময় করে ও চরিত্রকে শক্তিশালী করে একথা ভারতীয়রা অস্বীকার করে না। ভারতীয় মন হত্যাকাণ্ডকে পাপই বলে মনে করে। রঘুপতি যতই বলুক ঃ

'কে কহিল হত্যাকাণ্ড পাপ ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জান নাকি
প্রত্যেক পলকপাতে—লক্ষ কোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে।...
... রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্ব পত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে
... হত্যা খেলার ছলে
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে !
চলেছে, নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপথে—ব্যাঘ্রের আক্রমণে
মৃগসম মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারি।'[৪]

জয়সিংহ কিন্তু পাশ্চাত্যের এই জড়বাদী ব্যাখ্যায় আশ্বাসিত নয়। সে ট্র্যাজিক ('হ্যামার্শিয়া' রহিত) ও রোমান্টিক চরিত্র বটে—সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারাক্রান্ত ঃ রঘুপতির ভাষায় অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী, স্বেচ্ছাচারী... কুলিশ-কঠিন হলেও, জয়সিংহ একটি সুন্দর, উদার, মহৎ, শাশ্বত মানবিক আইডিয়ার বাহন, একটি সার্বভৌম মানব-প্রেমিকের প্রতীক, চিরন্তন সত্য উপলব্ধির রহস্যময়তার ইঙ্গিত। সেই রহস্যময় সত্যাদর্শ যে ভারতীয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। রঘুপতির চরিত্র কল্পনায় অবশ্য পশ্চিমী প্রেরণা দুর্লক্ষ্য নয়, রাজশক্তির পরিচালনায় পুরোহিতশক্তির প্রভাব-বিষয়ক দ্বন্দ্বটুকুও।

হ্যামলেটের জীবন বিরক্তি ও একোক্তির বলিষ্ঠতা ও জয়সিংহের অভিমানরঞ্জিত লিরিকের প্লাবন কিন্তু স্পষ্টতই ভিন্ন গোত্রীয়। 'বিসর্জন' নাটকে উপসর্গ পত্রে কবি বলেছেন ঃ

'কেহ কহে ড্রামাটিক
বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।'

এই লিরিকধর্মিতা বাঙালী মনের রসচৈতন্যের দ্যোতক ও বৈষ্ণব কবিতা অনুপ্রেরিত।

আলোচনাপ্রসঙ্গে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্রনাথের মত ও তাঁর নাট্যরীতি সম্পর্কে যেসব তুলনামূলক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে এ ধারণা করা অন্যায় হবে যে নাট্যকার হিসাবে কালজয়ী এ্যাভনের কবিকে জগৎজয়ী গাঙ্গেয় কবির তুলনায় খাটো করা হয়েছে। বলতে চাই ট্র্যাজিক রসদৃষ্টি বা ট্র্যাজিক নাট্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়রের চেয়ে আরও শুভার্থী শিল্পী। জীবন-নাট্য অনুকরণের শৈল্পিক কৃতিত্বে নয়। সুনীলচন্দ্র সরকার যথার্থই বলেছেন ঃ

'সেকস্‌পীয়রের কৃতিত্বের তুলনা নেই এবং তাঁর সমাধান একটা চিরস্থায়ী নির্দেশ। কিন্তু ট্র্যাজেডিগুলি দেখাচ্ছে যে তাঁর আবিষ্কৃত জগতে জীবনের থেকে থাকা সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিকতার সৌন্দর্য বোধ করেও ঐ হ্যামলেট, ম্যাগবেথ, ওথেলো, লীয়রের সমস্যার সত্যি কোন সমাধান পেতেই হবে।'

[আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথ (১ম), সঃ পুলিনবিহারী সেন, পৃঃ ১৮৫]

এই সমাধানের সূত্র পাওয়া যাবে দান্তে ও রবীন্দ্রনাথের অতিজাগতিক ব্যঞ্জনায়, হৃদয় জয়ের সূক্ষ্ম ত্যাগ উদ্বুদ্ধ পন্থায়, স্বর্গ-নরকের অভিজ্ঞানে। উভয় শিল্পীই অবশ্য অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ; মানবতায়, বিশ্বজনীন মঙ্গলকর বিশ্বাসে বহ্নিমান ; মঙ্গলের, সৎ ও সত্যের জয় এবং অশুভ, অসৎ ও অন্যায়ের পরাজয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; সুপ্রিয়, ডেসডিমোনা, কর্ডেলিয়ার হত্যা ও লীয়রের অতলান্ত দুঃখজ্বালা বা অমলের মৃত্যুর আপাতঔচিত্যহীনতা সত্ত্বেও। তবে বলা যায়, শেকস্‌পীয়র সমগ্র জীবনকেই তাঁর নাটকে মুকুরিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ খণ্ড জীবনকে। সাহিত্য যদি জীবনমুখী না হয়, সর্বদিক সন্ধানী না হয়, তাহলে তা মহৎ সাহিত্য হবে কিনা, এ প্রশ্নও উঠতে পারে।

তাই অভিযোগ উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকে ট্র্যাজিক নায়কের মর্মভেদী রক্তাক্ত ইতিহাস নেই ; নেই উত্তাল জীবনসাগরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অভিমান, নেই প্রচণ্ড জীবন-যন্ত্রণা, নেই স্থূল, ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাপন, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যাভিচার, হত্যা, অপমান, হিংসা, ষড়যন্ত্রের রূঢ় বাস্তবিকতা। যেটুকু আছে, জীবনের নিদারুণ নিষ্ঠুর দিকটি, তাকে কোমলায়িত, সহনীয় করে দেখানো হয়েছে। এমনকি শেকস্‌পীয়র প্রভাবিত 'সাজাহান', 'সিরাজদৌল্লা', 'কৃষ্ণকুমারী' "অশ্রুমতী" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেডির যে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশ, ভাগ্যবিপর্যয়, বিরুদ্ধ ঘটনার সংঘাতের যে প্রচণ্ডতা, তা রবীন্দ্র-নাটকে নেই। কিন্তু কবি জীবনের শান্ত, মধুর, সংযমিত, মঙ্গলায়িত অন্তরাশ্রয়ী ত্যাগ-সুন্দর দিকটিই বেছে নেন, তাহলে নাট্যধর্মের কোন্ নীতি থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন ? মহৎ নাট্যসৃষ্টির পথে কি আলোর সাধনা অন্তরায় হবে ? সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি দুরন্ত বিশ্বাসের প্রজ্জ্বলন কি জীবন-শিল্পীর পক্ষে স্বধর্ম বিচ্যুতি ? জীবন কি শুধুই অন্ধকার আর যন্ত্রণা, অভিশাপ, কলুষতা, ষড়যন্ত্র, অসত্য, অন্যায়, অবিচারের অনির্বাণ প্রদাহ ? কবি যদি dark tragedy নাই লেখেন, তিনি তো 'একজিস্‌টেনসিয়ালিস্ট', 'এ্যাবসার্ড' বা 'থিয়েটার অব ক্রুয়েলিটি'ধর্মী নাটকও লেখেন নি। তাবলে তিনি কি বিয়োগান্ত চেতনা, নিয়তিবোধ বা অন্ধকার-অভিজ্ঞতাও জীবন-যন্ত্রণা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন ? বলা হয় 'Christianity is an anti-tragic vision of the World.'

তাই কি কোন খ্রীস্টান নায়কের মৃত্যু 'an occasion of sorrow not for tragedy.' শুধুই বিষাদরস সৃষ্টিকারী ? ট্র্যাজিক রস নয় ? 'স্যামসন এগোনিসটিস্'-এ মিলটনের ভর্ৎসনা মনে পড়ে ঃ Come, come, no time for lamentation now.' আসলে দগ্ধ আত্মা যখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে ঈশ্বরের ক্ষমাদানেরও আর সময় নেই, তখনই সত্যিকারের অবিমিশ্র নিদারুণ ট্র্যাজিডির শুরু। ফস্‌টাসও বলেছিল. 'And now it's too late'। রবীন্দ্রমানসিকতার আধ্যাত্মিক প্রবণতায় কি এই খ্রীস্টীয় দৃষ্টি কাজ করে নি ? এই প্রশ্নই সবিনয়ে মনে জাগে।

৪. এডউইন আর্নল্ড রচিত 'The Light of Asia' কবিতায় স্বগোতক্তি 'Life is living upon death'...... ইত্যাদি রঘুপতির উক্তিতে প্রতিধ্বনিত মনে হওয়ার কারণ একাধিক।

নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীয়রের নাটকে জীবনের ক্যানভাস আরো অনেক বেশি ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বহুবর্ণ। বিচিত্র সহস্র ধারায় প্রবাহিত সহস্র 'টাইপ' ও 'ইন্ডিভিজ্যুয়াল' চরিত্রের আবেগের শাখায়-প্রশাখায় তরঙ্গোদ্বেল সংঘর্ষের বর্ণাঢ্য বিদ্যুৎজ্বালা। জীবনের কদর্যতম অন্ধকার ও সুন্দরতম আলোর সমন্বয়; মহাকালের নিরবধি শোভাযাত্রা ও বিরক্তি, ব্যর্থতা, আনন্দ, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ, ক্ষোভ, সত্য, মিথ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বর্গ-মর্ত্যের এমন দর্শন—গভীর, কাব্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ পৃথিবীর আর কোন নাট্যকর্মে আছে বলে মনে হয় না। গ্যোতে, শিলার ও রাসিনকে যাঁরা সমপর্যায়ের গৌরব দান করেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একথা বলছি।

তবে জীবনের রুক্ষ-কলুষ প্রতিফলন থাকলেও শেকস্‌পীয়রকে কেউ আধুনিক অর্থে Selective realsim বা Naturalism-এর প্রতিভূ বলে না। সেই অর্থে বরং যুগসমস্যার চেতনা-বিকৃতি, দুর্নীতির রূঢ় বাস্তবতার ছায়া রবীন্দ্র-নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। গোপাল হালদার বলেছেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় তিনি কালান্তরের কবি—জটিল যুগচেতনা, কবিচেতনায় সাংকেতায়িত।'

['রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা', রবীন্দ্রায়ণ (২য়), সঃ পুলিনবিহারী সেন, পৃঃ ২৭]

রাজা ও প্রজার স্বার্থ-সংঘাত ('প্রায়শ্চিত্ত'), যন্ত্র ও মানব-হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব ('মুক্তধারা'), ধনতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থ ও ভালবাসার শক্তি পরীক্ষা ('রক্তকরবী'), বয়স্ক শাসন ও শিশুমনের মুক্তিদ্বন্দ্ব ('ডাকঘর') ইত্যাদি আরো কত আধুনিক বিষয়বস্তুকে কবি নিজস্ব নাট্যরীতির মাধ্যমে শিল্পরূপ দিয়েছেন। কিন্তু গোর্কী, স্ট্রীন্ডবের্গ, গলস্‌ওয়ারদি ন্যাচারালিজম্‌ ও রবীন্দ্রনাথের বাস্তব চেতনায় প্রভেদ আছে। সাংকেতিক ও রূপকধর্মী আঙ্গিক, সঙ্গীত, নৃত্য, লিরিকললিত-সংলাপ, স্থিতিশীল নাট্যক্রিয়া, প্রকৃতি মোহ, ব্যক্তি আত্মার মুক্তি আনন্দময় বিশ্ব-আত্মার সম্মেলন—এসব একালের শ্রেণী-দ্বন্দ্বভিত্তিক, বস্তুবাদী দ্বন্দ্বাভাস অনুপ্রেরিত গণনাট্যের রীতিনীতির বিরোধী কি? পীড়িত মানুষের মুক্তির উপায় রহস্যবেদী মরমিয়ার দৃষ্টি দিয়ে কবি বিচার করেছেন—যেমন ম্যালার্মে, য়েটস্‌ ও মেটারলিঙ্ক করেছেন।

[মেটারলিঙ্কের নাটিকা, 'দ্য ব্লাইন্ড', 'দ্য ইন্টিরিয়ার' ও 'দ্য ট্র্যাজিকাল ইন ডেইলি লাইফ', ও 'দ্য ট্রেজন অব দ্য আব্‌বল' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য]

অতীন্দ্রিয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানের ব্যাকুলতা উপনিষদ্‌-আলোকিত মনকে বহির্মুখী ঘটনার ঘনঘটা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই বহির্মুখী ঘটনার শ'-এর নাটকেও নেই। তিনি নিজে বলেছেন ঃ "We now have plays including some of my own which begin with discussion and end with action."

শ'-এর নাটকে এই action বা conflict মানসিক আবেগসঞ্জাত। সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের নাটকে action বা conflict পর্যাপ্ত।

তবে ক্যান্ডিডার domestic dilemma-র থেকে আন্তিগোনের tragic dilemma-র সঙ্গেই তার নিকটতর সম্বন্ধ। তাই শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে 'বাধরী'ই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সংঘাতভিত্তিক শ্রেষ্ঠ নাটক। যেখানেই সংহত স্থিতিশীল পরিবেশকে ছিন্ন করে কবি বাহ্যিক নাট্যক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সেখানেই রসভঙ্গের পীড়া। উদাহরণ হিসাবে 'শ্যামা'য় উত্তীয়ের সশস্ত্র ঘাতকনৃত্য ও তার হত্যা, ক্ষেমঙ্করের আঘাতে সুপ্রিয়র মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা যায়। এমনকি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'য় য়ুরোপীয় চিন্তার প্রভাব থাকলেও চিত্রাঙ্গদার অর্জুন-দর্শনের দীর্ঘ পল্লবিত উচ্ছ্বাস, নবরূপ প্রাপ্তির উদ্দীপনা, গীত ও নৃত্য নাট্যক্রিয়াকে ব্যাহত করে সৌন্দর্য রসকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে discussion বা dialogue-এর প্রভাব অনেকটা নিষ্প্রভ হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে 'drama is conflict' কিনা বা 'mental conflict'-ই নাটক কিনা। এ প্রসঙ্গে শ'-এর নাটক সম্পর্কে জোড্‌-এর মন্তব্য অযথা দীর্ঘ উদ্ধৃতি মনে হলেও উল্লেখযোগ্য ঃ

'There is the charge that the plays lack action and are, in effect, no more than dramatic dialogues .... For my part, provided that the flow of ideas is well enough maintained, the bouts of intellectual swordsmanship between the characters sufficiently dazzling, the wit sufficiently amusing, I dispense with the murders.

Which do duty for action in most melodramas and the whisperings and gigglings in corridors followed by the slamming of bed room doors which typify the action of average force, which if not vulgar, much contemporary dramatic action is pointless.

[দ্রঃ C.E.M.Joad : shaw]

Mental conflict, the clash of competing ideas and of opposing standards of human values can provide highly acceptable absorbing, and entertaining dramatic material."

[দ্রঃ A.C.Ward : Bernard Shaw]

এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য ঃ 'চলমান জীবনপ্রবাহ বা ঘটমান জটিল পরিস্থিতিকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) নাটকের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকার করেন নি।'

['রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য বিচারের ভূমিকা', সূত্রধার ; বৈশাখ ১৩৬৮]

প্রাচীন গ্রীস ও এলিজাবেথীয় ইংল্যন্ডের নাটকেও এই আইডিয়ার সংঘাত নাট্যরসের প্রধান উপজীব্য ছিল। তবে শ'ও কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন অর্থে, রবীন্দ্রনাথও, বিয়োগান্ত কাব্যনাট্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রীসীয় বা এলিজাবেথীয় হিংসাত্মক চরম মুহূর্তের আশ্রয় নেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, দর্শক ও শ্রোতা মঞ্চাভিনয়ের মুহূর্তে শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ ও শ'-এর নাটককে কিভাবে গ্রহণ করবে, যে গ্রহণ বা প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে এঁদের নাটকের মঞ্চসাফল্য। এ সম্পর্কে টি.এস এলিয়ট-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

'For the simplest auditors there is the plot, for the more thoughtful the character and conflict of characters for the more literary the words and phrasing, for the more musically sensitive the rhythm and for auditors of greater sensitiveness and understanding a meaning which reveals itself gradually....'

তাহলে সাধারণ মঞ্চের দর্শক ও শ্রোতারূপে নাট্য সমালোচকদের শ্রেণীমানসেরই উপর নির্ভর করবে কোন নাটকের নাট্যগুণ। নাট্য প্রযোজনার কৃতিত্বও অনেকাংশে দায়ী হবে। তাই প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-নাটককে পূর্ণাঙ্গ শিল্প বলে স্বীকার করেন নি। কারণ ঃ

'সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের বাহিরে কখনো পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বেই তাহার ত্রুটি।'

[রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫]

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা বলা ভুল হবে না যে, তাঁর ছবির মত, উপন্যাসের মত, তাঁর নাটকও সহজিয়া কাব্যের রসমাধুর্যে রহস্যবেদী—উদ্বেলিত অনুভূতির মনোময় সংঘাতে নাটকীয়, শুধু সাম্প্রতিক জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতায় ইন্দ্রিয়বেদী বা sensuous নয়। তাঁর সৃজনী প্রতিভার বহুমুখী প্রদীপের শিখাগুলি হৃদয়াবেগেরই রূপসী চন্দ্রিমায় সমর্পিত। আর সেই কারণেই তাঁর নিজের ভাষায়, এর

নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ['রাজা ও রাণী' সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে 'সূচনা' দ্রষ্টব্য']। অবশ্য এ জলাভূমিতে ইন্টেলেক্টের সূর্যরশ্মির চমক কোন সময়েই অনুপস্থিত নয়। অমলেন্দু বসুর ভাষায় ঃ

'চিন্তায়িত আবেগ, আবেগায়িত চিন্তা, ইন্টেলেক্ট ও ইমোশন এসব ছত্রে অভিনসীম, সৃজনীচিত্তের সে অভিজ্ঞান যা সুমহান ব্যক্তিত্বেই সম্ভব। আবেগ ও চিন্তার সম্মেলন অন্য কবিতেও দুর্লভ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যেমন চিন্তার উত্তুঙ্গতা ও নিষ্ঠা, আবেগের বিশুদ্ধতা, তেমনি এ দুয়ের মিলিত মহত্ব অতুলন।'

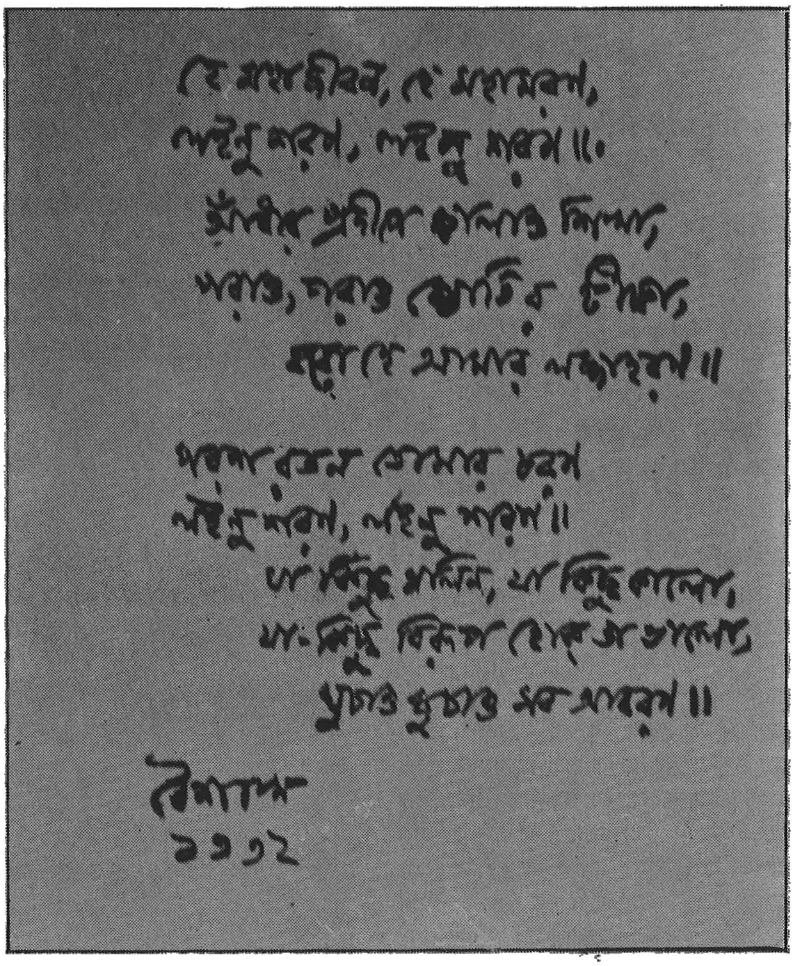
[রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা, রবীন্দ্রায়ন (১ম), স: পুলিনবিহারী সেন, পৃ: ১৭৪]

কিন্তু শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে যা অতুলনীয় মহত্ব, চিরাচরিত নাট্যধারণায় তা অনাটকীয় গুণ। এছাড়া তাঁর নাটকের সব রকম চরিত্রের মুখেই সমসাময়িক কাব্য বা কাব্যময় গদ্যভাষা আরোপ করায় চরিত্রগুলির বাস্তব ধর্ম নষ্ট হয়েছে। তাঁর নাট্য সংলাপে দৃঢ়তার যে অভাব সেজন্য দায়ী এই গীতিপ্রবণতা। শেকস্‌পীরীয় আদর্শে যেখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন, সেখানেও কবি ইংরেজ নাট্যকারের সংলাপের দৃঢ়তা ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। গীতিরসের প্রাবল্যই এর জন্য দায়ী। তাই বোধহয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন ঃ

'রবীন্দ্র-নাটকের কাব্যরস, মানবরস ও বিচিত্র নরনারীর লীলাকে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প নয়।'

[দ্রঃ: রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫]

আসল কথা কবি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে নাট্যশাখায় একদিক দিয়ে একটি ব্যতিক্রমের সূচনা করেছেন। এখানে তিনি রোমান্টিসিজম্ ও ক্লাসিসিজম্-এর মধ্যে compromise করার চেষ্টা করেছেন। একদিকে সনাতন সংযম, নিয়ম ও ঐতিহ্যের দৃঢ়তা, অপরদিকে প্রাণের দুর্বার বেগ। দুয়ের মধ্যে করেছেন সন্ধি। সীমা ও অসীমকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এমনকি ইন্দ্রিয়গত জগৎকে স্বীকার করে নিয়েও অতীন্দ্রিয় রহস্যের সূক্ষ্মতম সংকেত, বিমূর্ত প্রতীকিয়তায় তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতিতে বিধৃত করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রতীকী নাটকে আলাদা ভাবের ব্যঞ্জনা, বহু প্রতিমার ভিড়ে সুদূরের চেতনায় চুনী-পান্নার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ক'টি ভাবাত্মক, রূপক, সাংকেতিক বা প্রতীকধর্মী নাটকেই জীবনবোধে উদ্দীপ্ত আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও গীতিময় পুষ্প—রঙীন নৃত্যময় বহুকণ্ঠে উল্লাস। য়ুরোপীয় আধুনিক সাংকেতিক নাটকে কিন্তু রুক্ষতা, জীর্ণতা, গাম্ভীর্য, স্তব্ধতা, নির্জনতারই প্রধান্য। সেখানে অন্তর্চেতনামূলক ধ্রুব প্রত্যয়ের অভাবের ফলেই 'এ্যাবসার্ড' নাটকের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, বলিষ্ঠ জীবনবোধের অভাবের ফলেই 'থিয়েটার অব ক্রুয়েলটি'র জন্ম। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের নাটক য়ুরোপীয় ধারায় প্রভাবিত বাংলা সাংকেতিক নাট্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অভিনব সংযোজন। তাই 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের' ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ নাই' বা থাকল, তিনি নাট্যরচনার নিজস্ব ধারার একক, বিশিষ্ট এবং তা আধুনিক যুগেরই লক্ষণাক্রান্ত। তিনি আধুনিক যুগেরই প্রতিনিধি নাট্যকার। আলাদা হয়েও শ্রেষ্ঠ, অপরাজেয়, পরমাশ্চর্য প্রতিভা।

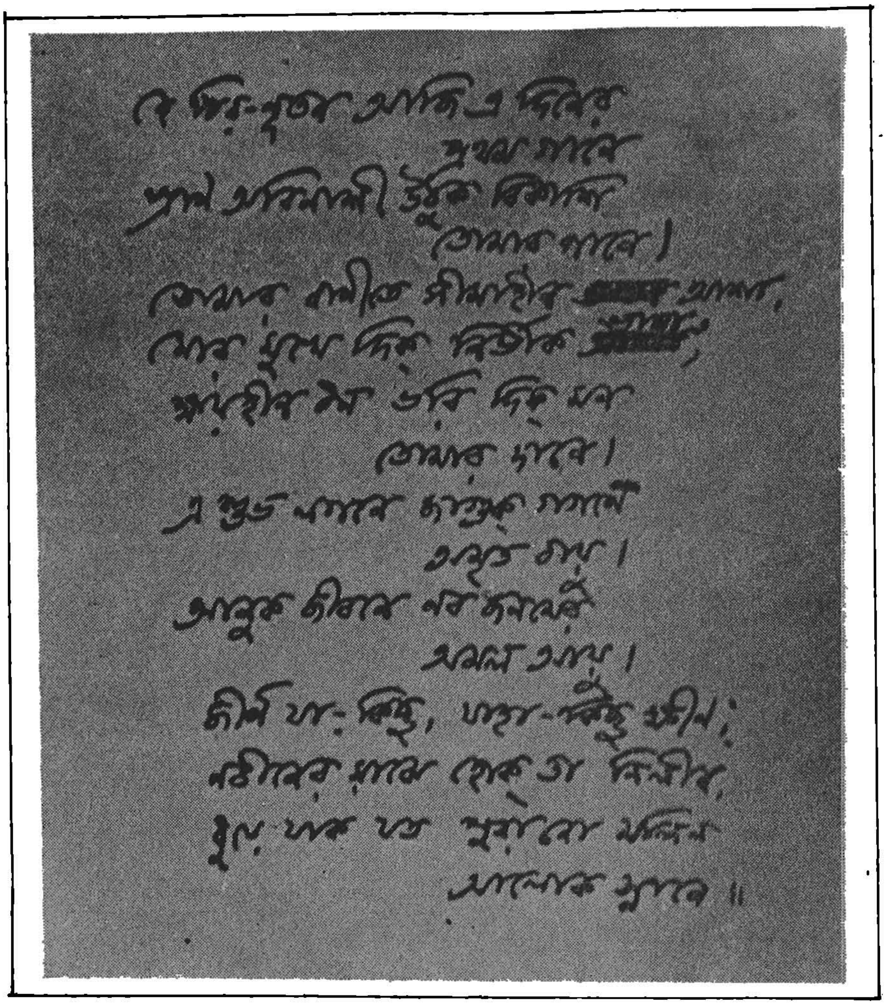




রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করেছিলেন সুনীতিকুমার কখনো উপন্যাস রচনায় হাত দেবেন। ঠিক সৌজন্যমূলক প্রত্যাশা নয়, সুনীতিকুমার কখনো উপন্যাসের প্লট নিয়ে কবির কাছে দরবারও করেন নি। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লিখেছিলেন, 'তোমার কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করবার আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল চাপে তোমার মানসক্ষেত্রের অনেক বীজ হয়তো অঙ্কুরিত হতে বাধা পাবে—তার মধ্যে উপন্যাস রচনা একটা।' রবীন্দ্রনাথের এ চিঠির তারিখ ১৯২৭ সালের ২৫ নভেম্বর। সুনীতিকুমার তখনো বাংলায় প্রতিষ্ঠিত লেখক হওয়া দূরে থাক, বাংলা ভাষায় তাঁর একখানা বইও বেরয় নি। 'প্রবাসী'তে তখন সবে বেরোচ্ছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত। এক বছর আগে বেরিয়েছে ইংরেজিতে দু'খণ্ডে 'দ্য ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ।' সে বইয়ে উপন্যাসের সম্ভাবনা দেখবার কোনো কারণ নিশ্চয়ই নেই। সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা পূরণ করেন নি। কোনো উপন্যাস রচনায় তিনি হাত দেন নি। উপন্যাস দূরে থাক্, গল্প, নাটক বা কবিতাও তিনি কখনো লেখেন নি। কবিতা কিছু লিখেছিলেন সংস্কৃতে। সে অনেক পরের কথা। আর সে কবিতা তাঁর সংস্কৃত ভাষাচর্চারই অঙ্গ, তা ঠিক কাব্যচর্চা নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে উপন্যাস প্রত্যাশা করেছিলেন কেন? সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বিশেষ ব্যক্ত করেন নি।



'বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না' তা নিয়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি।...তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।' তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এলেও 'কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।' অবশেষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই গদ্যছন্দে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের কাছে তাঁর প্রত্যাশা জানাতে গিয়ে একটু লঘুসুরে প্রস্তাবিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ দিতেও ভোলেন নি। লিখেছেন, 'তবু যদি উপন্যাস লেখ তাহলে শুদ্ধির জাদুজালজড়িত কোনো একটা কৃত্রিম বিবাহের ট্র্যাজেডি তার বিষয় হতে পারে।' বাক্যটি 'তবু' দিয়ে শুরু হয়েছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের ধারণা হচ্ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপে সুনীতিকুমার হয়তো কখনো উপন্যাস রচনার কথা ভাববার মতো অবকাশই পাবেন না। বারে বারেই বলছেন, 'আজকাল তোমার হয় তো চলৎশক্তি নেই, তুমি এখন বদ্ধ জীব।' আবার বলছেন, 'কী ভাবে আছ। কী অবস্থায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্রান্তচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছ, না লিখতে আরম্ভ করেছ? অর্থাৎ সরস্বতীর কমলবনের পঙ্ক ঘোলাচ্ছ না পঙ্কজরেণু বিকীর্ণ করছ?' আর 'শুদ্ধির জাদুজালজড়িত কোনো একটি কৃত্রিম বিবাহের ট্র্যাজেডি' প্রসঙ্গ এসেছে অমিয় চক্রবর্তীর বিবাহসূত্রে। অমিয় চক্রবর্তী বিবাহ করেছিলেন এক ড্যানিশ কন্যাকে। বিবাহের পূর্বে বিবাহপদ্ধতি নিয়ে কিছু সমস্যা উঠে থাকবে। এবং সে ব্যাপারে সুনীতিকুমারের সহায়তার কথা মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের। যদিও শেষ পর্যন্ত সে সহায়তার প্রয়োজন ঘটে নি। আর সুনীতিকুমারও উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি। যদিও সংক্ষিপ্ত বৈদিক বিবাহপদ্ধতি নিরূপণের ব্যাপারে সুনীতিকুমার এগিয়ে

এসেছিলেন অনেক বছর পরে ঐ অমিয় চক্রবর্তীরই কন্যা সেমন্তীর বিবাহ উপলক্ষে। তার ফলে একটি ছোটো পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন—A shortened Arya Hindu Vedic Wedding Ritual নামে সে বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬ সালে।

রবীন্দ্রনাথ যে সুনীতিকুমারের কাছে উপন্যাস প্রত্যাশা করেছিলেন তার কারণ অন্য। যে-চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের কাছে উপন্যাস প্রত্যাশার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তার মাসখানেক আগে রবীন্দ্রনাথ ফিরেছেন মালয় সুমাত্রা বালী শ্যাম পরিভ্রমণ করে। এবং সে সফরে সুনীতিকুমার ছিলেন তাঁর সঙ্গী। পরিভ্রমণকালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে লিখছেন, 'সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখবেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে দুদিক থেকেই রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝতে পারছি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।' সুনীতিকুমারের দর্শনশক্তি এবং ধারণাশক্তির সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের মনে উপন্যাস রচনায় সুনীতিকুমার সাফল্য অর্জন করতে পারবেন এমন প্রত্যাশা জেগেছিল। 'যত বড়ো তাঁর আগ্রহ, তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়।' অর্থাৎ বিশদ-কে দেখতে জানতেন সুনীতিকুমার, মানুষ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর এবং উপন্যাস রচনায় এ দুটি গুণই হল প্রাথমিক প্রত্যাশা। সুনীতিকুমার ফিরে এসে যখন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে শুরু করেছেন, তা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বেশ লাগছে, তার প্রধান কারণ, এর ভাষাটা অত্যন্ত তোমার নিজের মতো। অধিকাংশ লোক শিশুকাল থেকেই পরের মতো লেখা লিখতে অভ্যাস ক'রে পরীক্ষায় মার্কা পায়। তাদের পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজের ভাষায় লেখা। তোমার এই লেখায় ধীরেন যাকে বলে 'মজা' সেইটে পাওয়া যাচ্ছে। এ কলের জল নয়, ঝরনার জল।' অর্থাৎ শুধু দেখার দৃষ্টি নয়, সৃষ্টির ভাষাও ছিল সুনীতিকুমারের আয়ত্তে। তথাপি সুনীতিকুমার নিছক পণ্ডিত বলেই পরিচিত রয়ে গেলেন। সুনীতিকুমার কেন যে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা জানা নেই। হয়তো তাঁর পাণ্ডিত্যের আর্কষণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দলে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিছক পণ্ডিতের পরিচয় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে নি। সিঙ্গাপুরের পথ থেকে রবীন্দ্রনাথ রানী মহলানবিশকে লিখলেন, 'চিঠি লিখব বলে বসলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতিদিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই।-----অথচ, এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা ছবি।----এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনীর ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।-----কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। -------শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোম রা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি।-----বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপিসার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী।' সুনীতিকুমারের পত্ররচনাশক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শব্দচিত্র ফুটিয়ে তোলার কথা

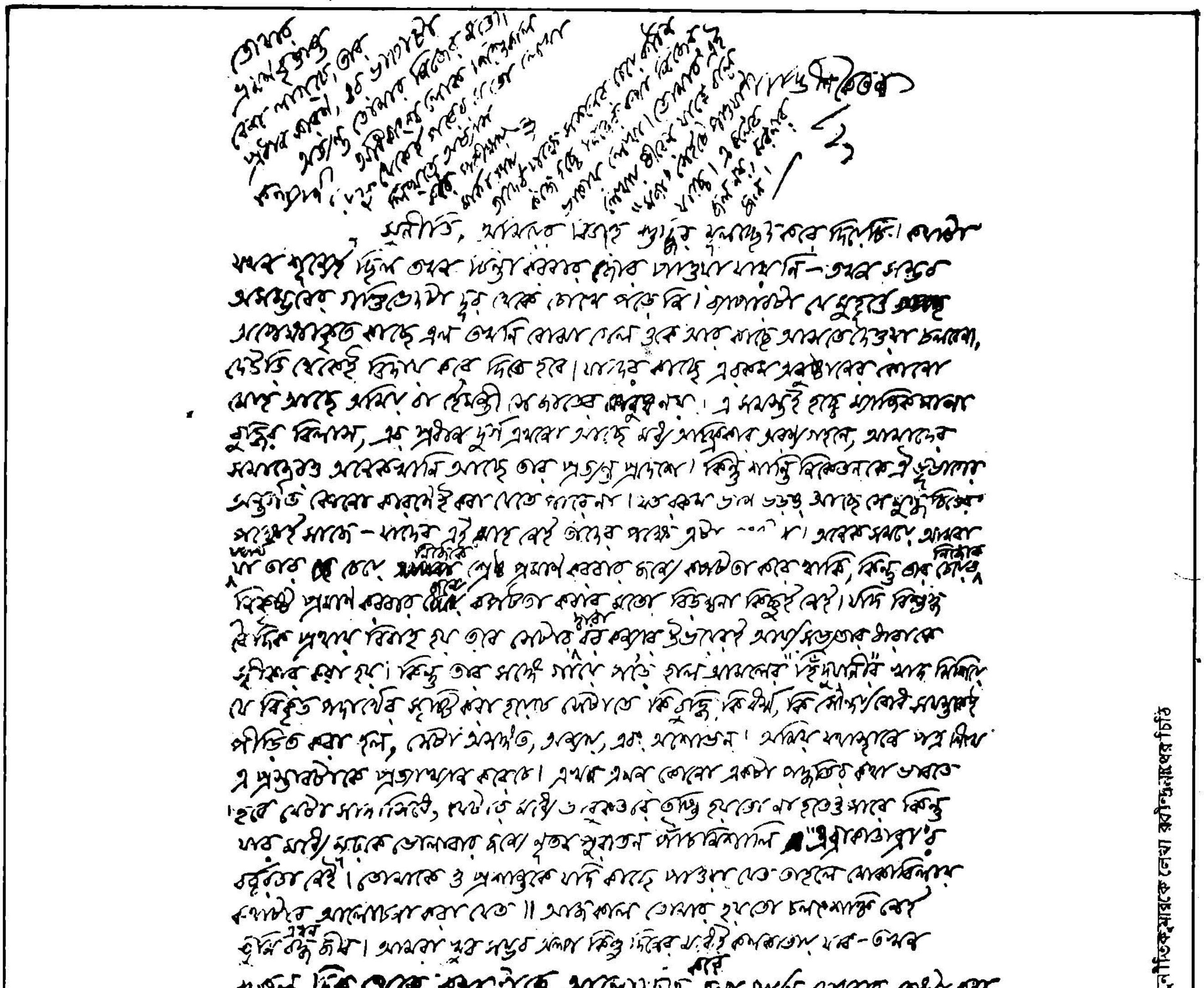
জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়;
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

বলেছেন। তিনি বলছেন, 'তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।' এবং ' এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।' এ সবকটি গুণই কিন্তু একজন উপন্যাস রচয়িতার কাছে প্রত্যাশিত। তাই রবীন্দ্রনাথ যদিও সুনীতিকুমারকে লিপিবাচস্পতি, লিপিসার্বভৌম বা লিপিচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করতে আগ্রহী বস্তুত তিনি তাঁর মধ্যে ঔপন্যাসিকের গুণই লক্ষ্য করছেন।

বিশদকে দেখা, চোখে যা পড়ে মনে তাকে সংগ্রহ করে রাখা, বিশ্বব্যাপারের প্রতি সজীব আগ্রহ এবং তুচ্ছ ব্যাপারকেও অনুপেক্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা— এসব গুণই ছিল সুনীতিকুমারের এবং সেই সঙ্গে তাঁর বর্ণনার ভাষাটা ছিল তাঁর নিজের মতো, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কলের জল নয়, ঝরনার জল।' অর্থাৎ তাঁর ভাষায় ছিল সাবলীলতা আর তাঁর চিঠি যেন 'চলতি কালের সিনেমা ছবি' অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উপন্যাস রচনার এত আয়োজন সত্ত্বেও সুনীতিকুমার উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশার কথা জানা সত্ত্বেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি এ জাতীয় রচনায়। তার কারণ সুনীতিকুমার তাঁর 'স্বধর্ম' জানতেন। স্বধর্মের বাইরে আসার কথা তিনি চিন্তা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার' কাজ। কিন্তু এ ধরনের পণ্ডিত নিছক জ্ঞানমার্গে বিচরণকারী। সুনীতিকুমারও জ্ঞানমার্গের মানুষ ছিলেন নিশ্চিতভাবে। কিন্তু সে জ্ঞানমার্গে বিচরণের লক্ষ্য শুধু আস্ত জিনিসকে টুকরো করা বা টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়া নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপারের প্রতি সজীব আগ্রহ। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের লক্ষ্য ছিল মানব—' আমি মানব, মানবের কিছুই আমার পক্ষে অবান্তর নয়' (Homi sum humani nil a me alienum puto)। সুনীতিকুমারের ভাষাচর্চা সে কারণেই ভাষা বা ধ্বনির গঠনবিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নজাত গবেষণা নয়, তিনি ভাষাকে দেখেছেন এক সমাজ-নৃতাত্ত্বিক বিদ্যা হিসেবে। তাঁর ভাষাচর্চা তাই ছিল যথার্থ মানবিকী বিদ্যা। সেই কারণেই সুনীতিকুমার জীবনে উপন্যাস রচনা না করেও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে এবং মানুষকে দেখতে পেরেছিলেন। তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচিত প ত্রে, তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এবং তাঁর আত্মস্মৃতি মূলক রচনা-সমূহে। 'পশ্চিমের যাত্রী' (১৯৩৮) বা 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০)-এর মতো ভ্রমণকাহিনী যে-কোনো ভাষার সম্পদ। আবার 'পথ-চলতি' (প্রথম খণ্ড ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৪)-র মতো স্মৃতিচিত্র সুনীতিকুমারের সজীব



সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

মনের আগ্রহ যে কোনো কিছুকেই তুচ্ছ বলে মনে করত না তার প্রমাণ বহন করছে। মানুষ এবং দেশ সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের সদাজাগ্রত দৃষ্টি এসব বইয়ের প্রায় প্রতিটি রচনায় ছড়ানো আছে। সে তুলনায় তাঁর সাংস্কৃতিকী (প্রথম খণ্ড ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৫, তৃতীয় খণ্ড ১৯৮২) অনেক বেশি জ্ঞানমার্গের উপলখণ্ড। তবে সে উপলখণ্ড যেহেতু সমসাময়িক সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত তার ফলে এর নিবন্ধগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন ও পরিবেশের প্রতি পাঠককে সচেতন করে তোলে। সুনীতিকুমার তাঁর 'জীবন-কথা' (১৯৭৯) সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, যদি পারতেন তবে হয়তো দেখা যেত 'জীবন-কথা'র পিছনে তাঁর এক উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টিই তাঁর জ্ঞানমার্গের সাধনাকে জীবনমুখী করে তুলেছে।

সুনীতিকুমার এক রক্ষণশীল পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁর ভাষাব্যবহারেও সেই বিবর্তন স্পষ্ট। শুরু করেছিলেন সাধু ভাষা দিয়ে, ধীরে ধীরে এক বৈঠকী কথ্য গদ্যকে তিনি অবলম্বন করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত কথ্য গদ্য বিশেষভাবেই কলকাতার গদ্য, যে গদ্য বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ থেকে। তবে সুনীতিকুমারের গদ্যে ঠাকুরবাড়ির পরিশীলন থাকলেও তার পেলবতার পরিবর্তে এক পুরুষোচিত বলিষ্ঠতায় দৃপ্ত—সেখানে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবর্তে সিমলের স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী অনেক বেশি। ঠাকুরবাড়ির গদ্যে স্বাভাবিক কারণেই অন্তঃপুরের ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সবার আগে অন্তঃপুর ছেড়ে পুরুষের আসরে এসেছিল বলে পুরুষের ভাষায় সংযম এবং নারীর প্রতি সম্ভ্রম দেখা দিয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। অন্তঃপুরের প্রভাবে সে ভাষা হয়েছিল একটু আবেগমণ্ডিত এবং স্নেহোচ্ছ্বাসে আন্তরিক। আর নারীর উপস্থিতিতে সে ভাষা উচ্চারিত হয়েছে বলে সে ভাষা হয়েছিল পরিশীলিত এবং অপভাষাবর্জিত। সুনীতিকুমার কলকাতায় প্রচলিত বৈঠকী গদ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়েও কিঞ্চিৎ পুরুষালির পক্ষপাতী। তাঁর ভাষা কিছুটা পেলবতামুক্ত এবং আবেগবর্জিত, হয়তো তাতে ব্যক্তিগত সুরেরও কিছুটা অভাব দেখা যায়। একজন বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন মানুষের রচনায় এই ব্যক্তিগত সুর বা মন্ময়তা প্রত্যাশিত নয়। হয়তো এসব কারণেই সুনীতিকুমার উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন না। তবে উপন্যাস রচনা না করেও বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী বা পত্রসাহিত্যের তিনি এক সার্থক স্রষ্টা। কারণ সেখানে 'যদৃষ্টং' তারই প্রাধান্য, কল্পনা সেখানে অনুপস্থিত। সুনীতিকুমারের গদ্যরীতি, যা একদিন রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা পেয়েছিল ভবিষ্যৎ বাংলা গদ্যরীতির সামনে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতের বাংলা গদ্য যতই বস্তুভিত্তিক অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে উঠবে, ততই আমরা সুনীতিকুমারের গদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। তবু আক্ষেপ হয় সুনীতি- কুমার রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ সত্ত্বেও উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন না। সেই আক্ষেপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত করবার জন্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে অনুরোধ করার দু' বছরের মধ্যেই তাঁর উপন্যাস 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)-র নায়ক অমিত রায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুনীতি চাটুজ্যের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'। ফলে উপন্যাস রচনা না করেও উপন্যাসের সূত্রেই সুনীতিকুমার বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে রইলেন—অন্তত সুনীতিকুমার তাঁর স্বভাববিনয়বশে তাই মনে করতেন এবং প্রায়শই বলতেন যে রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় তাঁকে বিখ্যাত করে দিয়ে গিয়েছেন।



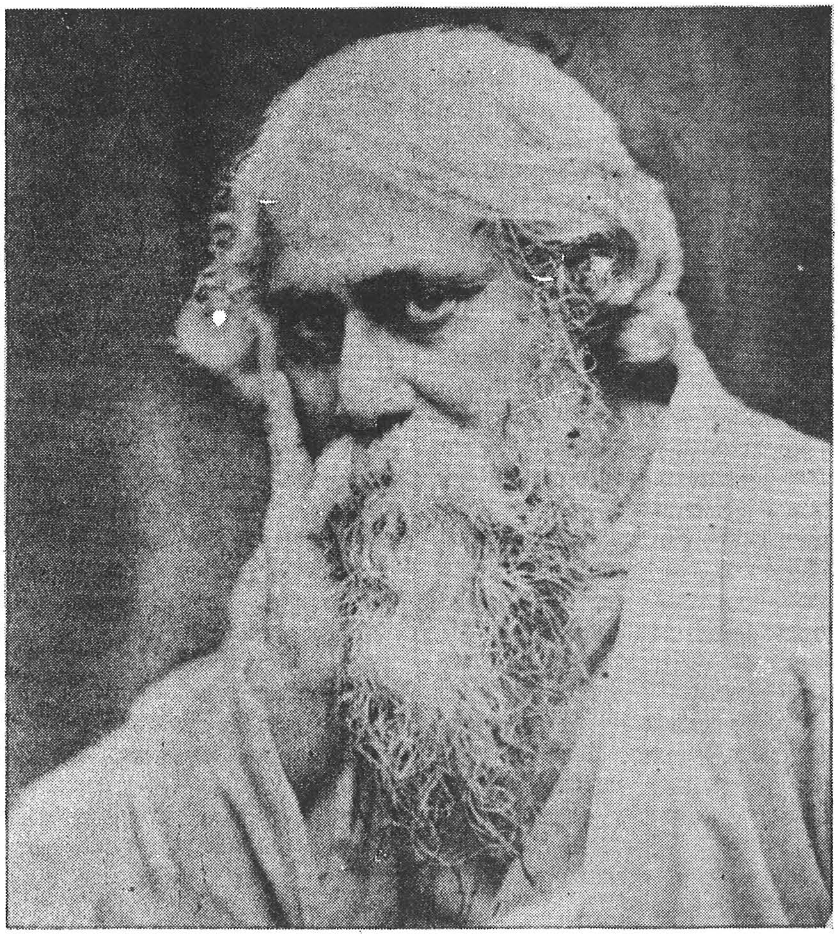
কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমার (ডানদিকে)



রাম জন্মভূমি, বাব্‌রি মসজিদ পেরিয়ে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমরা যদি সত্যিসত্যিই রাম জন্মভূমি আর বাব্‌রি মসজিদ পেরিয়ে মুক্ত মানবতার পথে হেঁটে যেতে চাই, তাহলে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই। তাই বরং গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মতই রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে লিমহার্স্ট-এর দলিলের একটি অংশ তুলে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।



"গান্ধীজী বলেন—'.......আমিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জাতির মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই আমি ইতিমধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বাস্তবে রূপায়িত করেছি।' রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তরে বলেন—'না, আমি তা স্বীকার করতে পারছি না। আপনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সেই ঐক্য এনেছেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেই সেই ঐক্য এনেছেন। কিন্তু ইংরেজ যখন আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে তখন সেই ঐক্য কিসের ওপর দাঁড়াবে? আপনি আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষ বিষ কি আপনি সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করতে পেরেছেন? তাই আমি বলছিলাম, যখন ইংরেজরা চলে যাবে তখন আমাদের কি হবে?"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বছরের মধ্যেই আমরা ডানাভাঙা স্বাধীনতা পেয়েছি। এর ঠিক একবছর আগেও হাজার হাজার মানুষ কলকাতা, নোয়াখালি, ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় ধর্মের জিগির তুলে এ-ওকে অবলীলায় খুন করেছে।

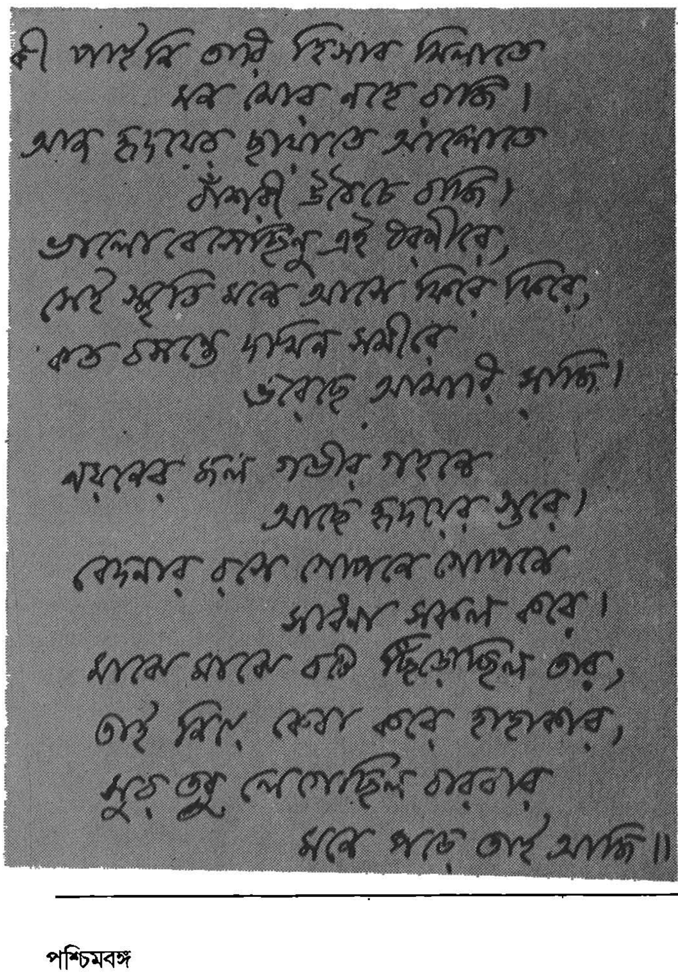
উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় বিষময় হয়ে ওঠেনি। দাঙ্গা, হানাহানি যে ছিল না তা নয়। কিন্তু কখনোই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে চূর্ণ করে দেওয়ার মত হন্তারক শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়নি।

'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবন ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।.........যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই সব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত।"

বিশ শতকে দেশের রাজনীতিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ভেতর দিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত সেই সীমাবদ্ধতার মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হলাম। এর পেছনে অবশ্য কাজ করেছিল পুঁজিভিত্তিক সমাজে মধ্যস্বত্বের সম্পর্ক, যা শুধু জাত্যাভিমান ও সংকীর্ণতারই জন্ম দেয়নি, এদেশের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকেও কোনো পরিণতিতে নিয়ে যায়নি। বরং এই সংস্কারকেরাই অনেকে শিকার হয়ে উঠলেন ধর্মভিত্তিক ঘৃণার। তাঁদের মানসিকতায় জাতীয় সমাজ মুখ্যত

বিভক্ত হয়ে গেল হিন্দু আর মুসলমানে। জাতি যদি ইতিহাসের ধারায় নির্দিষ্ট একটি মানবগোষ্ঠি হয়, যার পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় হয় পুঁজিপতি না হয় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। তবে তার সংহতির মূলে যে সব উপাদান কাজ করে,সেগুলি কিন্তু ঘা খেল এই বিভাজন-তত্ত্ব ও মানসিকতা থেকেই। ফলে শোচনীয়ভাবে অভাব দেখা গেল কেন্দ্রীকরণ শক্তির। ধর্ম দিয়ে যে আলাদা ক'রে কারো ঘর বেঁধে দেওয়া যায় না, বরং এর ফসকা গেরো খুলে গিয়ে বিচ্ছিন্নতা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে, তার অকাট্য প্রমাণ আমরা পেলাম ১৮৯৩ সালের একটি ঘটনায়। মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলক হিন্দু জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করার জন্য ঐ বছর স্থাপন করলেন 'গোরক্ষণী সভা'। ফল মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক সেবার পুণা কংগ্রেস বয়কট এবং গো-হত্যাকে কেন্দ্র ক'রে বোম্বে বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঠিক এই একটি ধরনের ভ্রাতৃহত্যা দেখা দিয়েছিল ১৯১৭ সালে বিহারে গো-হত্যা উপলক্ষে। বিষয়টি এতই বিচলিত করে তুলেছিল রবীন্দ্রনাথকে, যে 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধে তিনি না লিখে পারেননি, "বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায়, এবং সেইটে জোর করিয়া অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব—অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।"

বিহারের দাঙ্গার কয়েকবছর আগে, ১৯১১-তে বস্তুত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছিল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। এইভাবে জাতিদ্বেষের বিষাক্ত বাতাস ঢুকে পড়েছিল আমাদের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এ ধরনের ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে কতদূর বিচলিত করে তুলেছিল তার সাক্ষ্য 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', 'ধর্মের অধিকার', 'লোকহিত', 'সত্যের আহ্বান', 'পরিচয়' ইত্যাদি সমসাময়িক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতাকে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি মানবধর্মের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। খোদ শান্তিনিকেতনেই মুসলমান ছাত্র-ভর্তি নিয়ে যখন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল, তখন কবি আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, জাতপাতের অসুখ আমাদের জীবনে কতখানি দুরপনেয় হয়ে উঠেছে। যে শান্তিনিকেতনকে তিনি দল, সম্প্রদায় ও সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে রেখে মানবতার আশ্রম হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানেও সেই অভিপ্রায়কে বাস্তব করে তোলার কাজে তাঁকে কম লড়াই চালাতে হয়নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রয়াসের সফলতাকে অবশ্য এভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন, "যেদিন শান্তিনিকেতন মুসলমান খ্রীষ্টানের জন্য দ্বার উন্মোচন করিল সেদিন শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে একটা বৃহত্তর জীবনে সূচনা হইল।"


কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরি উঠেছে বাজি।
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে,
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি।
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে।
বেদনার রথে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারবার
মনে পড়ে তাই আজি॥

কোনো বৈঠক বা সভায় মিলিত হয়ে নিছক 'রেজলিউশন পাশ' করে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঝেড়ে ফেলা যায় না, রবীন্দ্রনাথ তা বারবার উল্লেখ করেছেন। সমাজজীবন ও সামাজিকতায় সর্বত্র বহাল থাকবে সাম্প্রদায়িক আচরণ। অথচ রাজনীতিতে প্রায় নাটকীয়ভাবে ঐক্য সাধিত হয়ে যাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকজন কর্মকর্তার ইচ্ছেয়, তা হয় না। স্বরাজলাভের প্রধান শর্ত রূপে হিন্দু-মুসলমানের আত্মিক মিলনের প্রশ্নটি অবিরামভাবে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

জাতিগতভাবে পারস্পরিক আচরণের মধ্যে যে ফাঁক-ফোকরগুলো নগ্ন হয়ে আছে আজও, তার কুশ্রীতা এতই স্বরাট যে একটু চোখ খোলা রাখলেই তা দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ঘৃণার অভিব্যক্তি যেন স্বাভাবিক ও গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের ধ্বজাধারীদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি বহুক্ষেত্রে সাধারণ লোকজনের মধ্যেও। ১৩২১-এর ভাদ্রে রচিত 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-পর্যবেক্ষণ, সে তো আমাদের সকলেরই—'হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাশ জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করেন নাই।"

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কালপর্বে সংখ্যাগুরু অংশের জাতীয়তাবাদের চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। গান্ধীজী, তিলক, মদনমোহন মালব্য, গোখলে, রানাডে থেকে শুরু ক'রে বিপ্লববাদী নেতাদেরও অনেকে এই মনোভাব-প্রসূত আচরণ হতে মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জন্য বেদনা যে হিন্দু-মুসলমানকে একটি বিন্দুতে মিলিত করতে পারেনি, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সপাটে মাথা তুলেছে উগ্র মুসলিম মৌলবাদ, এবং তাতে ঘনঘন জল সিঞ্চন করেছে সাম্রাজ্যবাদ—তার শিকড় গভীর হয়ে প্রোথিত রয়েছে আমাদের জীবনে, কর্মে ও ইতিহাসে।

পুঁজিবাদী সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের ভেদপন্থা অবশ্য অনেক আগেই তার দেউলিয়া চেহারা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে 'সফলতার সদুপায়' নামে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "অধীন দেশকে দুর্বল করা তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে-সময়ে ওআর্ডস্‌ওয়র্থ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি;.....যে সময় পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে-সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়ে রাষ্ট্রনীতি।"

রবীন্দ্রনাথের চোখে সহজভাবেই ফলিত হয়েছিল এই সত্যবোধ যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত আছে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের মধ্যে। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ন্যাশনালিজম, আমরা তাকেই আখ্যা দিই—স্বাজাত্যবোধ। স্বাজাত্যবোধ অর্থাৎ নিজের জাতটাই পৃথিবীর অন্যসব জাতের চেয়ে পৃথক, উন্নত ও প্রধান, অন্যদের দাবিয়ে রেখে এবং তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম ক'রে নিজের জাতকে ধনে-মানে ক্ষমতায় শীর্ষস্থানীয় করতে হবে এবং জাতির সঙ্গে জাতির পাশবিক লড়াইয়ে নিজেদের জয়ী করার উদ্দেশ্যে স্বজাতির ও অপরজাতির মধ্যে মানসিক ও রাজনৈতিক বেড়া তুলতে হবে ও দেশের প্রতিটি মানুষের মনকে অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও স্বজাতি-সম্পর্কে অন্ধ মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন রাখতে হবে—এই উপলব্ধিই ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুভবের সারাৎসার। তিনি তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দেখেছিলেন কিভাবে পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকার মনস্কতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্‌সিনির উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদের জায়গা জুড়ে বসেছিল মাহান, সীলি, গামপ্লাউইজ, রাৎসোহোফার ও ট্রাইট্‌স্কে-য় তথাকথিত জাতীয়তাবাদ। কিভাবে দেখা দিয়েছিল আর্যামি, রক্তের শুচিতা, চামড়ার রঙের বড়াই, বিশেষ বিশেষ ভাষার ও হরফের বড়াই, বিশেষ বিশেষ ঢঙের জুতো ও টুপির বড়াই প্রভৃতি নোংরামিতে ভরা মূঢ়, হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ যার পরিণতি ঘটেছিল প্রুশীয় সামরিকবাদে, ফ্যাশিজমে ও হিটলারবাদে। আজ যখন সারা ভারতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে শুরু করে বি জে পি-র অস্থিষ্টর মূল কেন্দ্রে আমরা চোখ ফেরাই, তখন কি আমাদের দেশেও জাতিগত-প্রশ্নের সমাধানের নামে উগ্র বলকানাইজমে-র জঙ্গী মর্জি আমাদের চৈতন্যের মূলকে এক ভয়াবহ সম্ভাবনার বাতাসে কাঁপিয়ে দেয় না ? আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের মত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদের বীভৎস প্রকাশ কি প্রতিনিয়ত আমাদের এই ধারণাতেই স্থিত করে না যে, দুই সম্প্রদায়ের গোপন হিংসাতন্ত্র কখনো তলে তলে কখনো প্রকাশ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ এর সেই পিঠের দিকটা সম্পর্কে সমসময়ই আতঙ্কে বাস করছে, যে-দিকটায় এর কোনো চোখ নেই। সামান্য একটু পায়ের আওয়াজ বা কাছেপিঠে সামান্য একটু নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেলেই সেখানে আতঙ্কের শিহরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই আতঙ্ক থেকেই মাথা তোলে মানুষের স্বভাবে যা কিছু কুৎসিত ও নীচ।

পরভৃৎ, পরজাতিপীড়ক পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে মূলত একই অশুভ, অপমানসের জন্মসহোদর, তা নির্ণয় করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমী ন্যাশানালিজম্-এর অহঙ্কারী আত্মপ্রকাশই যে মানুষের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ, তা ঘোষণায় রবীন্দ্র-কণ্ঠ ছিল অক্লান্ত। জীবনের ছয় দশকের ও অধিক সময় তিনি চীনের লোকদের কামান দেখে আফিম গেলানো কঙ্গোতে বেলজিয়ানদের বর্বর অত্যাচার, ইংরেজদের দ্বারা ভারতে ধারাবাহিক দরিদ্রীকরণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষতরুতে জলসিঞ্চন, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা পারস্যের শ্বাসরোধ, দেশে দেশে 'হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেন' তত্ত্বের ফলিত রূপ, সভ্য ইয়োরোপের সর্দার পড়ুয়া জাপান-কর্তৃক চীনকে ছিঁড়েছিঁড়ে, খাওয়া, স্প্যানিশ সাধারণতন্ত্রের ওপর ফ্যাশিস্ত আক্রমণ প্রভৃতি যাবতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটানা অভিযান চালিয়েছিলেন।

শুধু দেশকে নয়,মানবসভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত কুললক্ষণ ঠিক একইভাবে নিহিত আছে আমাদের মৌল হিন্দু ও মুসলমান অসহিষ্ণু মানসে। রবীন্দ্রনাথ নিছকতত্ত্ব নিয়ে এই সর্বনাশ বিষয়টিকে ধরেননি। তিনি যখন জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তখন সবিস্ময়ে দেখেছিলেন, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একটি প্রান্ত তুলে সেখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। ১৩৩৮ সালে 'হিন্দু মুসলমান' নামে একটি প্রবন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লেখেন, "অল্প বয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তাপোশে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে ; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল !"

এই আত্মধিক্কারই বারান্তরে রবীন্দ্রনাথকে বলতে প্ররোচিত করেছিল, "কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল, খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিলে ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া দিতে হয়।" (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩১৩)।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতিবন্ধককে খুঁজে পেয়েছিলেন উভয় ধর্মের আচার-কেন্দ্রিকতার মধ্যে। যে-আচারের কারণে হিন্দুধর্মের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় গো-রক্ষা, ধর্মের অঙ্গ হিসেবে মুসলমানদের কাছে সেই গো-হননই হয়ে দাঁড়ায় একান্ত করণীয়। ১৯২৩ সালে 'সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারা অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে।"

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার গঠনপর্বে হিন্দুদের ব্যবহার করেছিল বিশ্বস্ত কারকুন-মুৎসুদ্দি বাহিনী গড়ে তোলার কাজে। এই সাম্রাজ্যবাদই বিশশতক থেকে মুসলমানদের ব্যবহার করতে লাগল উপনিবেশকে টিঁকিয়ে রাখার মানসে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধুয়ো তুলে। পরস্পরের দিকে মুখ-ফেরানো দুই ধর্মের মাঝখানের যে অবরোধ ছিল, তা ক্রমশ কঠিন হতে হতে অচলায়তন গড়ে তুলল স্বাজাত্যবোধের নামে। ১৯৩৯-এ মংপু থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কিন্তু আমাদের সমস্যা এই শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই ; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের শরিক—অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর করে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না।"

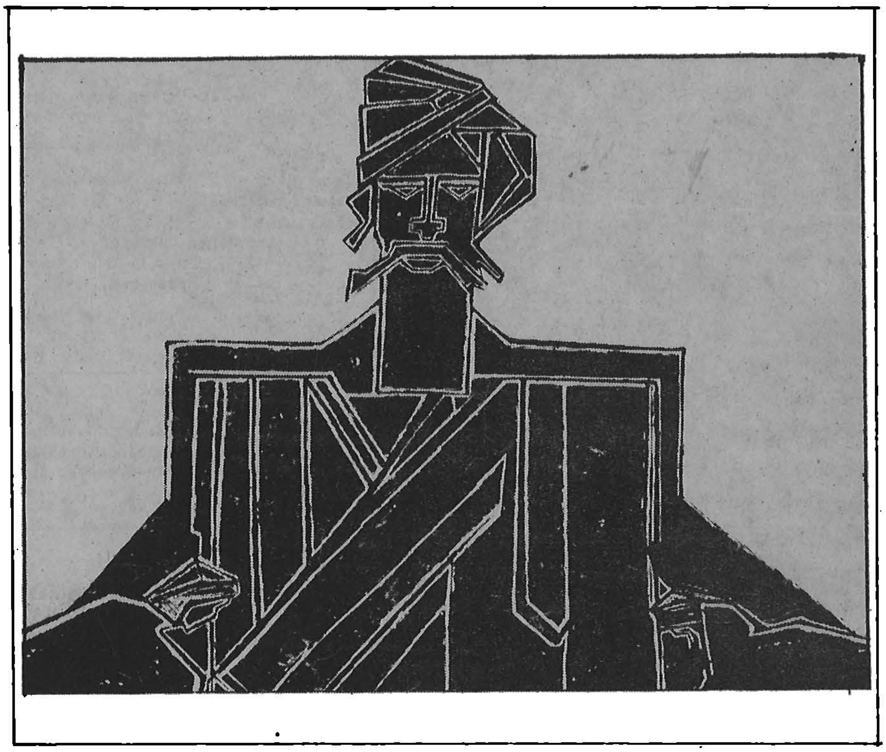
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে-রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে সোনার বাংলাকে ভেঙে দু'ভাগ করার সাধ্য কারও নেই, সেই আন্দোলনের রাজনৈতিক বেদনাবহ পরিণাম দেখে শেষ পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়েছিল সেই মানুষটিকেই। আন্দোলন যতই হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমার্থক হয়ে পড়ছিল, স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশি সামগ্রী বয়কটকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং এই দাঙ্গায় উসকানিদাতার ভূমিকায় প্রকট হয়ে উঠছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ, ততই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছিলেন যে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে শুধু রাখি বেঁধে দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করা যায় না। স্বদেশিয়ানার নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়ার অমোঘ প্রতিক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই জন্ম হয়েছে মুসলিম লীগের (১৯০৬)। বয়কট আন্দোলন, মুসলিম লীগের পত্তন, সাম্রাজ্যবাদীদের বিভেদপন্থাশ্রয়ী কূটনীতি—এই তিনটি বিষয় কিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুঃখ ও রক্তের স্থায়ী বিভাজিকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং আরও অসংখ্য ছোটো-বড়ো বিভাজনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে রাখল—তা তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপাদানই হয়ে গেছে। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবল আক্ষেপে উচ্চারণ করেন, "এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার ওপর ঝুলিতেছে", তখন তিনি কি সত্যিসত্যিই উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর এই মর্মান্তিক অনুমানকে সর্বাংশে সত্য ক'রে তোলার কাজে আমাদের জাতি-বৈরিতা কতখানি বাস্তব চেহারা নিতে পারে।



রবীন্দ্রনাথ ও হায়দ্রাবাদ

সনৎকুমার বাগচী

'আমি সেই দিনের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে আছি যেদিন বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বার স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে।' ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ এই শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছিলেন তাঁর এক অনুরাগী আকবর হায়দারীর কাছে ১৯১৮ সালের ৯ জানুয়ারি। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৮৫ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হায়দ্রাবাদের সপ্তম নিজাম, নবাব মীর ওসমান আলী খানের স্মৃতি-রক্ষার্থে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। 'Vision of Osmania' নামে এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হস্তাক্ষরে তাঁর উপরোক্ত স্মরণীয় বাণী ও স্থান পেয়েছে।



রবীন্দ্রনাথ ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হায়দ্রাবাদের জনগণের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথও ভালোবেসেছিলেন হায়দ্রাবাদকে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতি। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ স্যার আকবর হায়দারীকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভয়-সংশয়কে অগ্রাহ্য করে আদর্শ রূপায়নের পথে এগিয়ে যেতে বলেনঃ 'You must be fully determined to lead it through difficulties and failures to ultimate fulfilment. Our faith has to be strong because our obstracles are great.' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন: 'Our countrymen are being punished for the original sin of bring born to their mother tongue.' এই অবস্থার প্রতিকার না হলে, তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জগতে যোগ্য স্থান অধিকার করা অসম্ভব। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তিনি আশার আলোক দেখেছেন, ভেবেছেন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বাইরে ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার সুযোগ আসবে।

প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কথা। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়—পরের বছর জুলাই-এ পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ দেশে-বিদেশে তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শ প্রচার করেন এবং সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তি, দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতি এবং অন্যান্যদের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য তাঁকে আবেদন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে পল্লী সংগঠনের কাজে তাঁর সহকারী কালীমোহন ঘোষ।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় সকল ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন-সংক্রান্ত পঠন-পাঠন ও উচ্চতর গবেষণার এক বিরাট পরিকল্পনা ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে—যা আজ হয়তো কবিমানুষের স্বপ্ন বলে মনে হবে। প্রতিষ্ঠার সময়ে বলা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্দেশ্য হবে: 'to provide at Santiniketan....a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, and other civilizations may be persued along with the culture of the West.....in a mity, good fellowship and cooperation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western Countries,

free from all antagonisms of race, nationality, creed or cast.....

২৭ এপ্রিল ১৯২৭-এ লেখা একটি চিঠি নিয়ে কালীমোহনকে হায়দ্রাবাদে পাঠান রবীন্দ্রনাথ। কালীমোহন যাতে নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে বিশ্বভারতীর আদর্শ ও পরিকল্পনার কথা বলতে পারেন সেজন্য এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজামকে অনুরোধ করেন। আরও লেখেন, বিশ্বভারতী পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং য়ুরোপের বহু মনীষী আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন: 'I can assure your Exalted Highness that I have done our best to rescue India from her obscurity of isolation and bring her into touch with larger world.'

H.E.H. THE NIZAM'S P.W.D.

No. 236 Dated 11-3-1343 F / 14-12-1933

From,

THE CHIEF ENGINEER & SECRETARY,
Public Works Department,
HYDERABAD - DECCAN.

To

THE DIVISIONAL ENGINEER,
Water Works Division,
Hyderabad.

Enclosures:

SUBJECT: Reserving the Government Guest House at Osmannagar (Gandipet) for Dr. Rabindranath Tagore on Sunday the 17th December 1933.

Sir,

I have the honor to request you kindly to arrange for the Government Guest House at Osmanagar being placed at the disposal of Dr. Sir Rabindranath Tagore on Sunday the 17th December 1933, where Sir Rabindra wishes to spend the day.

Please acknowledge receipt of this letter and intimate to me the result of action taken in the matter.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Sd/-

for CHIEF ENGINEER AND SECRETARY. PWD.

YSK
11.3

H.E.H. THE NIZAM'S G... 1329 14 DEC 1933

No. 237 D/- 11-3-1343 F / 14-12-1933.

Copy forwarded to the Secretary to Government Political Department, H.E.H. the Nizam's Government, Hyderabad, for information, with reference to his letter No.9295 D/-14..12..1933.

for CHIEF ENGINEER AND SECTRY, P.W.D.

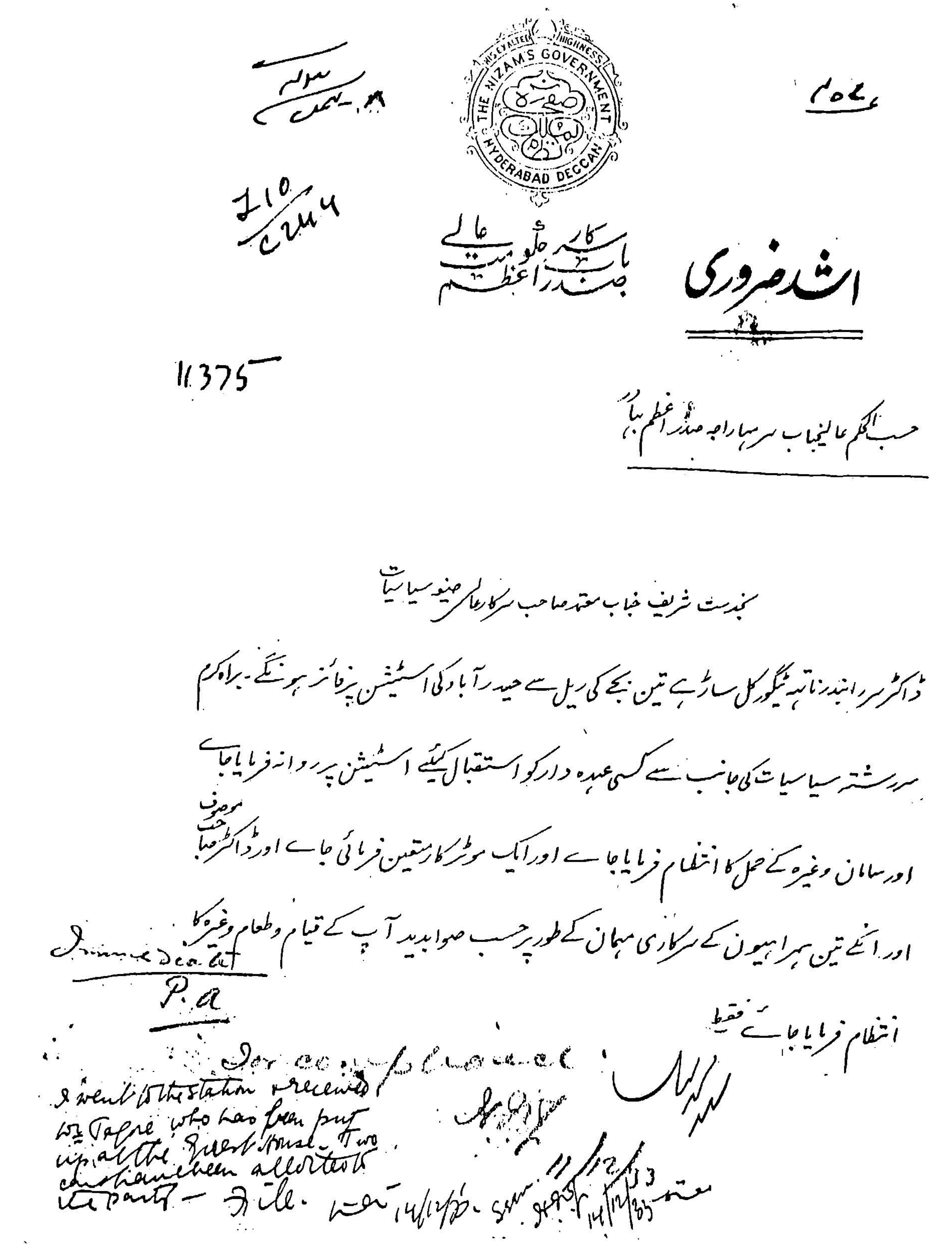
Inform the P.a accordingly

may be filed after the perusal of P.S.

রবীন্দ্রনাথের আবেদন পেয়ে নিজাম এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থে বিশ্বভারতীর ইসলামচর্চা বিভাগে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। বুডাপেস্টে অবস্থিত হাঙ্গেরিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইসলামচর্চার বিশেষজ্ঞ ডঃ জুলিয়াস গেরমানুষ এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন। পরে ১৯৩৬ সালে নিজাম আরও ১৯,০০০ টাকা দান করেন শান্তিনিকেতনে 'হায়দ্রাবাদ ভবন' নির্মাণের জন্য।

॥ দুই ॥

কয়েক বছর পরে ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ ভ্রমণে যান। নিজাম সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর এই ভ্রমণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই উপলক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের অভিলেখাগারে সংরক্ষিত নিজাম সরকারের



HIS EXALTED HIGHNESS
THE NIZAM'S GOVERNMENT
HYDERABAD DECCAN

باب حکومت سرکار عالی
جلسہ صدر اعظم

اشد ضروری

11375

حسب الحکم عالیجناب مہاراجہ صدر اعظم بہادر

بخدمت شریف جناب معتمد صاحب سرکار عالی صیغہ سیاسیات

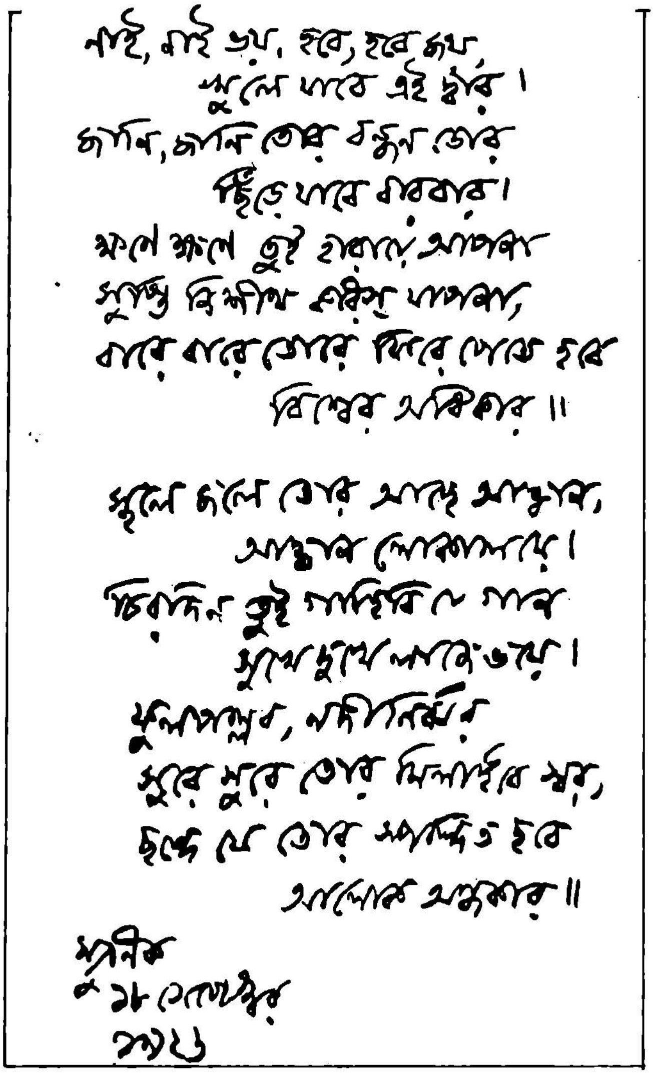
ڈاکٹر سر رابندر ناتھ ٹیگور کل ساڑھے تین بجے کی ریل سے حیدرآباد کی اسٹیشن پر وارد ہونگے - براہ کرم
سررشتہ سیاسیات کی جانب سے کسی عہدہ دار کو استقبال کیلئے اسٹیشن پر روانہ فرمایا جائے
اور سامان وغیرہ کے حمل کا انتظام فرمایا جائے اور ایک موٹر کار متعین فرمائی جائے اور ڈاکٹر صاحب موصوف
اور انکے تین ہمراہیوں کے سرکاری مہمان کے طور پر حسب صوابدید آپ کے قیام وطعام وغیرہ کا
انتظام فرمایا جائے - فقط

P.A.

I went to the station & received Dr. Tagore who has been put up at the Guest House. Two chauffeurs been allotted to the party — File.

14/12/33

১২ ডিসেম্বর ১৯৩৩ বিকাল ৩-৩০ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনে পৌঁছবেন। সদর-এ-আজমের দপ্তর থেকে রাজনৈতিক বিভাগের সচিবকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' নির্দেশ


নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি, জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার।
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস্ যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে।
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব, নদীনির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার॥

১৮ ডেসেম্বর
১৯৩৩

রাজনৈতিক বিভাগের নথিপত্রে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ কাগজপত্রই অবশ্য উর্দু ভাষায় লেখা।

রবীন্দ্রনাথ ১২ ডিসেম্বর (১৯৩৩) অপরাহ্নে হায়দ্রাবাদে পৌছোন। রেলস্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সদর-এ আজম-এর দপ্তর থেকে রাজনৈতিক বিভাগের সচিবকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সরকারী অতিথি হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হন। ১৭ ডিসেম্বর (রবিবার) রবীন্দ্রনাথের বিশ্রামের জন্য ওসমান সাগরের সরকারী অতিথিশালায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম থেকেই দুটি মোটর গাড়ি রাজ-অতিথিদের হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

ওয়ালটেয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন হায়দ্রাবাদে পৌছোন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন স্যার আকবর হায়দারী, ওসমানিয়া ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদ মির্জা, ই ই স্পাইট, সৈয়দ মহম্মদ মেহদী, পদ্মজা ও লীলামণি নাইডু, রাজা ধনরাজ গিরজী, বামন নায়েক প্রমুখ। ট্রেন থেকে অবতরণ করলে রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। তিনি প্রায় পক্ষকাল হায়দ্রাবাদে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে বহু সভায়-সম্মেলনে তাঁকে যোগদান করতে হয়েছিল। এসবের বিবরণ রয়েছে তৎকালে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের পাতায়। বিস্ময়ের কথা এত ব্যস্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদে বসে ছবি আঁকার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। আমাদের দেখা চারটি ছবিতে অন্তত তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। একটি ১২ ডিসেম্বরে, দুটি ১৮ ডিসেম্বরে এবং একটি ২৪ ডিসেম্বরে আঁকা। রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততার সামান্য পরিচয় রয়েছে 'নিজাম রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে :

'হায়দ্রাবাদ ১৫ই ডিসেম্বর—রবীন্দ্রনাথ ১২ই ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হন। পরদিন অপরাহ্নে রাজোদ্যানে টাউন হলের সম্মুখে কবির সম্মানার্থে মহারাজা স্যার কিষণপ্রসাদ প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। অবশিষ্ট নাগরিকগণের সহিত মহারাজা কবিকে পরিচিত করাইয়াছেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় টাউন হলে "ছাত্রদের নিকট আমার বাণী" শীর্ষক বক্তৃতা দান করেন। গোলমাল হওয়ার ভয়ে টিকেট করা হইয়াছিল। ব্যাকুল জনসমুদ্র চারিদিক দিয়া হলে প্রবেশ করিতে থাকে, দরজা, জানালা, বারিন্দা ও বাহির পর্যন্ত কোথাও তিলমাত্র স্থান ছিল না। মহারাজা কিষণপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, সমগ্র জগতের কাছে ভারতবর্ষকে যিনি গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তাঁহার আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে বক্তৃতা করেন। লাউড স্পীকারের সাহায্যে বক্তৃতা সকলেই শুনিতে পায়। হায়দ্রাবাদের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াছিল। নিজাম লোকমুখে শুনিতে পান যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হায়দ্রাবাদে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়া নিজাম বাহাদুর নিজে সেই বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য চাহিয়া পাঠান এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

১৪ই ডিসেম্বর মহারাজা কিষণপ্রসাদের প্রাসাদে এক ভোজের আয়োজন হয়। তথায় হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্ট, রাজ্যের বড় বড় ইংরেজ কর্মচারী ও আমীর-ওমরাহগণ উপস্থিত ছিলেন।

তার পূর্বে মহারাজের প্রাসাদ Poetry Society রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তথায় নিজের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

১৫ই তারিখ মধ্যাহ্নে স্যার আকবর হায়দারী কবিকে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন।

অপরাহ্নে সেকেন্দ্রাবাদের বণিক সভা (Chamber of Commerce) রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থে সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। কবি তথা হইতে গমন করিয়া সেকেন্দ্রাবাদের রিভোলী থিয়েটারে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় টিকেট বিক্রি করা হইয়াছিল এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ শান্তিনিকেতনের ফাণ্ডে দেওয়া হয়। উক্ত সভায় রাজা ধনরাজ গিরজী শান্তিনিকেতনের সাহায্যার্থে পনের হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।'

বিশেষ সংবাদদাতার পত্র/আনন্দবাজার
পত্রিকা/২০ ডিসেম্বর ১৯৩৩

হায়দ্রাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১৬ ডিসেম্বর তারিখে লিখছেন ঃ

'এবার শুধু সেলাম নয় কিছু সেলামী নিয়ে যাবই। তাই যতদিন পারি আঁকড়ে থাকব এ জায়গাটা।.....

এবার ৭ই পৌষে আমার যাওয়া সম্ভব হোলো না। আর কাউকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিস।........

আজ নিজামের সঙ্গে দেখা হোলো।'

॥ তিন ॥

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার জয়যাত্রা কামনা করেছিলেন। বিশ বছর পরে সেই বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ওসমানিয়ার উপাচার্য নবাব মেহদি ঈয়ার জঙ্গ বাহাদুর রবীন্দ্রনাথকে

লেখেন, সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং দেশের জন্য তাঁর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী সমাবর্তনে তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মেহদি ঈয়ার জঙ্গ- বাহাদুরের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি হায়দ্রাবাদবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্বাক্ষর রয়েছে। এই উপলক্ষে কবিকে হায়দ্রাবাদে পেলে তাঁরা খুবখুশি হবেন সে কথা উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রেখেছেন যে শারীরিক অবস্থার জন্য তাঁর পক্ষে এত দূরে আসা অসুবিধাজনক হতে পারে।

১৪ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে জানান শারীরিক কারণে তাঁর পক্ষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। ওই দিনই উপাচার্যকে চিঠি দিয়েও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে জানান। উল্লেখ করেন সুন্দর শহর হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের আনন্দময় স্মৃতি।

সেবারে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১ মার্চ। ৮ মার্চ মেহদি ঈয়ার জঙ্গ বাহাদুর রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, কবির অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মানজনক ডি-লিট উপাধি প্রদান করা হয়েছে। উপাধিপত্র এবং উপাধি প্রদান উপলক্ষে প্রদত্ত উপাচার্যের ভাষণের ইংরেজি অনুবাদও রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২৯ মার্চ রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্তি স্বীকার করে জানানঃ 'কোনো কিছুই এর থেকে আমাকে বেশি আনন্দ দিত না, যদি আমি নিজেই আপনার হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করতে পারতাম।'

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি। তাঁর জীবনে ও কর্মে বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের সাধনাই প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো কোনো মহল থেকে আপত্তি উঠলেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে ইসলামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস- সংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে ইরান-ইরাক এবং ১৯৩৩ সালে হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল।

।। চার ।।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদের নিজাম গভীর দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেনঃ 'I have been deeply greived and feelBengal's loss of a poet, who had no equal and the sad loss thus suffered is irreparable and the gap which his death has created it is impossible to fill up.' আন্তরিক শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি স্মরণ করেছিলেন কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের কথা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনার বিষয়। একজন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে রবীন্দ্র নিজামের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। তাই নিজাম আশা করেছিলেন কবির স্মৃতি তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

সার আকবর হায়দারী নিজাম সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ১৯৩৭ সালে নিজামের প্রধানমন্ত্রী হন। পরে ভাইসরয়ের কর্মপরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর তিনি অন্যতম 'প্রধান' ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হায়দারী বলেনঃ 'কবির মৃত্যুসংবাদে আমি মর্মাহত হইয়াছি। একজন দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে ভারত তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া গৌরব ও গর্বানুভব করিতেন। জাতি ও ধর্মের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তাঁহার চিন্তাধারা বা কর্মকে ব্যাহত করে নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং বহুক্ষেত্রে আমি তাঁহার বাক্য ও চিন্তাধারা হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি।.....কবি লোকান্তরিত হইলেও তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে চির জাগরূক থাকিবে।'

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। অধ্যাপক তাহের আলী, শান্তিনিকেতন

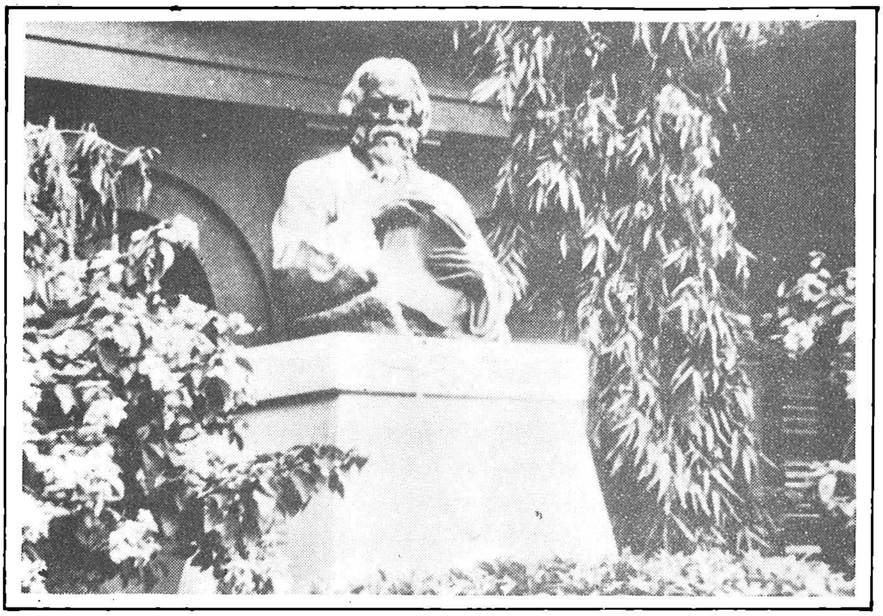




গণমুখী শিক্ষাভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

মোহিত চক্রবর্তী

শিক্ষার দু'টি দিকঃ একটি আত্মচেতনার শুভ উদ্বোধন, অন্যটি সার্বিক শুভবোধের উন্মেষ। এ-দুয়ের ক্রমপরিশীলিত ও পরিপ্রাপ্তিক স্তরে উন্নয়নেই শিক্ষার সার্থকতা। সে-কারণেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশমানতার গণচৈতন্যের সর্বব্যাপী ও সর্বশুভায়নিক প্রয়াসের প্রতি সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা-সনিষ্ঠ ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, এ-গণমুখী শিক্ষা-সচেতনতায় চিত্ত ও আত্মার ঐক্যসাধন সম্ভব হয়, মানুষে-মানুষে প্রতিনিয়ত ভাব-ভাবনার আদান-প্রদানে সর্ববিষয়ক হেরফেরগুলো উদারবিশাল আকাশের আলো দেখার ঈপ্সিত অবকাশ পায়। আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষাকে কতটা গণমুখী করে তোলা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার অপরিসীম ঐশ্বর্যের কাছে আমরা কতটা ঋণী সে বিষয়ে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।



দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনাকে গণচৈতন্যের অভিসারী হিসেবে না দেখে গণ-অঙ্গন থেকে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাত্য করে দেখা ও দেখানোর জন্যে এক ধরনের স্পর্ধিত অহমিকার সাথে ইদানীং পরিচিত হবার সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার বিকৃত মূল্যায়ন তো হচ্ছেই উপরন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তার অক্ষম ও অবিবেকী ধারক ও বাহক হিসেবে গোষ্ঠীতান্ত্রিক এক দেশদর্শিতার সঙ্কীর্ণ পরিসর ইচ্ছাকৃতভাবেই সৃষ্ট হচ্ছে, নইলে 'জানি আমি, আমার কবিতা/গেলেও বিচিত্র-পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'-র স্পষ্ট ভাষণের বিরল শোভনতার পরেও ঋতবাক রবীন্দ্রনাথকে শ্রেণী কেন্দ্রিকতার শিকার হতে হয়। জাতীয় শিক্ষার বাঁধনহারা, ছন্দছাড়া, শিক্ষা-কমিশন রিপোর্ট-এর ভাষায়, সুবিধেভোগীর জন্যে 'buying education' বা 'কেনা শিক্ষা'-র প্রেক্ষিতে আমরা যখন শিক্ষায় শ্রেণীশত্রুকে মদত দিই, তোয়াজ করে চলি অবিরাম, তখন রবীন্দ্রনাথের গণমুখী শিক্ষাভাবনাকে গভীর অনুধ্যানের পরিবর্তে তাঁকেই অগণতান্ত্রিক বলে অবমূল্যায়ন করি, যা ধৃষ্টতাকেও ছাড়িয়ে যায়। একে সাম্প্রতিক শিক্ষাজগতের এক ট্র্যাজেডি না বলে উপায় কই!

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সর্বব্যাপী প্রসারতার বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেনঃ

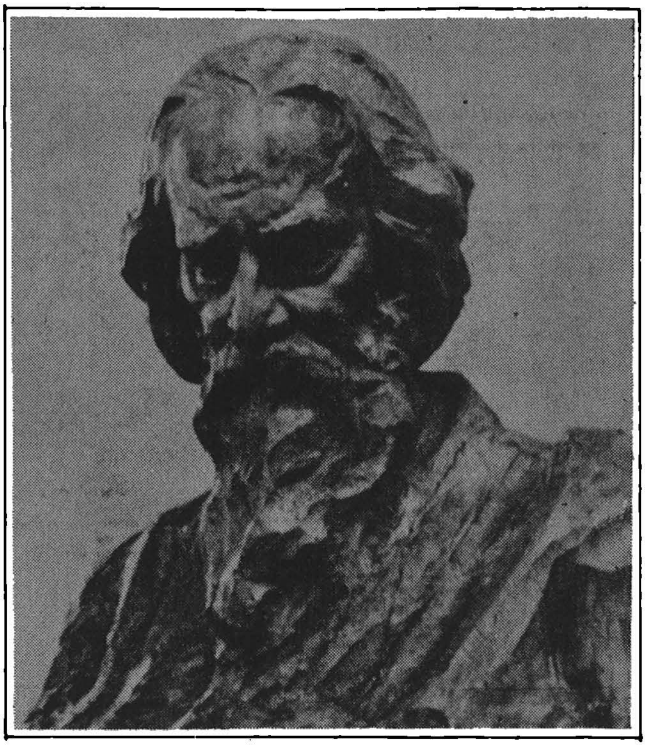
> শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাচুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উলটা ফল হয়। অর্থাৎ যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কান্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। পুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে খেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ 'বিদ্যাসমবায়", শিক্ষা, বিশ্বভারতী ১৯৭৩। পৃঃ ১৭৮

বলা বাহুল্য, শিক্ষার সীমিত-সঙ্কীর্ণ পরিবেশ রবীন্দ্র-শিক্ষা-মানসকে এতটা পীড়িত করেছিল যে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করার অন্তরায় হিসেবে গণমিলন বা গণ-ঐক্যের অনুপস্থিতিকে অশিক্ষার কুফল বলেই তিনি সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

> পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মসুলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল

ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও ; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ "বিদ্যাসমবায়", **শিক্ষা**, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ ১৭৯



আসলে, আমাদের দেশে শিক্ষার লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ-শিক্ষার সাথে আমাদের নাড়ীর ঈপ্সিত ও আবশ্যিক কোনো যোগ নেই। নেই আপামর জনসাধারণকে একসূত্রে বাঁধার প্রাণদ মাঙ্গলিক মন্ত্র। ফলে, শ্রেণীপুষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একপেশে সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যা সবচেয়ে বেশী বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত তা গণচেতনায় নবজাগরণ। গোষ্ঠীগত বিদ্যা স্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন ও পোষণের প্রবণতার এমন বিষ ভারতীয় চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে চলেছে যে গণমানসে সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থপরতা বেড়েই চলেছে। জন-উন্মাদনা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, পুঞ্জীভূত অভিমান, সংশয়, স্থানুরতা ও দুঃখ-বেদনাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো বীর্য আধুনিক শিক্ষা রাখছে কোথায়?

রাশিবিজ্ঞানের দ্বারস্থ না হয়েও স্পষ্টত একথা স্বীকার্যঃ গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষার ভেতরে আমাদের দেশে এখনও যোজন যোজন ফারাক। এমনিতেই কার্যকরী (i) ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ছাঁচে ঢালাই বাতাবরণে গ্রামীণ উন্নয়ন ও শিক্ষার দফারফা হতে চলেছে। একদিকে আমরা বলছি, ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে তার গ্রামগুলোকে বাঁচাতে হবে, ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ঐতিহ্য—সবকিছুর প্রাণবিন্দু ও উৎসশক্তি ওই গ্রাম। অন্যদিকে, জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধে—বিশুদ্ধ পানীয় জল, জন-স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জনযোগাযোগ, যানবাহন—রয়েছে কই? এই বাহ্য। এসবের চেয়েও প্রকৃতপক্ষে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং যার একক বৃদ্ধি ও বিকাশেই উপরোক্ত সব সুযোগ-সুবিধের জন্যে আয়োজিত সবরকম দেখনাই বাহাদুরিকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করার মতো অসামান্য চারিত্রিক বীর্যবত্তার পরিচয় গ্রামের মানুষ দিতে পারতো তা হলো শিক্ষা। এ-শিক্ষার অভাবই গণমানসের শুভচেতনায় চিড় ধরিয়েছে, ডেকে এনেছে নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, দলাদলি ও'ইজম-'বাজি' সংস্কৃতিপরায়ণতায় বিশ্বাসী না হয়ে নিষ্প্রাণ ও নিস্পৃহ জীবনযাপনে আমাদের করে তুলছে বিস্ময়করভাবে অভ্যস্ত। আমাদের শিক্ষা ও লক্ষ্যের মাঝে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষার পার্থক্যেই তা সুপরিস্ফুট।

প্রসঙ্গত, গণশিক্ষার এই উন্মার্গগামিতাকে কী ধরনের প্রশ্রয় দিলে তার বিষময় ফল আমাদের সামাজিক বিনষ্টির সূচক হয় এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় সমৃদ্ধিকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয় তার একটি নমুনা নে'য়া যাক। প্রায় সবাই জানেন, ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ৮২৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় অর্থাৎ তখনকার জনসংখ্যার নিরিখে মাথাপিছু ব্যয় ১০০ টাকার সামান্য কিছু বেশী। তুলনামূলকভাবে, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার প্রসারে ঠিক একই সময়ে প্রায় ১৬ লক্ষ উচ্চশিক্ষার্থীর জন্য মাথাপিছু ব্যয় হয় ৭৩৯ টাকা। আনুপাতিক হারে ২৮,২৪০৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে পানীয় জলেরই কোনো সুব্যবস্থা নেই সেখানে শিক্ষার কতটুকু পরিসর সার্থকভাবে সৃষ্ট হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়, বাদবাকী ইশকুলগুলোর শিক্ষাপ্রসারী কার্যসূচীর কথা অনুল্লেখ্যই থাক। আবার, সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার অবনতির বিষয়টি গণশিক্ষার নিরিখে নতুনভাবে বিচার্য। ফলে, শিক্ষার সর্বজনীনতা ও গণমুখী চেতনার সম্ভাবনাকে কতটুকু সফলতা-অভিসারী করা হচ্ছে, তা গভীরভাবে অনুধাবণীয়।

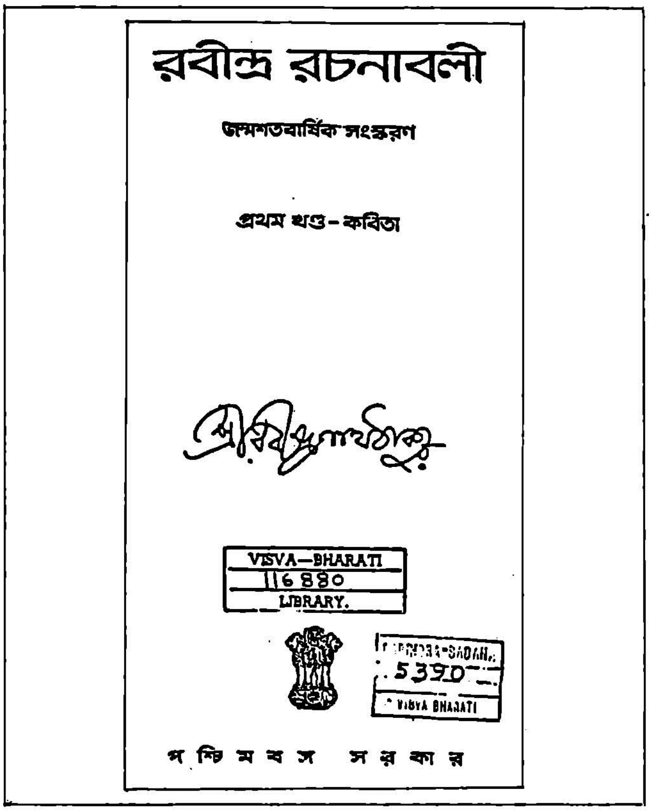
আবার সর্বভারতীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক সমন্বয়সাধন আজও কল্পনার পর্যায়েই রয়ে গেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় যথাক্রমে দু' ও তিন রকমের শিক্ষাধারণ প্রচলিত থাকলেও বৈচিত্র্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই থেকে যাচ্ছে এবং গণমানসে একতার মূল ভাবনাকে লালন, পরিপোষণ ও বর্ধনে ব্যর্থ হচ্ছে তা অস্বীকার করতে পারি কই? দুঃখঃ শিক্ষায় এই যে দীনতা, এই যে অসংহতি ও সর্বমানবিক শুভচৈতন্য বিকাশে বিফলতা তার জন্য আমাদের মাঝে সচেতনতার সক্রিয় ইশারা আজও প্রতিভাত হচ্ছে না। স্পষ্টত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়—উচ্চশিক্ষার কথা উহ্যই থাক—সুসমঞ্জস সমন্বয়-সাধনে হয় না কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অধিবেশন, আলোচনাচক্র, সেমিনার, কনফারেন্স এবং সংযুক্ত সংস্থা হিসেবে যা কিছু দাবি-দাওয়া তার সাথে শিক্ষাকে গণমুখী করে তোলার প্রাসঙ্গিকতা পরোক্ষ ও গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের আর পাঁচটা দাবি-দাওয়ার সাথে এর যেন কোনো তফাৎ নেই। ফলত, স্বার্থ ও শ্রেণী-চেতনায় স্বজনপোষণের বিষবাষ্পে শিক্ষা-পরিবেশ দূষিত না হয়ে পারে না। অথচ একে জিইয়ে রাখার জন্য অপচেষ্টার অন্ত নেই কেন না, শিক্ষার ভূমিকাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবার জন্য এ এক সুচতুর পরিক্রিয়া (Strategy)। এই পরিক্রিয়ার ভোজবাজি চলেছে শিকড়-স্তরে পৌঁছনোর জন্যে মুক্ত শিক্ষা, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথাবিমুক্ত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার নামে মাধ্যমিক স্তরে দশ-এগারো-দশের খেলা তো চলছেই। ছড়ার ভাষায়, এ খেলা হচ্ছেঃ

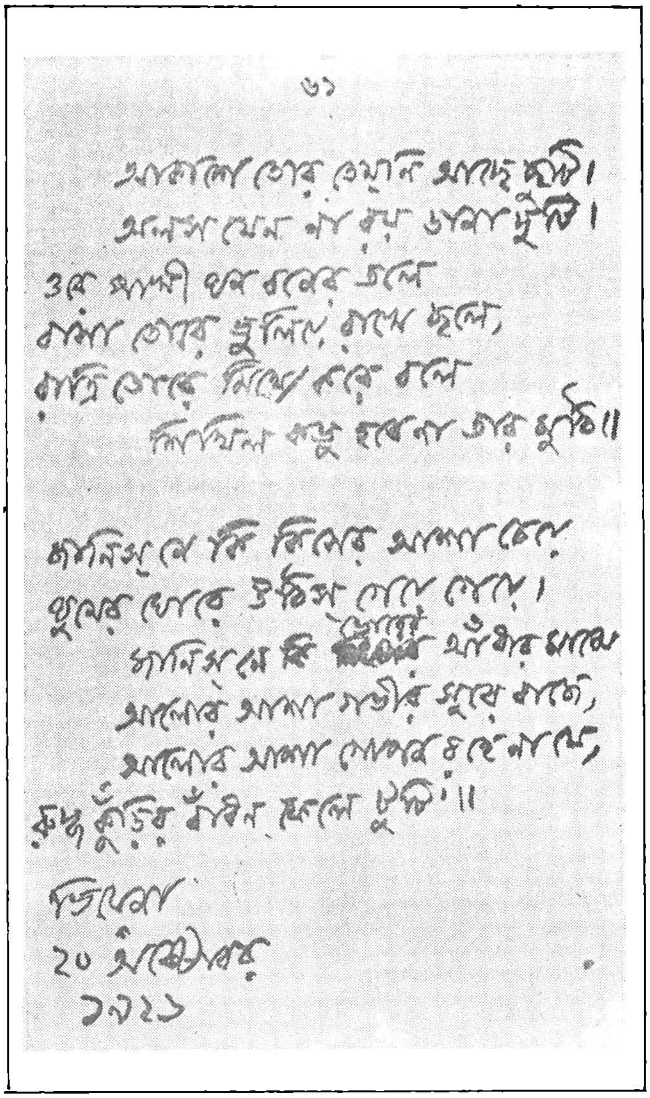
কাটুম কুটুম কাড়িকুড়ি,
আয়, শিশুপাল, খেলা করি
দশ-এগারো-দশের খেলা
বারো পেরুলে বুঝবি ঠেলা।
ফুশ্‌মন্তার্ লেখাপড়া,
হাওয়ায় চালাও মাকুড় ঘোড়া।
কাটুম কুটুম কাড়িকুড়ি,
আয়, শিখে নে জাড়িজুড়ি।

রবীন্দ্রনাথ দূষিত শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মর্মস্পর্শী বাক্-প্রতিমায়ঃ

একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকুরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দ্বীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেনড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকী দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তারা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্য-মন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরটী হল সুজলা, সুফলা টানা পাতা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্য নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয়নি। সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেন না, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমী চাঁদের মতো, অর্ধেক আলোয়, অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই।





—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ "শিক্ষার বিকিরণ," **শিক্ষা**, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ—২১৬

সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত গণমুখী শিক্ষাভাবনাকে আজও যথাযোগ্য সম্মান আমরা দিতে পারি নি, নইলে গ্রামে-গাঁথা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত সর্বস্তরে সর্বমানবসমাজে শিক্ষার সর্বব্যাপী অমল আলোক সম্যক্ প্রবেশ করলো কই? গ্রাম ও শহরের সর্বশ্রেণীর সমাজ-মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপন আপন সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা বার্তার আদান-প্রদানে সর্বজনীন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বৈভব সাধনে যত্নবান হয়, হয় প্রকৃত স্বাধীন দেশের সনিষ্ঠ-সুযোগ্য আদর্শ নাগরিক—এ শিক্ষা এখনও যে দূরঅস্ত্!

আমাদের শিক্ষায় গণমুখী চেতনার বিকাশে যতটা উদ্যম ও প্রয়াসের অবকাশ ছিল, শিক্ষা সেদিকে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নি। আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার দীনতা, আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্রম-অবক্ষয়, আমাদের সর্বগ্রাসী চারিত্রিক ভ্রষ্টতা আমাদের শিক্ষার মেরুদণ্ডকে দিয়েছে ভেঙে, করেছে কর্কট রোগাক্রান্ত যার ফলে জৈবিক সুড়সুড়ি, ইন্দ্রিয়গত পাপবোধ, অন্যায় এ অসত্যের পিচ্ছিল পথে আমরা হই-হুল্লোড়ে মেতেছি। আমাদের একপেশে, যান্ত্রিক, জীবিকা সর্বস্ব শিক্ষায় না আছে শীলায়ন, না আছে ইক্ষণ, ব্যক্তিক শুভ বিকাশের সঙ্কেত অথবা গণচেতনার ইশারা। কেবল অন্ধ আনুকরণিক স্পৃহা ও উল্লাসে গণ-জীবনে এসেছে এক 'বোহেমিআন', বাধাবন্ধনহীন জোয়ার যার কুফল জীবনের প্রতিটি স্তরে মারীর মতো বিস্তার লাভ করছে প্রতি মুহূর্তে। আপন দেশের মানুষ এবং তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাইরে থেকে আমদানি

করা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে মহার্ঘ বলে গ্রহণ করে আমরা একদিকে যেমন ব্যক্তিক স্বদেশীয় সৃজনী শক্তিকে করছি অস্বীকার, অন্যদিকে সম্মিলিত সমাজভাবনার শিক্ষায় আমাদের নিষ্প্রাণ বৈকল্য ও নিঃসীম নির্জীবতায় আমরা নিজেদেরকেই করছি অপমানিত। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হাতির নামে গজদন্তের, ময়ূরের নামে পেখমের, দেশের নামে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের শিক্ষায় আমরা আজও নির্লজ্জ নিরন্তর আগ্রহী!

মনে রাখতে হবে, গণমুখী শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে আমাদের বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী আজও সফলতার প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীকে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিত নিয়ে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস আজও তেমন জোরদার হলো কই? বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র—এসব গণমাধ্যমের এবিষয়ে দৈনন্দিন ভূমিকা সম্পর্কে আমরা কি সত্যিই সচেতন? আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বাত্মক করে তোলার প্রয়াসেও স্বাধীনোত্তরকালে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রমাণ মিলেছে একাধিকবার। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বিধানসভা কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন মাননীয় সদস্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত "কমিটি অন্ পিটিশন্স্" শীর্ষক যে বিবরণী পাওয়া যায় তাতে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার হালচালে স্তম্ভিত হতে হয়। এতে জানা যায়, গ্রামের এক শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মেহনতী সরল মানুষ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেননা, তাঁরা মনে করেন নিরন্ন জীবনে শিক্ষা সৌখিনতার নামান্তর। এদিকে কে না জানেন যে, উপকরণ ঐশ্বর্যে ও অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ সুবিধেপুষ্ট শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট, প্রকৃতপক্ষে এ-জাতীয় বৈষম্য গণমুখী শিক্ষাভাবনার সুস্থতার পরিচায়ক নয়। এ এক-ধরনের অনভিপ্রেত ও সর্বনাশী ভাবপ্রবণতা যা সমস্ত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কলঙ্ক ডেকে আনে। পাঁচ দশক আগে স্পষ্টত ৫ ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ—

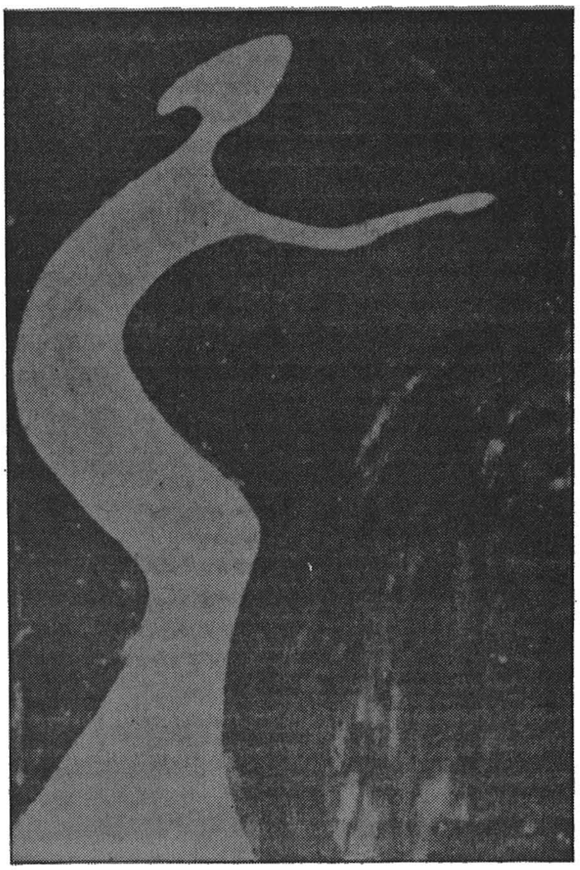
> সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণ- দশা তার বুকে খর নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে-অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়।

★ ★ ★ ★

> সত্যিকার কাজ, আরম্ভ করার মুখে একথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ "ছাত্রসম্ভাষণ," **শিক্ষা**, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩। পৃঃ-২৫৮—২৫৯

গণমুখী শিক্ষাভাবনার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত অমূল্য বক্তব্য স্মরণে রেখে সর্বজনীন শিক্ষার রূপায়ণে শপথগ্রহণে এ জন্মদিনের শুভক্ষণেই দেশবাসীকে নিতে হবে।





সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ঃ একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ

শুভংকর চক্রবর্তী

গল্পটির নাম 'মুসলমানীর গল্প'। মৃত্যুর ক'দিন আগে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি রচনা করেন। গল্পের শিরোনামের নীচে 'খসড়া' কথাটি লেখা রয়েছে। যতদূর জানা আছে, এটিই তাঁর শেষ লেখা গল্প। বেশ কয়েকবছর গল্পটি অপ্রকাশিত ছিল। রবীন্দ্র রচনাবলীতেও (নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) প্রকাশের তারিখ রয়েছে আষাঢ়, ১৩৬২। এই একটি গল্পে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বিশেষ এক রূপ পেয়েছে।

ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মনে বুদ্ধিতে শক্তিতে লড়াই করে তিনি অসাম্প্রদায়িক হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। বারংবার বলেছেন, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে আমাদের ভালোরকম করে মেলা চাই। তালি দেওয়া মিল অনেক হয়েছে, সে মিল অটুট থাকতে পারে না। মিলতে হবে সেই গোড়ায়। মিলনের এই দৃঢ় সংকল্পের এবং সাধনার কথা সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভাবতে হবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে আমাদের কিছুতে কল্যাণ নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই গভীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই গল্পটিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এরকমটা খুব কমই ঘটে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেন ঠিকই, কিন্তু কোনো একটি লেখায় স্রষ্টার সমগ্র জীবনের চিন্তা-ভাবনা বিশ্বাসের মর্মবাণী এমন করে ধরা পড়তে কমই দেখা যায়।

গল্পটিতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করেন নি, যা করেছেন নানা সময়ে নানান প্রবন্ধে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ এই গল্পটিতে নেই, যেমন রয়েছে অন্যত্র বহু রচনায়। গল্পটিতে রয়েছে কীভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি দৃঢ় হয়, একেবারে গোড়ায় কী করে মেলা যায় তার পথের সন্ধান। এরূপ পথের সন্ধান মৃত্যুর ১০ বছর আগে ১৯৩১ সালে, 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে একবার উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলেছেন, মিলের বড়ো কথা সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে, ধর্মকর্ম মত বিশ্বাস প্রভৃতির অনৈক্যকে পিছে ফেলে পাশাপাশি চলা, কাছাকাছি আসা, কণ্ঠ মিলিয়ে এক সঙ্গে দাঁড়ানো, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব প্রমাণ করা। প্রমাণ করা যে, হিন্দু-মুসলমান আমরা পরস্পরের আপন লোক, আমরা আত্মীয়। এর দশবছর পর, মৃত্যুর কিছুদিন আগে, এই আত্মীয়তার সুরটিকেই তিনি লক্ষ্যবস্তু করলেন এই গল্পটিতে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করলেন। হিন্দু ঘরের ব্রাহ্মণকন্যা স্বামী পরিত্যক্তা কমলা বিবাহ করল মুসলমান যুবক করিম খাঁকে।

কমলা মানসিক অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারল কীসের জোরে? এমন কী জোর ছিল তার যে হিন্দু-সম্প্রদায়গত ধর্মের ও বিবাহ সংস্কারের গণ্ডী সে পেরুতে পেরেছে?

এ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন ভালোবাসার সম্মানের ওপর। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ যদি পরস্পরের জন্য ভালোবাসার সম্মানের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন, হিন্দু কি মুসলমান এই প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয় না। নিজ

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর—
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

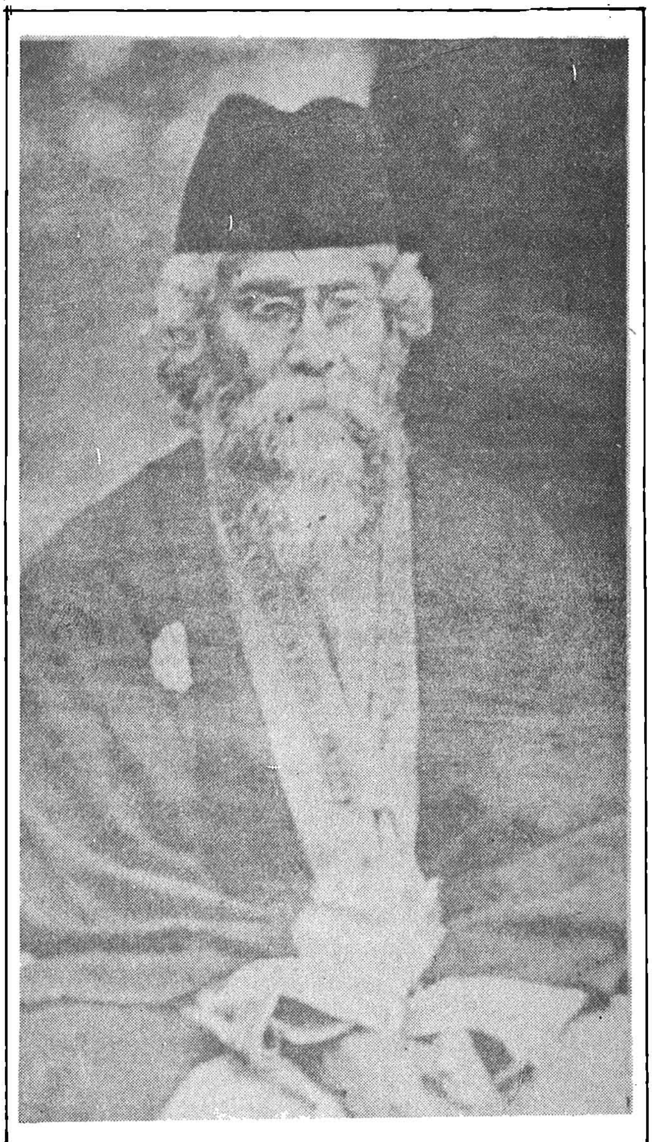
নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়েও তারা পরস্পরের আপন লোক হতে পারেন। ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে সম্প্রদায়গত ধর্মকে যখন নিবেদন করা যায়, মানুষ মিলনের আকাশ ও ভূখণ্ড খুঁজে পায়।

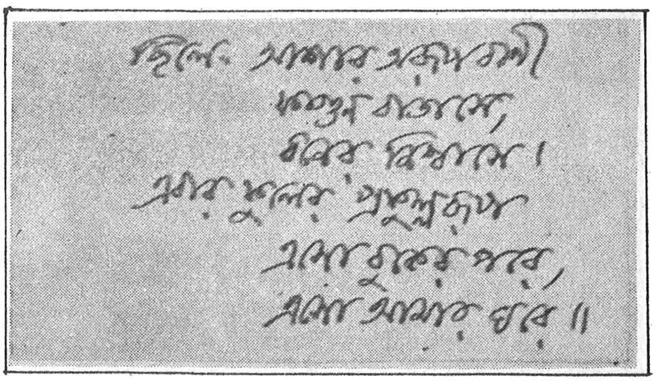
গল্পের নায়িকা কমলা হিন্দু-ব্রাহ্মণঘরের পিতৃমাতৃহীন কন্যা, কাকা কাকীমার ঘরে অনাদরে মানুষ। বিবাহের শেষে স্বামীর ঘরে যেতে পথে মুসলমান ডাকাতের হাতে আক্রান্ত হয় বরবধূ। বরপক্ষ প্রাণরক্ষার তাগিদে বধূ কমলাকে ফেলে পলায়ন করে। অসহায় কমলাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে আশ্রয় দেয় এক বড়ো মুসলমান হবির খাঁ। এই হবির খাঁর ঘরে কমলা প্রথম দেখল ধর্মবিশ্বাসের ঔদার্য, প্রথম পেল ভালোবাসার সম্মান। হিন্দুধর্মের পরিমণ্ডল কমলাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে। সে ধর্মের মধ্যে কমলা দেবতার প্রসন্নতা কোনো দিন পায় নি। পেয়েছে অসম্মান। হতভাগিনী মেয়ের জীবনেরও মূল্য যে আছে সে সত্য কমলা আবিষ্কার করল হবির খাঁর সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে। হিন্দুর ঘরে হোক মুসলমানের ঘরে হোক যেখানে এই জীবনধর্ম রয়েছে সেই ক্ষেত্রই মানুষের মিলনের ক্ষেত্র। বিবাহিতা হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যা যখন মুসলমানের ঘরে এই ঔদার্য দেখল সম্প্রদায়গত ধর্মের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙে যে হবির খাঁর পুত্র করিম খাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করল, "তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্মকর্ম ওর সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না—আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।" হবির খাঁ কমলাকে পুত্রবধূ ক'রে গ্রহণ করল—কমলার নাম হলো মেহেরজান। 'মেহেরজান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত শব্দপ্রয়োগ। শব্দটির অর্থ,—যে সময় দিনরাত সমান সমান। এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রশ্নটা নিয়ে খুব কম ভারতবাসীই রবীন্দ্রনাথের মতো নানা দিক থেকে ভেবেছেন। সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে এই ভাবনার অভাব বড়ো বেশি করে চোখে পড়ে। আমাদের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানকে নায়ক-নায়িকা ক'রে মেলামেশা, হৃদয় বিনিময়ের গল্প উপন্যাস নাটকের খুবই অভাব। খ্যাতনামা লেখকদের লেখায় ভালোবাসার সম্মানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের কাহিনী বিরল। এ ঘটনা লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতা প্রমাণ করছে, অসাম্প্রদায়িক হবার ঔদার্যের ও সাহসের অভাব প্রমাণ করছে। সবচেয়ে বড়ো যে কথাটা প্রমাণ করছে তা হলো, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের আবশ্যকতার প্রশ্নটা নিয়ে লেখকদের খুবই বড়ো রকমের কিছু যে করার আছে, সমস্ত হৃদয়মনবুদ্ধি দিয়ে তারা তা ভাবতে পারেন নি। আমাদের ভাবনার ক্ষেত্রে এই অভাব রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে একথা তিনি উল্লেখও করেছেন। সেই ক্ষোভের উত্তর মৃত্যুশয্যায় তিনি নিজেই দিয়েছেন এই গল্পটিতে। আমাদের সাহিত্যে এ গল্প স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত, অগ্রসর সাহসী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

রক্ষণশীল হিন্দু এবং মুসলমানরা এই গল্পটিকে নিশ্চয়ই ভালো মনে নেন নি। তারা রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই পছন্দ করেন নি। হিন্দু-মুলসমান লেখকরাও রবীন্দ্রনাথকে কম বিড়ম্বিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় তারা নীতিহীনতা, অধর্ম ও পাপাচরণের সমর্থন লক্ষ্য করেছেন। এই গল্পটির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমার জানা নেই; তবে বহুবছর ধরে গল্পটির অপ্রকাশিত থাকার ঘটনা থেকে অনেক কথাই মনে হতে পারে।

সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যতো বয়স বেড়েছে ততোই তিনি সংস্কারমুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি। নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো ক'রে





দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে বুদ্ধদেব বসুর এই কথাগুলি উজ্জ্বলভাবে প্রতিপন্ন করেছে এই গল্পটি।

ধর্ম তথা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানুষ প্রকৃত আধুনিক মানুষ। রবীন্দ্রনাথ সর্বোত্তম আধুনিক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে আধুনিক মনের কাছে এই মুসলমানী গল্প-টি বড়ো রকমের একটি জিজ্ঞাসা।

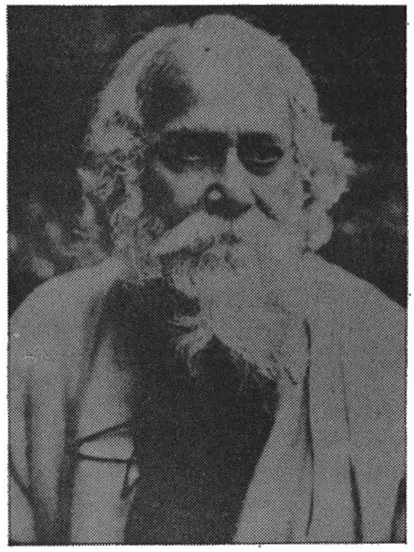


রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী (৭ম শতাব্দী) তাঁর কাব্যাদর্শে নানারূপ পদ্য রচনার মধ্যে কাব্যকোষের উল্লেখ করেছেন (১, ১৩)। বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৪শ শতাব্দী) তাঁর ‘সাহিত্য-দর্পণ’ গ্রন্থে কাব্যকোষ বা কোষকাব্য সম্বন্ধে লিখেছেন যে এই শ্রেণীর রচনায় বিভিন্ন কাব্য থেকে অন্য নিরপেক্ষ শ্লোক বেছে নিয়ে এইগুলি ভাব বা রস অনুযায়ী বিভিন্ন ‘প্রজ্যা’ বিভাগে সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দী থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে কোষকাব্যের প্রচলন ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের কোষকাব্যগুলির মধ্যে সুভাষিত রত্নকোষ (১১শ শতাব্দী), সদুক্তি কর্ণামৃত (১৩শ শতাব্দী), সুভাষিত মুক্তাবলী (১৩শ শতাব্দী), শারঙ্গধর পদ্ধতি (১৪শ শতাব্দী), সুভাষিতাবলী (১৫শ শতাব্দী), পদ্য বেণী (১৭শ শতাব্দী), পদ্যামৃত তরঙ্গিনী (১৭শ শতাব্দী), সুভাষিত হারাবলী (১৭শ শতাব্দী) ও পদ্যাবলী (১৬শ শতাব্দী) সংগ্রহ-কাব্যের নাম সুপরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে এই ধরনের সুভাষিত সঙ্কলনের কাজ ১৮শ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও চলেছে। দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কবিরাজের কাব্যাদর্শ ও সাহিত্য দর্পণে কোষকাব্য বা কাব্যকোষে যে ধরনের সংগ্রহের কথা উল্লেখিত হয়েছে—সেগুলিতে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন কবির কাব্যাংশ সঙ্কলনের কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের কাব্যকোষ ছাড়াও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় আর এক ধরনের কাব্যসংগ্রহ প্রচলিত ছিল। এগুলি ছিল একক কবির রচনা—যেমন সপ্তম শতাব্দীর ভর্তৃহরি কর্তৃক বিরচিত নীতি শতক, বৈরাগ্য শতক ও শৃঙ্গার শতক। এগুলির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এর প্রত্যেকটিতে ১০০ শতটি করে কবিতা আছে। কবিতাগুলির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এগুলি যথাক্রমে নীতি, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার বিষয়ক কবিতা। এক একটি পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের বৈচিত্র্য আছে। অমরু ৮ম শতাব্দীতে অমরু শতক রচনা করেন। বিল্‌হন (১১-১২শ শতাব্দীতে) রচিত চৌর-পঞ্চাশিকা পঞ্চাশটি শৃঙ্গারত্মক কবিতার সঙ্কলন। চাণক্য-শ্লোক (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী), বররুচি (৭ম শতাব্দী) সঙ্কলিত নীতিব্রত ঘটকর্পর (৪র্থ-৫ম শতাব্দী) প্রণীত নীতিসার এই শ্রেণীর রচনা। এই জাতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আরও অনেক পাওয়া যায়।

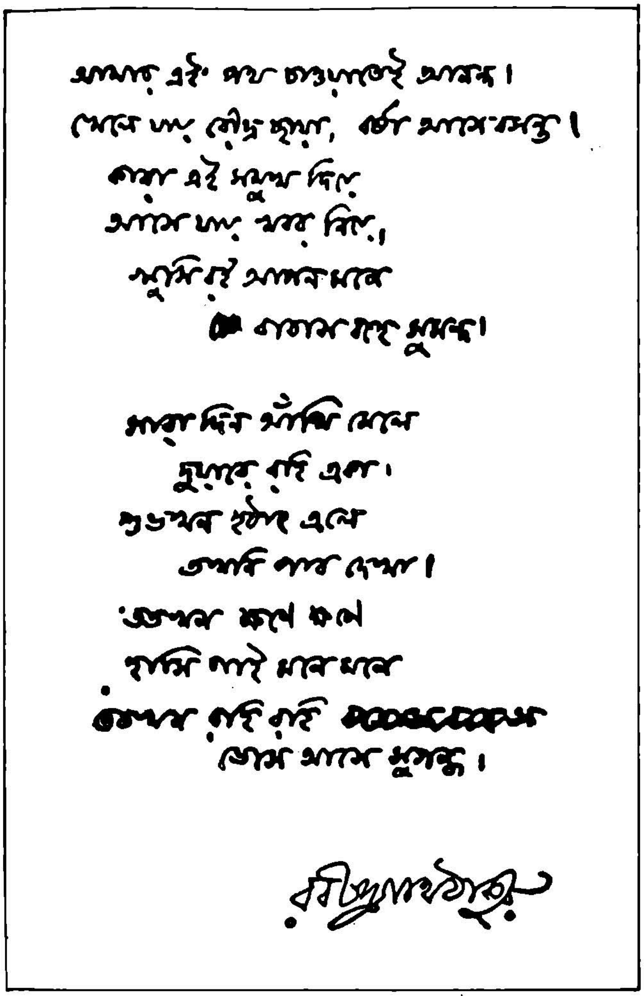
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিশালী জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে জন্মেছিলেন—১৮৬১ খৃস্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। কিন্তু তাঁর মন কোনদিন গজদন্তমিনারে আবদ্ধ থাকতে পারে নি। অভিজাত পরিবারে জাত ও বর্ধিত তাঁর আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক ও পরিচারক-পরিচারিকাবৃন্দ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রতিভাধর সন্তানদের কাছে যাতায়াতকারী বহুজনের চরিত্র, তাঁর শিশু ও কিশোর মনে প্রভাব ফেলেছিল। ভৃত্য-রাজকতন্ত্র, নর্মাল স্কুল, গঙ্গানদী তীরে পেনেটিতে প্রথম কলকাতা ছেড়ে বাস, তারও বহু পরে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা, প্রত্যাবর্তন, গৃহে শিক্ষক মহাশয়দের নিকট ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ, আমেদাবাদে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট মাস ছয়েক বাসের পর ১৭ বৎসর বয়সে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা ও লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগদান, দেশে প্রত্যাবর্তন ও ২৩ বৎসর বয়সে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ (১৮৮৪-৮৫)। এখানেই



কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

তাঁর জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়েছে। ১২-১৩ বয়সের মধ্যেই তাঁর মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়, অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনায় লিপ্ত হন—তখনও তাঁর তের বৎসর বয়স হয়নি। ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত হিন্দুমেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে একটি স্বদেশ- প্রেমাত্মক কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' পাঠ করে সমাগত বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইটিই সর্বপ্রথম তাঁর স্বনামে প্রকাশিত কবিতা। এর পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্ঞানাঙ্কুর ও ভারতীতে কবিতা ও সেই সঙ্গে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখতে শুরু করেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি নিয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ কাব্যোপন্যাস 'কবি কাহিনী' ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃস্টাব্দ বা ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই শতকের মধ্যে তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির



নাম—বনফুল, (আখ্যানকাব্য, কাব্যোপন্যাস, ১৮৮০), বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য, ১৮৮১), ভগ্নহৃদয় (নাট্যকাব্য, ১৮৮১-৮২), য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (পত্রাবলী, ১৮৮১-৮২), সন্ধ্যাসঙ্গীত (কাব্য, ১৮৮১-৮২), কালমৃগয়া (গীতিনাট্য, ১৮৮২), বউঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস, ১৮৮৩-৮৪), প্রভাত সঙ্গীত (কাব্য, ১৮৮৩-৮৪), বিবিধ প্রবন্ধ (প্রবন্ধ, ১৮৮৩-৮৪), ছবি ও গান (কাব্য, ১৮৮৩-৮৪), প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্যকাব্য, ১২৯১), নলিনী (গদ্যনাট্য, ১৮৮৪-৮৫), শৈশব সঙ্গীত (কবিতা, ১৮৮৪-৮৫), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (কবিতা, ১৮৮৪-৮৫), রামমোহন রায় প্রবন্ধ, ১৮৮৪-৮৫), আলোচনা (প্রবন্ধ, ১২৯২), রবিচ্ছায়া (প্রথম সঙ্গীত সংগ্রহ, ১৮৮৫), কড়ি ও কোমল (কবিতা, ১৮৮৬-৮৭), রাজর্ষি উপন্যাস, ১৮৮৬-৮৭), সমালোচনা (প্রবন্ধ, ১৮৮৮), মায়ার খেলা



(গীতিনাট্য, ১৮৮৮), রাজা ও রাণী (নাট্যকাব্য, ১৮৮৯), বিসর্জন (নাট্যকাব্য, ১৮৯০), মানসী (কবিতা, ১৮৯০), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (১ম খণ্ড, ভ্রমণ-কাহিনী, ১৮৯১), চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য, ১৮৯২), গোড়ায় গলদ (প্রহসন, ১৮৯২), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (২য় খণ্ড, ১৮৯৩-৯৪), সোনার তরী (কবিতা, ১৮৯৩-৯৪), ছোটগল্প (১৮৯৩-৯৪), বিচিত্র গল্প (১ম ভাগ) ও কথাচতুষ্টয় (পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত), গল্পদশক (১৮৯৫-৯৬), নদী (কাব্য, পরে শিশুগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, ১৮৯৫-৯৬), চিত্রা (কবিতা, ১৮৯৫-৯৬), বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন, ১৮৯৭), চৈতালি (কবিতা, কাব্যগ্রন্থাবলীর সঙ্গে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), পঞ্চভূত (প্রবন্ধ, ১৮৯৭)।

উপরোক্ত কাব্য-নাটক-উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন কবির বয়স ৩৭ বৎসর। এই সময়ের মধ্যেই তাঁর যশঃসূর্য মধ্যগগনে উঠে গিয়েছে। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পড়ে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে কোন একটি নিমন্ত্রণ সভায় নিজ কণ্ঠ থেকে পুষ্পমাল্য খুলে নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে গিয়েছেন। তখনকার দিনের শ্রুতকীর্তি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যদুনাথ সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সময়ের মধ্যেই তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর প্রাথমিক পর্বের রচনাগুলি উচ্চাঙ্গের হয়নি বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'কড়ি ও কোমল' থেকে তাঁর "কাব্য ভূস্থানে ডাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-চরিত্র গঠিত করে নিয়েছেন, যদিও তিনি এগুলিকে সাহিত্যে মর্যাদা দিতে চান নি। রবীন্দ্রকাব্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ, ভাব-কল্পনা, ছন্দ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অতুলনীয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলিই এই কাব্যগ্রন্থগুলিতেই গ্রথিত আছে। কবিখ্যাতির উচ্চ চূড়ায় আসীন রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লিখে প্রকাশ করলেন—একটি ছোট কবিতার বই 'কণিকা'। এই ১১০টি কবিতা সমন্বিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদের পূর্ব-কথিত 'সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহে'র ধারায় রচিত। এই কবিতাগুচ্ছে তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ-হিল্লোল, বাক্-বৈদগ্ধ, সৌন্দর্য-চেতনা, কল্পনাকারুতা প্রভৃতি গুণগুলি অনুপস্থিত। তাই সাধারণভাবে এটি রবীন্দ্র-কাব্য বোদ্ধা বা সমালোচকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার কবিতাগুচ্ছকে রবীন্দ্র-কাব্যের উপেক্ষিতা বলা যেতে পারে। তবে নানাদিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে—যে এটি কবির জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ বহু চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। সাধারণ মানুষের ধারণা জগৎসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত কবির জীবন ছিল কুসুমাস্তীর্ণ, বাস্তবের রূঢ় কঠোর যন্ত্রণাগুলি তাঁকে সহ্য করতে হয় নি, কবির ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন সাধারণ মানুষের জীবনে যত দুঃখ ও আঘাত আসে কবিকে ব্যক্তিগত জীবনে তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ ও আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। কবি তাঁর একটি কবিতায় কবি কালিদাসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

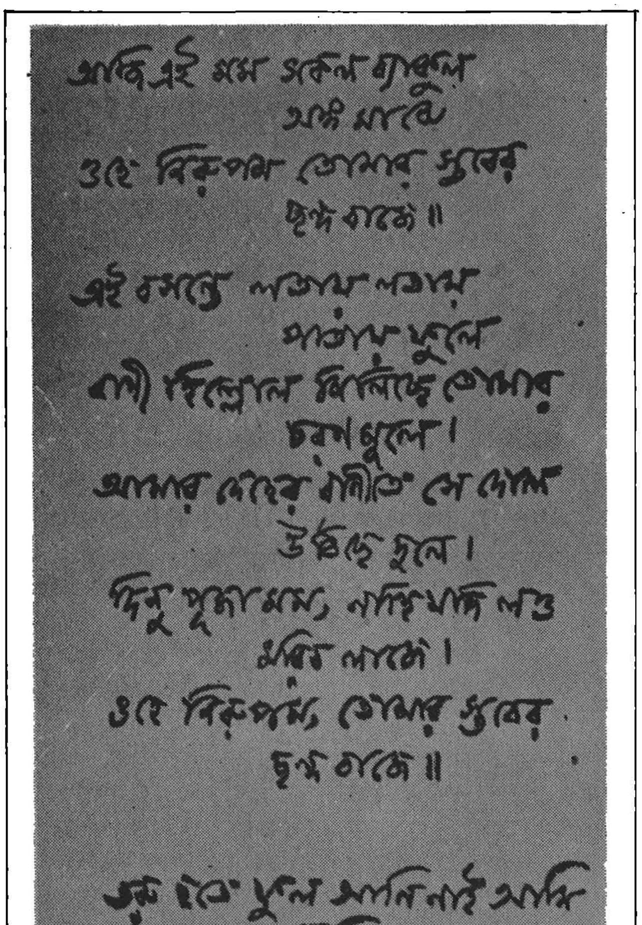
"তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ আমাদেরই মত
হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা, ষড়যন্ত্র, আঘাত গোপন?
কখনো কি সহ নাই অপমান ভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার।
অভাব, কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনও কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি
তবু সে সবার ঊর্ধে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য কমল
আনন্দের সূর্যপানে। তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই,
জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল, করে গেছ দান।"

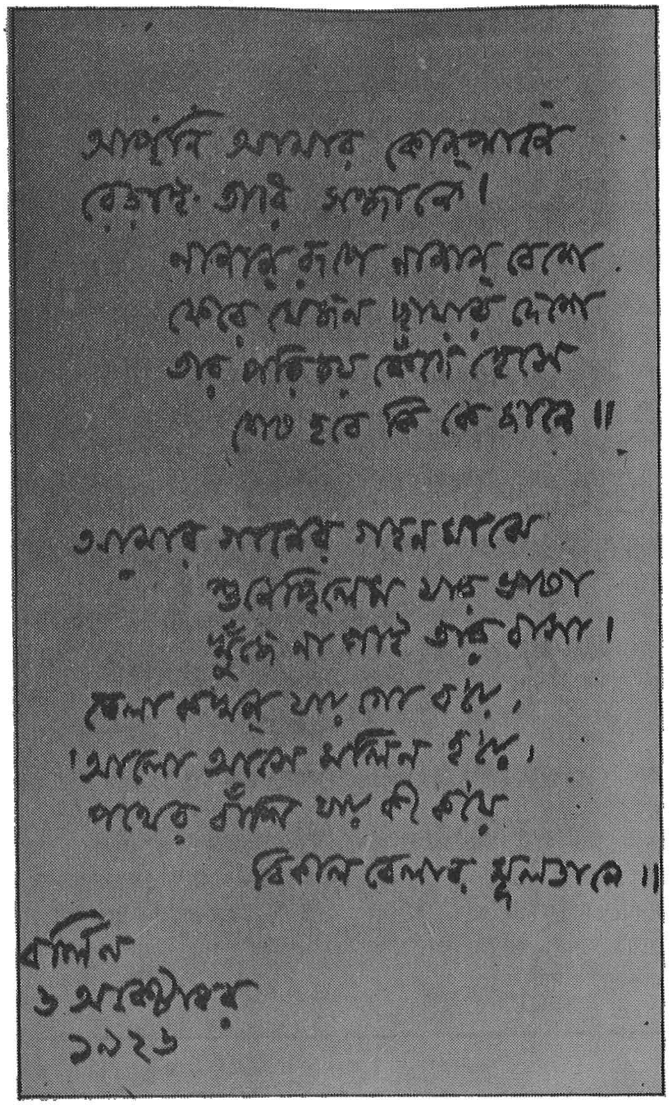
(কাব্য, চৈতালি, ১৩০৩)

কালিদাসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই কবিতাটি তাঁর নিজের প্রতিও প্রযোজ্য। জীবন-মন্থন বিষ নিজে পান করে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর কাব্যসাহিত্যের সুধাপাত্র ধরে দিয়ে গিয়েছেন। এই কবিতায় যে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, দুঃখ, ষড়যন্ত্র, গোপন-আঘাত, অপমান, অনাদর, অবিশ্বাস ও অন্যায় বিচারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, কবির ভাগ্যে তার সব কটিই জুটেছিল। পড়বার সময় মনে হয় ব্যবহৃত এই কটি শব্দের বাস্তব সূচি-মুখ কবির দেহমনকেও বিদ্ধ করেছিল, তা নইলে এমনভাবে এই নিষ্ঠুর শব্দগুলি কবি ব্যবহার করতে পারতেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর পিতাকে নানা কাজে সহায়তা করার ভার পান। ১৮৮৪ থেকে পিতার ইচ্ছায় তাঁকে অবিভক্ত বঙ্গের উত্তরভাগে তাঁদের পারিবারিক জমিদারি পরিদর্শনের কাজে লিপ্ত থাকতে হয়। ১৮91 থেকে প্রায় দশ বৎসর তিনি প্রায় স্থায়ীভাবেই জমিদারি কাজ উপলক্ষে শিলাইদহ, সাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করতে থাকেন, এর মধ্যে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ সেরে এসেছিলেন। ১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে প্রধানত পুত্র রথীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য অন্য কয়েকটি বালক শিক্ষার্থী নিয়ে শান্তিনিকেতনে ১৯০১ খৃস্টাব্দে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এটিই পরবর্তীকালে ১৯২১ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়।

১৩০৬ (১৮৯৯??)-এ প্রকাশিত কণিকায় তাঁর ৩৮-৩৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাই ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। মানব-মনের গভীরে যে ঈর্ষা-দ্বেষ, দম্ভ, আত্ম-সন্তুষ্টি, মাৎসর্য প্রভৃতি ভাবনাগুলি বর্তমান কবি সেই ভাবনাগুলিকে অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় কণিকায় প্রকাশ করেছেন। কবি-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল শিখাবঞ্চিত কণিকা পয়ার ছন্দে রচিত, দুই, চার, ছয় বড়জোর দশ পংক্তি পর্যন্ত এর বিস্তার। এই কবিতাগুলি কতকটা আমাদের বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও খনার বচনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যের মধ্যেও এই ধরনের কতকগুলি পংক্তি আছে, যেমন "বড় পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর" ইত্যাদি। তবে সেগুলি মূল কাহিনীসূত্রেই লিখিত, নিরপেক্ষ নয়। রবীন্দ্র-জীবনী পাঠ করলে কণিকা রচনার পৃষ্ঠভূমিটি জানা যায়। জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণে রত এমন সময়ে ১৩০২ বঙ্গাব্দে কবির দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের (সত্যেন্দ্রনাথ পুত্র) ও বলেন্দ্রনাথ (বীরেন্দ্রনাথের পুত্র) কুষ্ঠিয়াতে




আপনি আমার কোনখানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান রূপে নানান বেশে
ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কোথায় এসে
শেষ হবে কি কে জানে॥

আমার মনের গহন মাঝে
শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা শেষের যায় যে বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকালবেলার মূলতানে॥

বার্লিন
৬ আক্টোবর
১৯২৬

ব্যবসায়ের জন্য একটি কুঠি (firm) খোলেন। অর্থ, উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে কবি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে অগ্রসর হন। এর পর বলেন্দ্রনাথ গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে বিশেষভাবে আঘাত পান। ঠাকুর কোং-এর কলকাতায় একটি আপিস ছিল, বলেন্দ্রনাথের পীড়ার সুযোগে একজন কর্মচারী তহবিল তছরূপ করার পর দেখা গেল—কোম্পানীর ৭০-৮০ হাজার টাকা দেনা আছে। এই দেনা শোধের ভার শেষ পর্যন্ত কবির উপর পড়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে এবং মাড়োয়ারী মহাজনদের কাছে ধার নিয়ে কবি কোম্পানীর ধার মিটিয়ে নিজে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। জমিদারি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজের হিসাবনিকাশ, বলেন্দ্রনাথের পীড়াজনিত উদ্বেগ অতঃপর তাঁর মৃত্যু-শোক, পুত্রকন্যাদের শিলাইদহে রেখে তাদের শিক্ষার সমস্যা, এদিকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রায়শই তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আক্রমণ এইসব নানা কারণে এ সময় কবির সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে মানসিক প্রশান্তি ও অবসরের প্রয়োজন তা তাঁর পক্ষে দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। এই সময় অবসর পেলেই কণিকার ছোট ছোট কবিতাগুলি তিনি লিখে যেতে থাকেন। দীর্ঘ রচনার অবকাশ পেতেন না। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভক্ত ও সহচর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এগুলিকে এপিগ্রাম আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন। "এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব এই যে অতি সহজ সত্যকে বহু বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে অল্প ভাষায় প্রকাশ করা। যাহা সাধারণ তাহাকে অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার গভীর তত্ত্ব অতি অল্পকথায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা... কণিকার কবিতাগুলিকে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কবি সকলের জানা কথাকে কবিত্ব- মণ্ডিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং উপমা রূপক শ্লেষ ও বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া এমন একটি আকস্মিক বিস্ময় পাঠকের ও শ্রোতার মনে উৎপাদন করেন যে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির, গভীর জ্ঞানের, কৌতুকের, কৌশলের এবং নিপুণ শ্লেষ- পটুতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় (রবিরশ্মি পৃঃ ৩৭৮)। কণিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কণিকার মধ্যে যে সব তত্ত্ব কবিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লব্ধ সত্য। আমাদের মনে হয়, ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া যে অভিজ্ঞতা যাহাকে প্রায় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা বলা যাইত তাহাই যেন বিদ্রূপের ভাষায় রূপ পাইয়াছে। পার্থিব সত্যের দিক্ হইতে পৃথিবীর সেরা epigram-এর সহিত এগুলির তুলনা করা যায়, এমন কি চাণক্য মুনির লেখা বলিয়া যাহা চলিত আছে তাহার সঙ্গে তুলনায় কণিকার সত্যোক্তিগুলির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইবে না। (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৩) ১৩০৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর নামে উৎসর্গীকৃত কণিকায় মোট ১১০ টি কবিতা আছে। এইগুলি দুই থেকে দশ পংক্তির মধ্যে রচিত, সব কথা আগেই বলা হয়েছে এবার কণিকার কয়েকটি মাত্র কবিতা আলোচনা করা যেতে পারে সব কবিতাই উদ্ধৃতিযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে তা করা সম্ভব নয়।

কণিকার প্রথম কবিতাটির নাম 'যথার্থ আপন,' এটি উদ্ধৃত করা হ'লঃ—

"কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড়ো অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্র-তারকারে করে ভাই ভাই।

ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে।
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য তার কেহ নয় সবি তার মাটি।"

নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট থাকার পরিণাম পাওয়া যাবে 'অকর্মার বিভ্রাট' কবিতায়—

"লাউল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়া গলা,
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা,
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি।
ফলা কহে, ভালো ভাই আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কী আরামে থাক ঘরে বসে।
ফলাখানা টুটে গেল, হাল খানা তাই,
খুশি হয়ে পড়ে থাকে কোন কর্ম নাই।
চাষা বলে এ আপদ আর যেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।
হাল্ বলে, ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে
খাটুনি যে ভাল ছিল জ্বলুনির চেয়ে।"

অমনি আর একটি কবিতা 'নূতন চাল'। ধনীপ্রভুর ঘরে অনেকগুলি ঘোড়া আর একটি মহিষ আছে। ঘোড়াদের দলন-মলনের জন্য সহিস আছে, মহিষের ও সহিস ও দলন-মলন চাই, তাই সে গোহাল ঘরে দাপাদাপি করতে লাগল, তখন গৃহকর্তা তার মনের ইচ্ছা বুঝে দশজন লোক রেখে তার দলন-মলন শুরু করিয়ে দিলেন, মহিষ এই দলন-মলন সহ্য না করতে পেরে সে কেঁদে প্রভুকে বললে—

"সহিসের হাত হতে দাও অব্যাহতি
দলন মলনটার বাড়াবাড়ি অতি।"

মানুষের দম্ভ সীমাহীন, নিজে যেমনই হোক সে অন্যকে ছোট করে দেখে, আবার তার চেয়ে যারা বড় তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে চাই। 'সাম্যনীতি' কবিতায় ভিক্ষার ঝুলি টাকার তোড়ার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে চায়, সে আদান-প্রদান চায় এই বলে যে তার সঙ্গে তোড়ার থোড়াই প্রভেদ, অতঃপর—"তোড়া কহে রেগে, সে থোড়া প্রভেদটুকু ঘুচে যাক আগে।" 'কুটুম্বিতা বিচার' কবিতায় এমনি দম্ভ অথচ বড়র সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের মনোভাব দেখা দিয়েছে—

"কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে এসো মোর দাদা।"

'সমালোচক' কবিতায় কানাকড়ি টাকাটিকে এই বলে বিদ্রূপের করছে যে সে পাঁচসিকে নয়, ষোলো আনা মাত্র. কাজেই তার চেয়ে কি এমন মহত্তর। তখন— "টাকা কয়, আমি তাই মূল্য মোর যথা। তোমার যা মূল্য তার চেয়ে বেশী কথা।"

মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, সে আর কিছু হতে চায়—অথচ তার সামর্থ্য নেই, অন্যের প্রতি তার ঈর্ষা। 'প্রবীণ ও নবীন' কবিতায় কাঁচা চুল, পাকা চুলের প্রতি ঈর্ষান্বিত, কারণ সে সকলের কাছে মান পায়। বুঝিয়ে দিচ্ছে, সেই অর্থাৎ কাঁচা চুলই ভাল কারণ তার যৌবন আছে ও আর তার শেষ অবস্থা "পাকা চুল চুল বলে মান সব লও বাছা, আমারে কেবল তুমি দাও করে কাঁচা।" 'অসম্ভব ভালো' কবিতায় যথাসাধ্য ভাল'র ব্যাকুলতা যে সে অসম্ভব ভালো কেন হতে পারছে না। তখন অসম্ভব ভালোর উক্তি—"আরো ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায় অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়", সুতরাং যথাসাধ্য ভালো'র ক্ষোভ অনুচিত। অন্যের দোষ ভুল ধরা মানুষের স্বভাব। টিকি মাথায় থাকে, হাত পা কাজ করে, তারা অনেক সময় ভুলও করে, টিকির ধমকানিতে ওদের উত্তর "হে অভ্রান্ত চুল, কাজ করি আমরা যে তাই করি ভুল।" (কৃতীর প্রমাদ) 'স্বাধীনতা' কবিতায় শর ভাবছে আমি স্বাধীন, ছুটে চলি, ধনুকটা শুধু বদ্ধ। তাকে শর ব্যঙ্গ করছে, তখন "ধনু হেসে বলে, শর জান না সে কথা—আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।" 'অযোগ্যের পরিহাস' কবিতায় নক্ষত্র খসে পড়ায় প্রদীপ তার পতন দেখে হেসে মরছে, তখন রাত্রি বলছে কারও পতন দেখে উপহাস উচিত নয় "হেসে নাও, বলে নাও সুখে। যতক্ষণ তেলটুকু নাহি নায় চুকে।"

'অসাধ্য চেষ্টায়' বলা হয়েছে—"শক্তি যার নাই নিজে বড় হইবারে, বড়োকে করিতে ছোট তাই সে কি পারে।" 'অকৃতজ্ঞ' কবিতায় বলা হয়েছে "ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।" 'ক্ষুদ্রের দম্ভ' কবিতায় বলা হয়েছে "শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।" সাংসারিক মানুষের ক্ষোভ, দুরন্ত-বাসনা ও আত্ম-সন্তোষের প্রসঙ্গে কণিকার অনেকগুলি কবিতা ভাস্বর। চকোরি এক অজানা আশঙ্কায় ভুগছে। সে পণ্ডিতদের কাছে শুনেছে চাঁদ একদিন আর থাকবে না। চাঁদের অভাবে সে কিভাবে বাঁচবে এই চিন্তায় তার এই আকুল প্রশ্ন, "হায় হায় সুধাকর হায় নিশাপতি, তা হইলে আমাদের কি হইবে গতি।" তখন চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া, তোমার কতটা আয়ু যাও শুধাইয়া," (অসম্পূর্ণ সংবাদ)। 'মোহ' কবিতায় বলা হয়েছে "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস। নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।" মানুষ অনেক কিছু চায় কিন্তু পায় না, কিন্তু সেই তার অবস্থার সৃষ্টি করে। সে অদৃষ্টকে প্রশ্ন করে—

"অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে, অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে? সে কহিল ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি, সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি"(চালক)। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বারে বারে মৃত্যুর কথা ফিরে এসেছে, কণিকার মত ক্ষুদ্র পুস্তকেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মৃত্যুকে তিনি শেষ কথা বলে মানেন নি। কণিকায় এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন 'জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা, যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা, পা ফেলা" (জীবন)। "দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়—আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়। নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন, আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।" (চির নবীনতা)। আবার বলেছেন—"ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়, মুহূর্তে নিখিল তব হয়ে যেত লয়। তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তব বক্ষে কোলে, জগৎ শিশুর মত নিত্যকাল দোলে। (মৃত্যু)।। কণিকার রচনায় বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার একটি সঙ্কলন 'লেখন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

মনের বিভ্রান্ত অবস্থায় নানাবিধ কর্মভারে বিব্রত, ঋণ-ভারক্লিষ্ট কবি, হয়ত হেলাভরে, খেলার ছলে কণিকায় সন্নিবিষ্ট ১১০টি ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিলেন। তবে আমাদের মনে হয় অযত্নপ্রসূত এই কবিতা-কুসুমগুলির প্রতি তাঁর মমতা ছিল। বহুজন সমাদৃত ও বহুখ্যাত বহু কবিতা বর্জন করে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রথম সঙ্কলিত 'সঞ্চয়িতা' কাব্যসংগ্রহে কণিকার বাইশটি কবিতাকে এতে স্থান দিয়েছিলেন। বস্তুত 'কণিকা'র কবিতাগুলি রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের অভিনিবেশ দাবী করতে পারে।





রবীন্দ্রনাথ ঃ দেশভাবনা ও বিশ্বভাবনা

অনঙ্গ রুদ্র

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, জীবনে যুগান্তকারী কাল হিসাবে চিহ্নিত। শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্তী কাল দেশের জীবনে এনেছিল অনাস্বাদিত পূর্ব বোধ ও গতি। নবজাগরণের ফলে তখন নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করেছে। প্রায় শতাব্দীকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেও জাগিয়ে তুলেছে। যুক্তির নিরিখে ধর্ম, সংস্কার, আচার ইত্যাদিকে বিচার করে শুরু হয়েছে গ্রহণ-বর্জনের পালা। নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার বোধ আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে নানাভাবে। এইরকম সময়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে সেই কালকে স্মরণ করে কবি তাঁর 'দি রিলিজিয়ান্ অফ্ ম্যান্ আর্টিস্ট'রচনায় বলেছেন, তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন দেশে তিনটি বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত ছিল। এই তিনধারা তাঁর মতে ধর্মবিপ্লব, সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের ধারা। ধর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় অচল-আয়তনকে ভাঙার কাজ তখন চলছে; সাহিত্যে পুরাতনের অনুবর্তন ভেঙে শুরু হয়েছে মানব-কেন্দ্রিক নতুন নতুন ধারা; রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু বিদ্রোহী আন্দোলনের সঙ্গে সদ্য ঘটে গেছে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে চিহ্নিত ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। এইরকম একটি কালে জন্মগ্রহণ করে তারই জল-হাওয়ায় বর্ধিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে সে-প্রভাব হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। তার প্রমাণ মেলে তাঁর দীর্ঘ জীবনের কর্মে ও সাহিত্যে।

একদা রবীন্দ্রনাথ ডক্টর কালিদাস নাগকে 'হিন্দু-মুসলমান' মিলনের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক পত্রে লিখেছিলেন, "ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেছি...হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে—শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।"—এমনি করে বারে বারে কবিকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে 'মানব-ইতিহাসের মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলীর' জবাব দিতে। মানব-প্রেমিক কবির চরিত্রের একটি দিক্ যেমন 'কোমলতা-দুর্বলতা-মাখা' মর্ত্য-মানবের প্রতি গভীর মমত্ববোধে মধুর তেমনি আর একটি দিক্ মানবতা-বিরোধী সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রদীপ্ত। মানুষকে ভালোবাসতে তিনি যেমন কোনো দেশ-কালের সীমাকে মানেননি, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদেও দেশ-কাল-পাত্রের কোনো পরিচয় তাঁকে সংকুচিত করেনি। রেনেসাঁস্-যুগের সব মহৎ শক্তিকেই তিনি সার্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর সারস্বত সাধনায় যেমন অভিনব দিক্গুলি উন্মোচিত হলো। মনুষ্যত্বের সাধনায় তেমনি তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নিতান্ত অল্পবয়স থেকেই গভীর যুক্তিনিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। দেশের সমস্ত সামাজিক কুসংস্কার ও কু-আচার সম্পর্কে, এদেশে ইংরেজ শাসকদের হিংস্রতা ও শোষণের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর যে-কোনো অংশে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও মানব-কল্যাণের পক্ষে কবি নিরলসভাবে লেখনী চালিয়েছেন। যাকে ন্যায়



নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে,
সে আমার রচেছিল জন্মদিন—
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
দুপুর

ও সত্য বলে তিনি উপলব্ধি করেছেন, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উদাত্ত কণ্ঠে তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কোনো ভয় বা মোহ তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আইনস্টাইন্ তাঁর সম্বন্ধে সার্থকভাবেই বলেছিলেন—'আপনি মানুষের হিংস্র রূপ দেখেছেন, স্বার্থ ও লোভের হানাহানির আপনি সাক্ষী। আবার আপনি ধ্যানের স্তব্ধতায় ডুবে গেছেন—সৃষ্টি করেছেন অনুপম সৌন্দর্যরাশি। আপনার দীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবন মানবকল্যাণ সাধনেরই একটানা ইতিহাস। আপনার দেশের প্রাচীন দ্রষ্টাদের মতো আপনিও আপনার মহান্ আদর্শ, সুশান্ত স্বাধীন চিন্তা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করেছেন।"

'নৈবেদ্য' কাব্যের একটি কবিতায় কবি লিখেছিলেন,

"যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি,' ওঠে খর খড়্গসম...।"

তাঁর সারা জীবনের চিন্তায়, কর্মে, সাহিত্যে এই সত্য-সাধনা উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে তাঁর রচনার বহু-পরিচিত পংক্তি দুটি—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সর্বত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠ ধিক্কার জানিয়েছে। কবির এই মানসিকতার পরিচয়কে সযত্নে পরিহার করে দীর্ঘকাল তাঁকে মিস্টিক কবি বলেই দেশে-বিদেশে পরিচিত করার চেষ্টা হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, বিশ্বভারতীতেও কবির সত্যসন্ধ পৌরুষকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর রহস্যবাদিতাকেই বড়ো করে তুলে ধরার চেষ্টা প্রাধান্য পেয়ে আসছে। অথচ কবিজীবনের সর্বাঙ্গীন অনুশীলনে তাঁর চরিত্রের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যটিই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

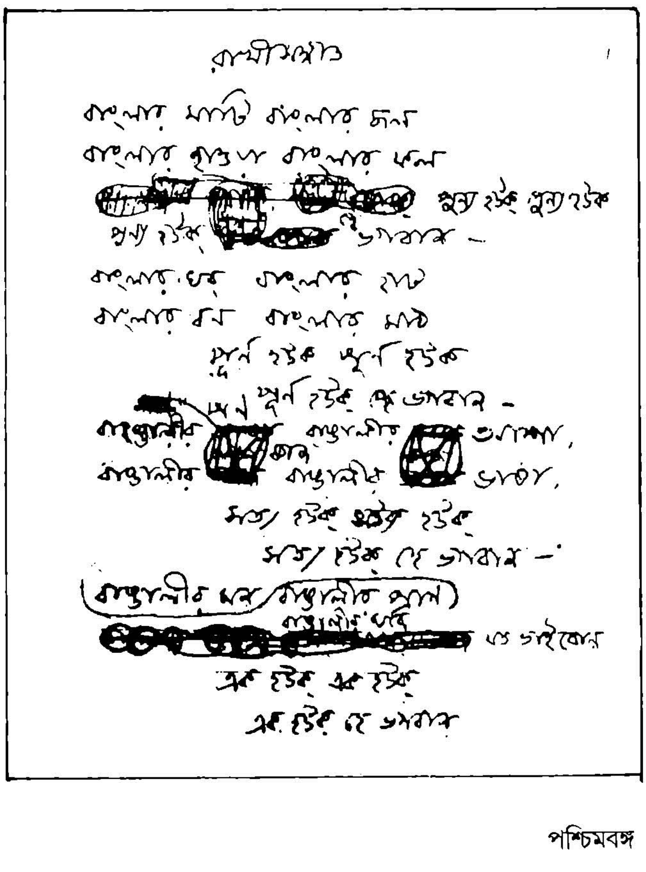
কবির বাল্যকালে এদেশে যখন স্বাদেশিকতার উন্মেষপর্ব, যখন একদিকে দেশপ্রেমের ভাববাষ্পের বিস্তার এবং অন্যদিকে ইংরেজ-প্রশস্তি, সেই সময় কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজ ও তার অনুগ্রহ-লোভী সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ যখন এ-দেশের বড়োলাট, দিল্লীতে মহা আড়ম্বর এক দরবার হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতেশ্বরী' উপাধিতে ভূষিত করার কথা ঘোষণা উপলক্ষে। ভারতের দেশীয় রাজারা ঐ দরবারে ইংরেজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধা-লোভী একাংশও এই উপলক্ষে উল্লাস প্রকাশ করে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। বালক রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই বৃটিশভক্তিকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন—

"বৃটিশরাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া
বৃটিশ চরণে লোটাতে শির—
বৃটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায়গাক্ আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি,
আমরা ধরিব আর এক তান।[১]"—

বালক-কবির এই নির্ভয় তেজস্বিতা সে-যুগের পক্ষে যে কতখানি তা পরবর্তী যুগের অবস্থায় অনুভব করা কঠিন। কিন্তু 'হিন্দুমেলা'য় পঠিত এই কবিতাটিতে কবির পরিণত পৌরুষ ও স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রতিশ্রুতি অনুভব করা যায়। কবির বয়স যখন কুড়ি বছর (১৮৮১), সেই সময় ফিরিঙ্গি কাগজ 'ইংলিশ ম্যান' ভারতীয়দের সম্বন্ধে লেখে, "Kick them first and then speak to them." এই অপমানকর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) পত্রিকায় 'জুতা ব্যবস্থা' নামে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধ লিখলেন।

কংগ্রেসের জন্মের অব্যবহিত আগের যুগে এদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়, তাকে তখনই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ভিক্ষাবৃত্তি'। বস্তুতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের এই ভিক্ষাবৃত্তির ধারা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের পরও কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে দীর্ঘদিন অনুসৃত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশের এই রাজনৈতিক নেতাদেরও গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। ১২৯০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী'তে কবি লেখেন—"আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।......ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা পাইয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না।....গবর্ণমেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।"—এর ঠিক দু'মাস পরে 'ভারতী'তে 'টৌনহলের তামাশা' রচনায় ইংরেজ তোষণকারী স্ব-ঘোষিত দেশীয় অভিভাবকদের তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেন: "যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের (ইংরেজদের) সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণাবোধ হয়।"

ইংরেজের অত্যাচার তরুণ কবিকে বিচলিত করেছিল, অথচ তৎকালীন 'Political agitator'—দের মুখে সে সম্পর্কে কথা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্দেশে 'তাঁর হাতে-কলমে' প্রবন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে লিখলেন, "কেবল কতকগুলো মুখের কথায় তুমি তাহাকে (এ-দেশীয়কে) আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া? -----একবার একজন ইংরেজের হাত হইতে একজন এ-দেশীয়কে ত্রাণ কর। একবারও সে বুঝিতে পারুক



১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে এটি গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়; তবে 'বৃটিশ' শব্দের স্থানে 'মোগল' ব্যবহৃত হয়েছে।

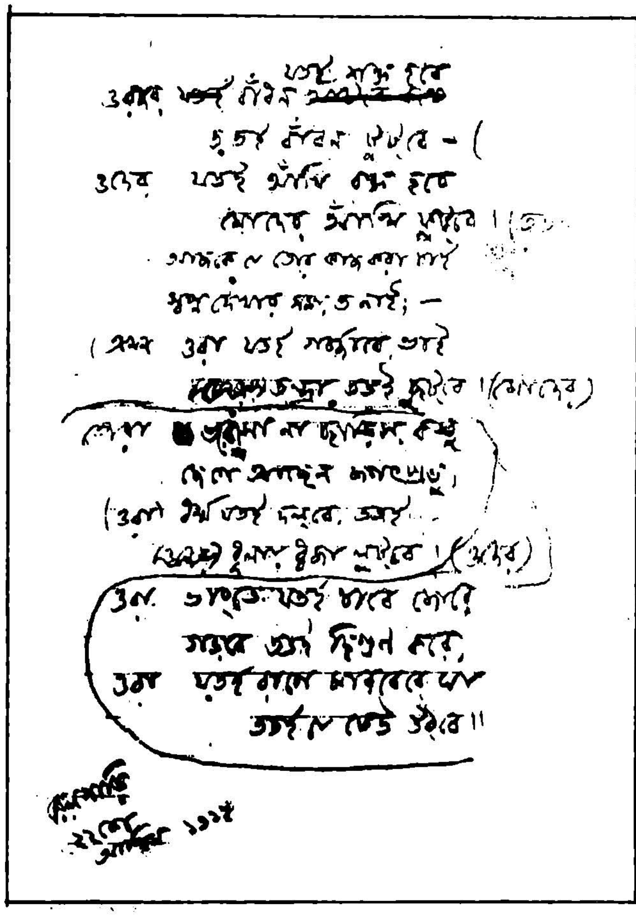
ইংরেজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে।----এ জিহ্বার ব্যায়াম নহে, ইহাই স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা"।—রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের প্রসঙ্গতঃ মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শশীকে, কিংবা 'গোরা' উপন্যাসে চরঘোষপুরে গোরার ভূমিকা। আরো একটা কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়ঃ বাংলাসাহিত্যে তখনও সংগ্রামী দেশপ্রেমের (Militant Nationalism)চিত্র অঙ্কিত হয়নি। আমি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার যুগের কথা বলছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তখন ও প্রকাশিত হয় নি।

এরপর 'আনন্দমঠ' প্রকাশের পরে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের ও সক্রিয়তার কাল শুরু হবার পরও দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্বদেশ-চেতনার তেজস্বী অভিব্যক্তি। কবির চিন্তাধারার পাশে তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃত্বের ভূমিকাটি লক্ষণীয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬) সভাপতি দাদাভাই নৌরজী বললেন, "Let us speak out like men and proclaim that we are loyal to the backbone----"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রকে নৌরজী বললেন, 'Our Magna Charta',—"It constitutes such a grand and glovious Charter of our liberties that I think every child as it begins to gather intelligence and to lisp its mother tongue, ought to be made to commit it to memory."

১৮৯৭-এর ২২শে জুন (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির দিন) প্লেগ কমিটির প্রেসিডেন্ট র‍্যাণ্ড সাহেব নিহত হওয়ায় বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার হলেন ; সংবাদপত্রের কণ্ঠবোধ হলো ; নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে নির্বাসিত করা হলো। ইংরেজের দমন-নীতি ভীষণ আকার ধারণ করলো। এই ভয়াবহ দিনে কংগ্রেস সম্মেলনে তদানীন্তন কংগ্রেস-সভাপতি শঙ্করণ নায়ার নির্লজ্জভাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশ স্তি করে বললেনঃ "We bless Her Majesty for her message in 1958 of peace and freedom when the occasion invested it with a peculiar significance-----in years to Come her name will rightly find a place in the memory of our descendants along with those great persons whose virtues have placed them in the ranks of Avatars born into this world for the benefit of this our holy land."সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ইংরেজ শাসকদের এই দমননীতিকে ধিক্কার দিলেন। সিডিশন্ বিল্ পাশ হওয়ার ঠিক আগের দিন কলকাতার টাউনহলে এক জনসভায় তিনি 'কণ্ঠরোধ' নামক প্রবন্ধ রচনা করে পাঠ করলেন। এই লিখিত ভাষণে তিনি বললেন, "গবর্মেন্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন।----একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্যদিকে রাজ-কারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ি ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।"

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্বন্ধে বিদেশী শাসকশ্রেণীকে সাবধান-বাণী শুনিয়ে তিনি বললেন, "------সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ঙ্কর নহে?....যদি কখনও কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে — তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু না কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না।"

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্পর্কে ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতীর' প্রসঙ্গ কথায় তিনি আবারও লিখলেন, "আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে, আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা



ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে?"

রবীন্দ্রনাথের এই লেখা ও বক্তৃতাগুলিকে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা ও কার্যাবলীর পাশাপাশি রেখে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক পৌরুষ ও দেশাত্মবোধকে আমরা বুঝতে পারি। তাঁর স্বাদেশিকতায় ভিক্ষাবৃত্তি ও তোষণনীতির স্থান ছিল না। 'ভারতী' ও 'সাধনা'র বহু রচনায় তাঁর এই নির্ভীক পৌরুষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত।

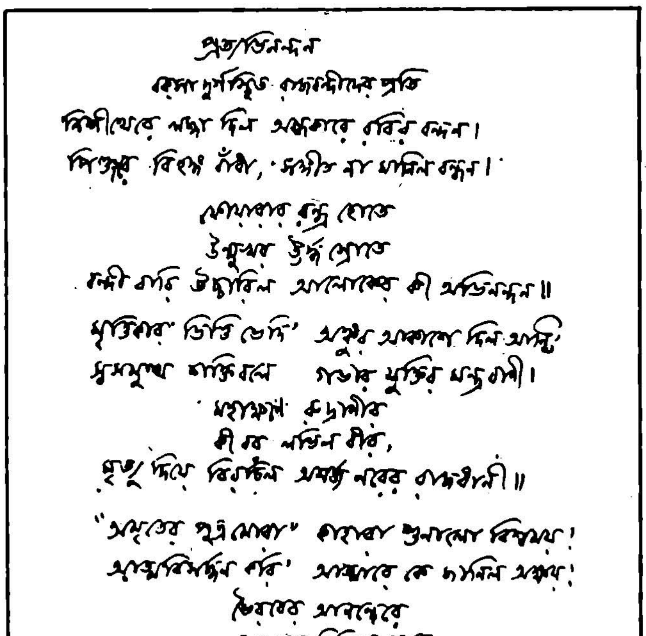
কেবলমাত্র ইংরেজ শাসকের সমালোচনাই নয়, কংগ্রেসের নেতৃত্বকে সমালোচনা করে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করাবার জন্যও তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, এমন কি তাঁদের জনসংযোগের ভাষা পর্যন্ত ইংরেজি হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে তিনি লিখলেন, "আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কংগ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমতো করিবে, ইহাই তাহার ব্রত হউক।-----বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিক্ষার ঝুলি হতাশ্বাস কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে ঘোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে স্বদেশী যুগের শুরু, রবীন্দ্রনাথ সেই নবযুগ-সংগীতের উদ্গাতা—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই-স্বদেশী মন্ত্রে দেশকে, তথা কংগ্রেসকে দীক্ষা দিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করতে হয়েছে। কংগ্রেসের সভার বক্তৃতা থেকে কার্যবিবরণী পর্যন্ত সব হতো ইংরেজি ভাষায়। এমন কি কংগ্রেস-নেতারা অধিকাংশই ইংরেজের পোষাক পরতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন তাকে ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁর প্রবন্ধে কবিতায় ও কাজকর্মে এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এ-সম্পর্কে ১৩০৫ সালের 'ভারতী'তে (আশ্বিন) তিনি লিখলেন—

"—আমাদের দেশে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভা মঞ্চের উপর আরোহণ করেন, তাঁহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। —

"আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ করিব না! দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয়? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া। ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জন-নায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়াই নিতান্ত অসংগত। "ইংরেজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরেজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়।"

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ দেশ বলতে দেশের মানুষকেই বুঝতেন। তাঁর "অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী" কিংবা "ও আমার দেশের মাটি" ইত্যাদি গানের কথা মনে রেখেও এ-কথা মানতেই হবে যে, দেশের মানুষই তাঁর স্বদেশচিন্তার কেন্দ্রে বর্তমান। তাই তিনি বলেছেন, "দেশটা মৃন্ময় নয়, দেশটা চিন্ময়।" এইকারণেই স্বদেশচিন্তার ভাববাষ্প দিয়ে দেশের মানুষকে নেপথ্যবর্তী করে দেননি। তিনি জানতেন, "ভারতমাতা হিমালয়ের চূড়ায় বসিয়া কেবল বীণা বাজাইতেছেন না"। সেই কারণেই তিনি অনুভব করেছিলেন, "যে ভারতমাতা ঋষি আশ্রমে তরু আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে শুধু দূর হইতে প্রণাম করিলেই চলে; কিন্তু পল্লীর পঙ্কশেষ পাশপুকুরের ধারে যে ভারতমাতা নিজের ছেলেকে ইংরেজি পাঠশালায় পড়াইবার জন্য পরের পাকশালে ভাত রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাকে তো শুধু প্রণাম করিয়া সারা যায় না!" বিশেষ করে জমিদারী দেখাশুনার কাজে শিলাইদহে গিয়ে পদ্মাতীরের গ্রামের মানুষদের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ মোচনের চিন্তার সঙ্গে তাঁর দেশমুক্তির চিন্তা একীভূত হয়ে যায়।



'চিত্রার' 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ভগ্ন-মেরুদণ্ড নিরুপায় সর্বস্বান্ত কর্ষণজীবী মানুষদের উদ্দেশে আহবান জানিয়েছিলেন—

"মুহূর্ত্ত তুলিয়া শিরা একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।"

'নৈবেদ্য' রচনার সময় কবির নির্ভীক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিকতা একই মুদ্রার দুই পিঠের মতো স্বদেশচেতনার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত আত্মজাগৃতি এনেছিল। এখানেই দেখি সংগ্রামী কবি-পুরুষের প্রার্থনা—"----অস্ত্রে দীক্ষা দেহো রণগুরু।" দেশের মানুষের মন থেকে সমস্ত ভয়কে দূর করে তাদের উন্নতশির করে তোলার কী আকাঙ্ক্ষা কবির! বিধাতার কাছে তাঁর এ-যুগের সব প্রার্থনা দেশের মানুষের জন্য। নিজের চিত্তের ভয়মুক্তি দেশের মানুষের চিত্তে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য কবি লিখলেন—

"----রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দীশালে।"

মনে পড়ে যায় পরবর্তীকালে রচিত "প্রায়শ্চিত্ত", "পরিত্রাণ" ও "মুক্তধারা" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীকে, যে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের সমবেত করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছিল; রাজ-কারাগারে বন্দীদশাতেও যার মনোবল ছিল অটুট। কিংবা মনে পড়ে 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জনকে, যে যক্ষপুরীর খোদাইকরদের নির্ভয়ে মাতিয়ে তুলেছিল।

'নৈবেদ্য' কাব্যের রচনাকাল ১৩০৭ সাল। স্বদেশী যুগের আভাস এখনই কবির রচনায় পরিস্ফুট। দেখা যায়, কবির চিত্ত পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার যেন উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। লর্ডকার্জনের আমল তখন শুরু হয়ে গেছে। ১৩০৯ সালে "মাঁ ভৈঃ" প্রবন্ধে কবি লিখলেন, "যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।-----যেখানে রক্তের প্রয়োজন সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।"

দেশের আর্থিক অবস্থা এখন মারাত্মক; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপর্যয়ের সঙ্গে দেশী-বিদেশী শোষণে মানুষ জর্জরিত। দেশনেতারা বাগাড়ম্বর করছেন, অন্যদিকে কার্জনের দিল্লির দরবারের আয়োজন। এই বিশেষ অবস্থায় কবির 'প্রাণদান' ও 'রক্তদানের' আহবান তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জনের এক বক্তৃতার জবাবে এবং প্রস্তাবিত দিল্লির দরবার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর লেখনী তখন তীক্ষ্ণধার সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কবি লিখছেন—

"—-এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস ইংরেজের মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা নিঃশেষে নিরস্ত্র,-----অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বল প্রমাণ উপলক্ষে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।-----আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি।—-

"—-শুদ্ধমাত্র দম্ভ প্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্যের দ্বারা, দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত।—"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ এলো বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ বহন করে। প্রায় এই সঙ্গে এ-দেশের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় আঘাত হানার জন্য 'য়ুনিভার্সিটি বিল'ও পাশ করা হলো। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সুবিদিত। অসংখ্য গানে

বাংলাকে তিনি মাতিয়ে তুললেন অভয়মন্ত্রে। 'রাখীবন্ধন' উপলক্ষে নিজে রাস্তায় নেমে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন; বহু সভায় বক্তৃতা করলেন। 'স্বদেশী সমাজে'র কর্মসূচী প্রচার করে পরবর্তী যুগের গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বাভাষ সূচনা করলেন। এই কর্মসূচীতে এবং বঙ্গমহিলাদের উদ্দেশে রচিত 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে আচার-ব্যবহারে, পোষাকে, পণ্যে পুরোপুরি স্বদেশী হবার আহ্বান জানালেন। 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধে তো বিদেশী পণ্য বর্জনেরই আহবান রাখলেন। মনে রাখতে হবে, ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাবের তখনও প্রায় এক দশক দেরী ছিল। সুতরাং বিদেশী পণ্যবর্জনের আহ্বানের কৃতিত্ব গান্ধীজির নয়, রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য পরে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর বিদেশী পণ্যবর্জনের আন্দোলন যখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ধ্বংসের ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে, তখন তার স্বরূপ দেখে, পদ্ধতি দেখে কবি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মানসিকতা মনে পড়বে।

তারপর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কবিসত্তা তাঁকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে থেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিল বটে, তবে অন্যায় ও অত্যাচার যখনি যেখানে ঘটেছে তখনই তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। নানা সমস্যা সম্বন্ধে নানা রচনায় তিনি জাতিকে পথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ-কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন না। তবু তাঁর মনের অসাধারণ গতিশীলতা এবং সংস্কারমুক্ত স্বদেশ ও বিশ্বসমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে সবসময় সচেতন রেখেছে। তিনি তাঁর শিল্পিসত্তার সঙ্গেই চিন্তাবিদ সত্তাকেও সজাগ রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন 'Artist Thinker'; এই কারণেই তাঁর চিন্তাশীলতার ফসলও শিল্পরূপ লাভ করেছে।

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সংগঠন যখন গড়ে ওঠে, তখন তাদের কর্মধারাকে সমর্থন করতে না পারলেও তাদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম,সাহস ও বীরত্বকে কবি উপযুক্ত সম্মান জানিয়েছেন। তাঁর রচনায় তার ইঙ্গিত বর্তমান। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও মিলনের প্রশ্নে কবির দৃষ্টি কখনও অস্বচ্ছ হয়নি। ইংরেজ তার শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখতে যে এই বিরোধের বীজ বপন করেছিল ও নানা সময় আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে ইংরেজ যে এই সমস্যাকে জটিলতর করেছে, এ-কথা কবি বহুবার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসঙ্গে বলেছেন। এ-বিষয়ে হিন্দুদের ও কংগ্রেস-নেতৃত্বের ত্রুটি ও আগ্রহের অভাবকেও কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে ভোলেননি। কংগ্রেসের আন্দোলন এবং সংগঠন সত্ত্বেও 'প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি', সেখানেও বিচ্ছিন্নতা মাথা তুলছে, একথা বলে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। এ-বিষয়ে প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করে এই ঐক্য রক্ষার আহ্বান রেখেছেন। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে নেই। তবু জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

কবির তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া গেল জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে নাইট উপাধি ত্যাগে। রৌলট্ আইন প্রত্যাহারের দাবীতে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ পালনকে উপলক্ষ করে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দিল। সেই সময় (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯) পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের এক জনসভায় নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম গুলিবর্ষণে সহস্রাধিক নিহত হয় (সরকারী মতে ৩৭৯ জন)। সরকারের কঠিন সেন্সর জাল ছিন্ন করে তার সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে তিনি এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে যে-চিঠি লিখে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন, ভারতের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে তা এক উজ্জ্বল দলিল। এই চিঠিতে কবি লিখলেন—

"---The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced are without parallel in the history of civilized governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. ----the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my contrymen, surprised into a dumb anguish of terror."

তারপর তিনি বৃটিশরাজ-প্রদত্ত সম্মানচিহ্ন পরিত্যাগ করে অত্যাচারিত স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কবির এই পত্র কেবল তাঁর সংবেদনশীল ক্ষুব্ধ হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করে না, জাতির সম্মান রক্ষার গৌরবময় পরিচয়ও বহন করে।

১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সময় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী-প্রশাসন হিজলী জেলে গুলি চালিয়ে দু'জন রাজবন্দীকে হত্যা করে। তার প্রতিবাদে ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় মনুমেন্টের নীচে যে বিশাল জনসমাবেশ হয়, সত্তর বছর বয়স্ক কবি অশক্ত শরীর নিয়েও তাতে যোগ দেন। শুধু তাই নয়, ঐ সময় স্টেটসম্যান্ পত্রিকায় খুনী ওয়ার্ডারদের সমর্থন করে যে মতামত প্রকাশিত হয়, কবি তার তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকের উদ্দেশে এক পত্র পাঠান। ঐ পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক এ এইচ ওয়াট্‌সন্ সে-পত্র প্রকাশ না করে কবির একান্ত সচিব অমল হোমকে ফেরৎ পাঠান। এই সময়েই কবির সুপরিচিত 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচিত হয়ঃ

"আমি যে দেখিনু প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন আসন্ন, সে-সময় দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরোধ অমার্জনীয়রূপে মাথা তুলে উঠেছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যরক্ষা যখন বিশেষ প্রয়োজন, সেই সময় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কংগ্রেস এমনই ব্যাপৃত যে, স্বাধীনতার প্রশ্ন তখন গৌণ হয়ে নেতৃত্ব দখলের প্রশ্ন তাদের ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। য়ুরোপে ফ্যাসিবাদের কুৎসিত লোলুপতা তখন শুরু হয়েছে। এই সময় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বামপন্থীদের, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার জঘন্য চক্রান্ত চলাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯) কংগ্রেস-সভাপতিরূপে যাতে পুনরায় নির্বাচিত হতে না পারেন, সে-জন্য তাঁদের চেষ্টার তখন অন্ত নেই। ঐ সময় একদিকে সংগঠনে দক্ষিণপন্থীদের ফ্যাসিস্ট কায়দায় অগ্রসর হওয়া, অন্যদিকে সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদের একাংশের শ্লোগান —"হিন্দুস্থান কা হিটলার গাঁধীজি কি জয়"— সংবাদপত্রে পড়ে রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে কবি একটি চিঠিতে এই সময় লিখলেন—

"---অবশেষে আজ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। আমাদেরই গুরুভজা দেশে লাগবার কথা। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।"

কবি আরও লিখেছিলেন—"এবারকার কন্‌গ্রেসে এই ফ্যাসিস্টিক মুষ্টি পীষণের আত্মপরিচয় দেখে ভীত হলুম।"

এই চিঠিতেই কবি আর এক জায়গায় লিখেছেন—"—ক্রমে ক্রমে একেবারে উল্টে গেল হাওয়া। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, অচলায়তনের প্রাকারশ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল।"----

অশীতিপর কবি জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে বর্তমান মানব-সভ্যতার সমীক্ষা করতে গিয়ে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ধিক্কার হেনেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে তা অম্লান অধ্যায় হয়ে আছে। কবি তাঁর দূরদৃষ্টিতে অনাগত ইংরেজ-পরিত্যক্ত ভারতের চিত্রকে প্রশ্ন হিসাবে রেখেছেনঃ—'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না

একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?....."

মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগেও ভারতের জাতীয় অপমানের প্রতিবাদে রুগ্ন অশক্ত দেহেও কবিকে লেখনী ধরতে দেখি। 'বর্বর মুখবিকার'কে সৌন্দর্যসাধক কবি রোগশয্যাতেও সহ্য করতে পারেননি। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ রাথ্‌বোন্ এই সময় ভারতবাসীর উদ্দেশে সংবাদপত্রে এক খোলা চিঠি নিয়ে অত্যন্ত অপমানকর মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অপমানের প্রতিবাদে না লিখে পারলেন না। কবি লিখলেন (৫ই জুন, ১৯৪১):—*

"মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুত: ধৃষ্টতার সহিত যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও সাহায্য হয় নাই। 'বৃটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও' গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্ রাথ্‌বোন্ লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন।.....

"কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই 'ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে 'দুই শতাব্দী ব্যাপী বৃটিশ শাসনের পর' ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম (Literate) হইয়াছে। অন্যদিকে রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট য়ুনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে।....

"আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দীকাল দৃঢ়মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে বৃটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি।....."

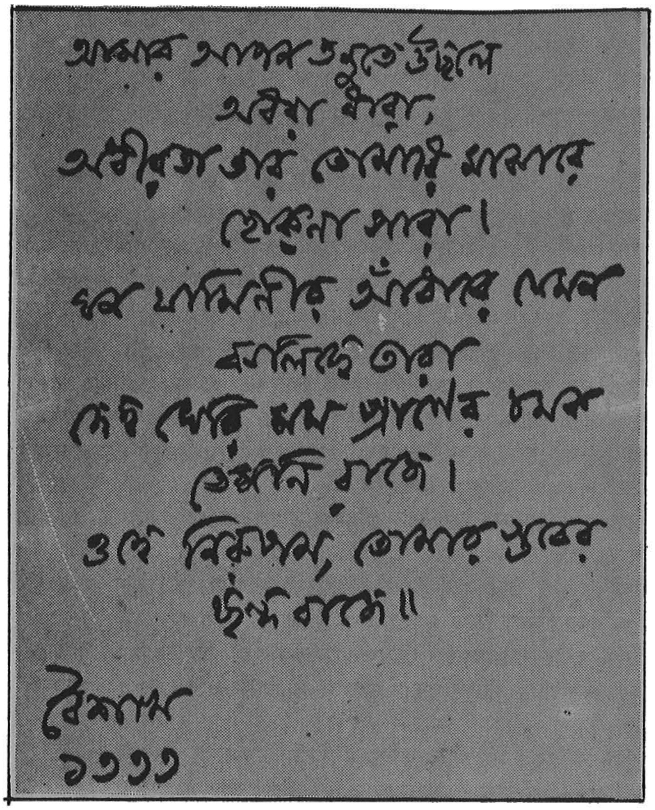
এরপর কবি দেখিয়াছেন যে, 'ল এ্যান্ড অর্ডারে'র বড়াইকারী ইংরেজের শাসনে এ-দেশের মানুষের ধন-মান-প্রাণ কত বিপন্ন; নারীর সম্ভ্রমেরও নিরাপত্তা নেই। অথচ দেশের মানুষকে আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্রধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শ্লেষের সঙ্গে কবি তাই রাথ্‌বোন্‌কে বলেন—

".....কিন্তু মিস্ রাথ্‌বোন্ আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্তচুম্বন করিব, কেন না তাহাদের সেই হাত আমাদের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে।....."

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবাসীরা সাহায্য না করায় ক্ষুব্ধ রাথ্‌বোন্ এই যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ খোলা চিঠি লেখেন। ভারতের প্রতিভূরূপে কবিই তার উপযুক্ত জবাব দিলেন।

কবির এই পৌরুষদীপ্ত হৃদয়ের পরিচয় কেবল স্বদেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর বিশ্বমানবিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় যাঁদের জানা আছে তাঁরা সকলেই এ-কথা জানেন। কবির জীবনের মূল প্রত্যয়গুলির অন্যতম ছিল বিশ্বমানবতা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও যুদ্ধবিরোধিতা। তাঁর বহু রচনায় সে-পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

অত্যন্ত অল্পবয়স থেকেই কবির আন্তর্জাতিক দৃষ্টির প্রকাশ দেখা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) পত্রিকায়



'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামক প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের নগ্নরূপ ও ভিন্ন দেশীয় শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পর্কে তরুণ কবির দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা দেখে বিস্ময় জাগে। চীনে ইংরেজ বণিকদের বলপ্রয়োগে আফিমের ব্যবসা চালানোকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন 'নিদারুণ ঠগীবৃত্তি' বলেছিলেন। সে যুগে এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টি রাজনৈতিক নেতাদের কল্পনাতীত ছিল। গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই তাঁর আন্তর্জাতিকতার এই বোধের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। য়ুরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার নানা জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনে তখন উন্মত্তভাবে সচেষ্ট। তার জন্য যে-কোনোরকম অত্যাচারে তারা সে-সময় পশ্চাৎপদ নয়। এমনি সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটাবিলি যুদ্ধের খবর কবিকে বিচলিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে ইংরেজের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে কবি কঠোর সমালোচনা করলেন। 'সাধনা' (চৈত্র, ১৩০০) পত্রিকায় 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধটি কবি এই প্রসঙ্গে লেখেন। এই সময় 'সাধনা', 'ভারতী' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন উপনিবেশে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়ন সম্বন্ধে কবির অনেক লেখায় আন্তর্জাতিকতার বোধ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

প্রায় সমকালে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যের একাধিক কবিতায় ঐ যুগের যুদ্ধোন্মাদদের তথাকথিত জাতিপ্রেমের ও যুদ্ধ-সংঘটনের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। কবি স্পষ্টই বুঝেছিলেন অত্যুগ্র জাত্যভিমান সাম্রাজ্যবাদের পরদেশ আক্রমণের অজুহাত হয়। য়ুরোপীয় রীতিতে নেশন্ গড়ার পক্ষপাতী তাই তিনি ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন জাতীয়তাবাদের উগ্রতম রূপ জঙ্গীবাদ। তাই তিনি সেদিন লিখেছিলেন—

"....লজ্জা শরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়'
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

এই তথাকথিত জাতিপ্রেম আনে মানুষে মানুষে হানাহানি, আনে "অস্ত্রে

* রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠিখানি ইংরেজিতে লেখা। এই অনুবাদ 'প্রবাসী'র (আষাঢ়, ১৩৪৮)।

অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী ভয়ঙ্করী'। সেই 'স্বার্থতরী-বাহী' 'মৃত্যু-সন্ধানী' জাতিপ্রেমকে কবি তখনই ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাসমর যখন শুরু হলো, মানবতাবাদী কবি অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যথিত হলেন। য়ুরোপে ঠিক তার আগেই তিনি দেখে এসেছিলেন সর্বনাশা ঝড়ের আভাস। তবু তাঁর সংবেদনশীল কবিহৃদয় ব্যথিত হলো 'জগৎবিনাশী ঝড়ে'র সংবাদে। ঐ বছর ২০শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি তাঁর "মা মা হিংসী :" ভাষণে বললেন ঃ

"সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করছে।.....বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।

"সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলেছিল।.....এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে।...."

কবি এর কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন স্বার্থবোধ এবং জাত্যভিমানের উগ্রতা। আবারও তিন সপ্তাহ পরে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানবকল্যাণের প্রার্থনা জানালেন 'পাপের মার্জনা' ভাষণ পাঠ করে।

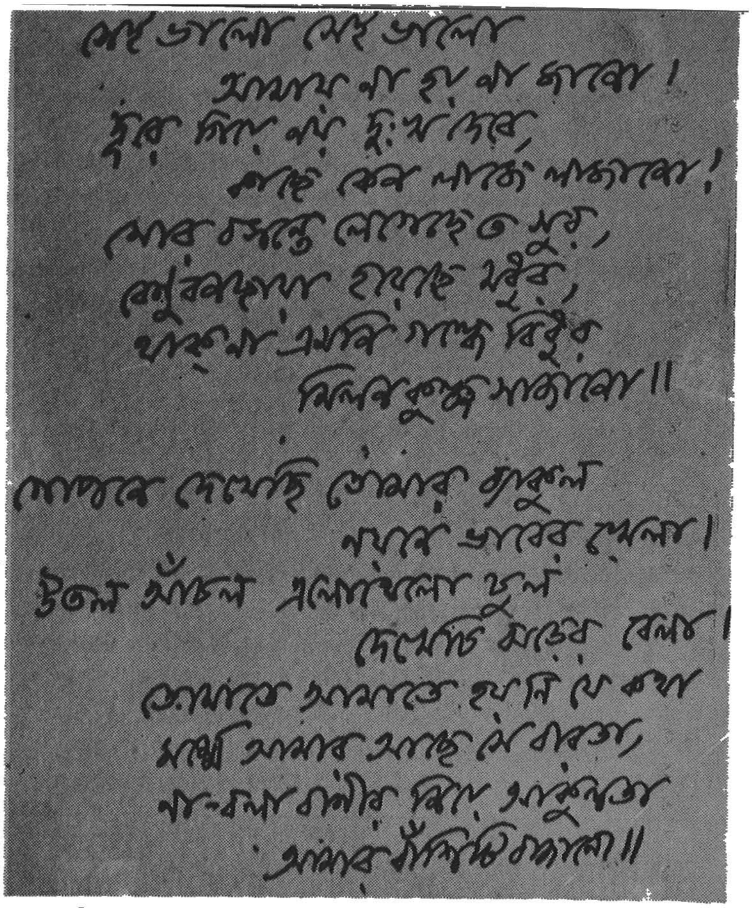
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ হিসাবে কবি সেদিন বুঝেছিলেন ধনবাদী দুনিয়ার বাণিজ্যিক মুনাফার বাজারের সম্প্রসারণের প্রয়োজনে অন্যদেশকে কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে। তাই বলেছিলেন—"বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।" এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি।" এ-পক্ষ তখন মানবতাবাদী ও যুদ্ধবিরোধী রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পক্ষ, মানবতার পক্ষ, শান্তির পক্ষ।

পৃথিবীর যে-কোনো দেশে আক্রমণ শোষণ-পীড়ন দেখা গেছে, কবি তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফ্যাসিস্ট ইটালি যখন ইথিওপিয়াকে বিধ্বস্ত করে, যখন আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করে, কবি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। ফ্যাসিস্টরা যখন স্পেনের প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত করে, তখন কবিকে দেখা গেছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে। আবার জাপান যখন চীন আক্রমণ করলো, কবি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তারও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

১৯৩৮ সালে জাপান যখন চীনের মূল ভূখণ্ডের উপর আক্রমণ চালায়, জাপানী কবি নোগুচি তখন এই আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন চাওয়ার স্পর্ধা প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। মর্মাহত কবি তার যে জবাব দিয়েছিলেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সেটি এক স্মরণীয় দলিল, পৃথিবীর কবি ও কলাবিদ্‌দের পথের দিশারী। কবি নোগুচিকে লিখলেন—

"....ভাবতেও দুঃখ পাই যে, যুক্ত সমরবাদের উত্তেজনা কোনো সময়ে সৃষ্টিশীল শিল্পীর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তার বুদ্ধিমত্তাকে অসহায়ভাবে যুদ্ধের অপদেবতার পায়ে মর্যাদা ও সত্যকে বলি দিতে পরিচালিত করতে পারে।

"ব... ...ও সমাজের একটা মূল নৈতিক কাঠামোতে মানুষ বিশ্বাস করে... তাই তুমি যখন এশিয়া মহাদেশে একটা নতুন মহৎজগৎ প্রতিষ্ঠা... ...য়ঙ্কর হলেও, অপরিহার্য উপায়ের কথা বলো, আমার মনে হয়, চীনের নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অপবিত্রকরণের কথাই, এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষার উপায় হিসাবে তুমি বোঝাও।...তোমার ধারণার এশিয়া গড়ে উঠবে করোটির মিনারের উপর। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই বাণী এমন সব কাজের সগোত্র হতে পারে যা তৈমুরলঙ্গের হৃদয়ে তার ভয়াবহ নরহত্যার সাফল্যে গৌরব জাগাতে পারে।....



"কিন্তু ধারণা ছিল, অন্ততঃ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের স্বাধীন বিচার-ক্ষমতাকে নিজেরা রক্ষা করবেন।...বিকৃত বিতর্কের পশ্চাতে একটা বিপথগামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব আছে বলে মনে হয়, যেজন্য এখনকার 'বুদ্ধিজীবীরা' তাঁদের 'মতবাদ' সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করতে থাকেন, আর তাঁদের দেশের জনতাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যান।*

যুদ্ধ ও তার আবর্তে বিক্রীত-বিবেক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত। বন্ধু নোগুচিকেও কঠোর ভাষায় তা জানাতে তিনি সংকোচ করেননি। নোগুচি কবিকে এশিয়াকে বাঁচাবার অজুহাতে 'কমিউনিস্ট ভূত' দেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন। কবি নোগুচিকে সে দ্বিতীয় পত্র লিখেছিলেন (অক্টোবর, ১৯৩৮), তাতে এ-সম্পর্কে লেখেন—"তোমার নিজের লোকদের মধ্য যদি দরিদ্রকে শোষণ না থাকে এবং যদি শ্রমিকরা ন্যায্য ব্যবহার পাচ্ছে বলে মনে করে, তবে তোমাদের 'কমিউনিজমের ভূত'কে ভয় করার কারণ নেই।'

কবির মৃত্যুর দুবছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তার কয়েক বছর আগেই ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী রূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল। রোমাঁ রোল্যাঁর চেষ্টায় কবি ফ্যাসিস্ট ইটালির নায়ক মুসোলিনীর ছলনা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং ফ্যাসিবাদের স্বরূপ ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছিলেন। ভারতে যখন ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হলো, কবি তার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রোমাঁ রোল্যাঁ, আঁরি বারবুস্ প্রমুখের উদ্যোগে ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটি বাণী প্রেরিত হয়। এই বাণীতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল, শরৎচন্দ্র,

* অনুবাদ প্রবন্ধকারের। ঐ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নন্দলাল বসু, নরেশ সেনগুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, প্রেম চন্দ্‌ প্রমুখ। প্যারীর সংস্কৃতি রক্ষণ সম্মেলনেও বাণীটি পাঠানো হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চলে হিটলারের দাবী ও আগ্রাসনকে সমর্থ করে যখন তার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুললো, কবি তখন গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই সংকটের সময় রবীন্দ্রনাথ সে-দেশের রাষ্ট্রপতি বেনেসের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে ক্ষোভ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করার সংবাদ জানতে পেরে ফ্যাসিস্ট জার্মানীকে ধিক্কার দিয়ে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক কবিতাটি রচনা করলেন। কবি অনুভব করলেন, "জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার/কালনাগিনীর দল।"

পৃথিবীর যুদ্ধোন্মাদদের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কার এখন থেকে ক্রমাগত নানা রচনায় দেখা যায়। কবি ঐ মানবতা-বিরোধী দানবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন 'প্রান্তিক' কাব্যের এই স্মরণীয় কবিতায়—"বিদায় নেবার আগে তাই/ডাক দিয়ে যাই—/দানবের সাথে সংগ্রামের তরে/যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

গান্ধীজি ও কংগ্রেসের ভূমিকার সঙ্গে কবির ভূমিকার বিরাট পার্থক্য তখন লক্ষ্য করার মতো। গান্ধীজি তো চেকোশ্লোভাকিয়াকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অহিংস হবার পরামর্শ দিলেন।

মৃত্যুর আগে মানবসভ্যতার যে সংকট কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর মৃত্যুর দু'মাস আগে ফ্যাসিস্ট হিটলার যখন সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তখন রোগশয্যায় পড়েও কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। তিনি অক্ষশক্তির পরাজয় কামনা করেছেন, আর সোভিয়েট সম্বন্ধে পরম বিশ্বাসে বলেছেন—'ওরা পারবে, ওরা পারবে।'

সারাজীবন বিচিত্র সাহিত্য-পুষ্পে বঙ্গভারতীর ডালাকে যিনি ভরে তুলেছেন। সেই একই মানুষ দেশে ও বিশ্বক্ষেত্রে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে গেলেন। তাঁর কথার সঙ্গে হৃদয়-মন মিলিয়ে আমরাও বলবো—

...দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

বলবো—"মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। রবীন্দ্রনাথঃ কালান্তর, নৈবেদ্য, চিত্রা, সেঁজুতি, প্রান্তিক; রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী) ৪র্থ,৫ম, ১০ম, ১৬শ

২। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ২য়, ৪র্থ; ভারতে জাতীয় আন্দোলন

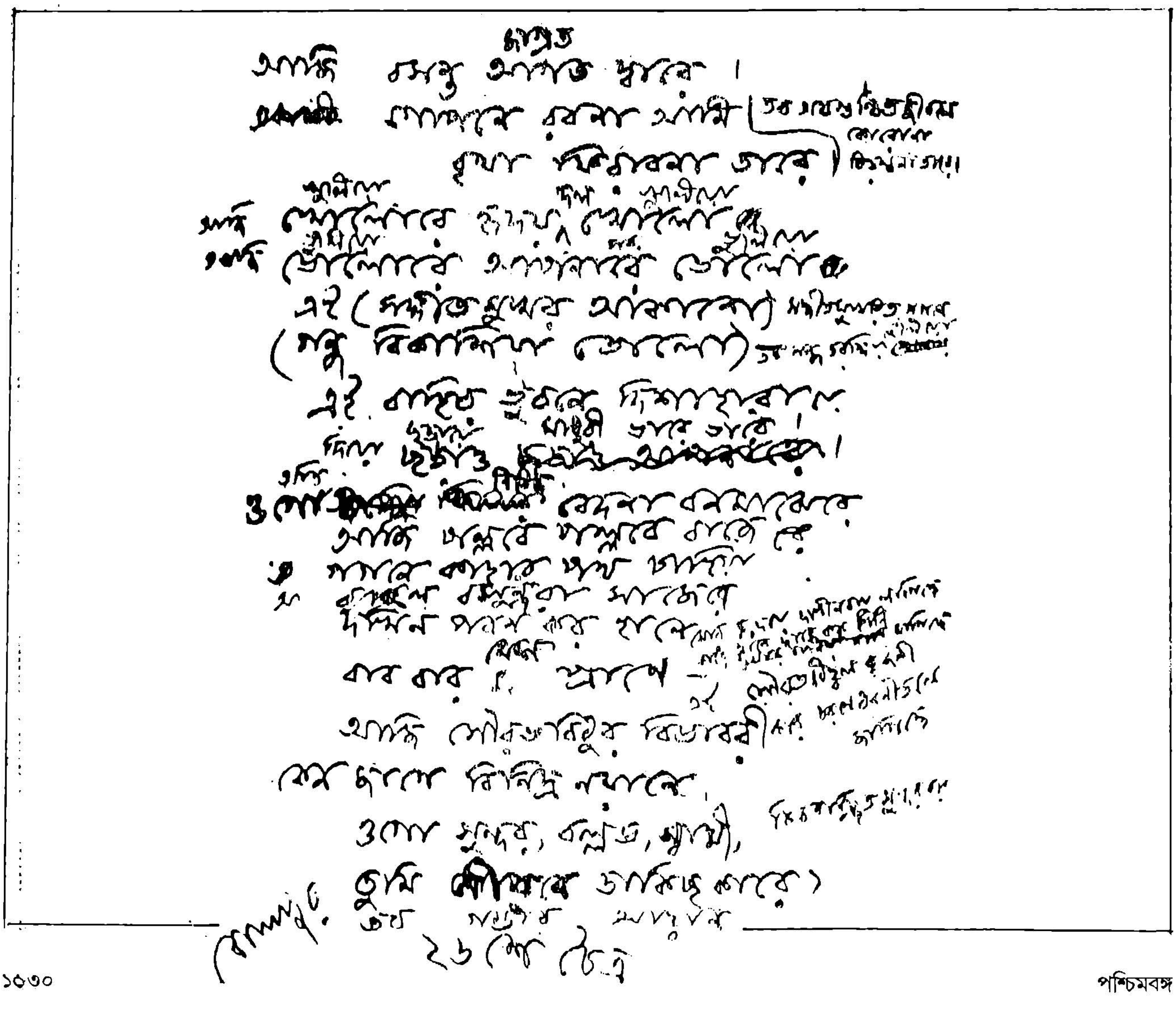
৩। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ—১ম, ২য়, ৫ম।

৪। Tagore and china

৫। প্রবাসী (আষাঢ়, ১৩৪৮)

৬। 'মুখপত্র'

৭। 'স্বাধীনতা' (দৈনিক)।





পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় ঘোষ

।। এক ।। শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।
।। দুই ।। ....আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।
।। তিন ।। ....এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।....

।। এক ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনশিক্ষার কাজ আর পল্লী-উন্নয়নের কাজকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। বস্তুত তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। তাই প্রথমে, এই শতাব্দীর সূচনাতেই তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রায় একই কালে এবং কালক্রমে শিক্ষাদানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পল্লী-উন্নয়নের কাজ। দু'টি কাজের সার্থক মেলবন্ধন যে সম্ভব, সোভিয়েত পরিক্রমার পরে তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর আত্মপ্রত্যয় আরো গভীর ও বলিষ্ঠ হতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, প্রায় নতুন একটি চিন্তা-সঙ্কটও তাঁর মনে সৃষ্টি করেছিল—১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সোভিয়েত পরিক্রমা।

কিন্তু সে কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

এখানে আমরা দেখাতে চাইছি, রবীন্দ্রজীবনের উত্তরপর্বে তাঁকে আমরা একই সঙ্গে যখন শিল্পস্রষ্টা ও মহান্ কর্মীরূপে প্রত্যক্ষ করছি, তখনও তিনি তাঁর কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক-গান-ছবি প্রভৃতি সবকিছুর তুলনায় তাঁর পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টাকেই একান্ত করে, প্রধান কীর্তিরূপে উপস্থাপিত করছে চাইছেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' জানাতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলছেন, যাতে স্পষ্ট যে, তাঁর স্রষ্টারূপ নিয়ে যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা বলুন, কিন্তু তাঁর কর্মীরূপটিকে যেন কেউ 'ছোটো' করে না-দেখেন—

> 'আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তাঁর কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।
>
> 'আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি, তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য, তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত, তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।'

সোভিয়েত-পরিক্রমার পরে আরো একটি কথা রবীন্দ্রনাথ বারম্বার অনেক বেশি জোরের সঙ্গে একান্ত আকুতিভরে দেশের মানুষের কাছে বলতে চেয়েছেন, এই 'সম্ভাষণ' অংশেই তা অন্যূন তিন তিনবার উচ্চারিত হয়েছে—

> 'আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না,—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন।
> ....আমি গদ্যে-পদ্যে-ছন্দে অনেক কিছু লিখেছি, তার কোনোটার



জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
সকাল

মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানিনে, বুঝিনে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানিনে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

'আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছু নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি।'

গত শতাব্দীর শেষ দশকে পল্লীবাংলার জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাই প্রবল আবেগে ও গভীর আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথকে চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগেই 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল, যদিও প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত কারণস্বরূপ এই প্রবন্ধের শিরোদেশেই লিখিত আছে—'বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।' এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকেও স্পষ্ট, কোন্ গভীর গ্লানি, ক্ষোভ ও বেদনাবোধ থেকে এটি রচিত হয়েছিল—ঈষৎ বিদ্রূপের সুরেই রচনাটির সূত্রপাত—

'সুজলা-সুফলা' বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

এইখানেই, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : স্বদেশ ও স্বজাতির সবচেয়ে বড়ো অসম্মান। সমগ্র দেশ ও জাতির গ্লানি ও বেদনাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে আত্মস্থ করেই লিখেছিলেন—'এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকট খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!'

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল: 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী'। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর। কংগ্রেস-কনফারেন্সের বক্তব্য ইত্যাদি সমস্তই 'বিদেশী হৃদয় আকর্ষণের জন্যই' উত্থাপিত হতো। আমাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম বিদেশী ধাঁচে বিদেশীকে আকৃষ্ট করার জন্য। দেশের সাধারণ মানুষকে কংগ্রেস আহ্বান করছে কই? দেশের সাধারণ মানুষকে দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন করা, ঐক্যবদ্ধ করাই যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হতো—'তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম।'

এই সময়ে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে অর্থাৎ এককথায় স্বদেশী সমাজের যুগে রবীন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর সরকারী দমননীতির মুখে কংগ্রেসের নিষ্ফল ভূমিকা দেখে, জনসাধারণের অনীহা ও ঔদাসীন্যে বিচলিত হয়েও হতাশা ও নৈরাশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, বরং তাঁদের চেতনাবৃদ্ধির লক্ষ্য সামনে রেখে একটি গঠনমূলক কর্মসূচী উপস্থাপিত করলেন তাঁর প্রবন্ধটিতে। এই দিক থেকে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই কালে দেশনায়কের যোগ্য কর্তব্যভার বহন করেছিলেন।

সেইজন্যেই উদ্ধৃত অংশে কবি রবীন্দ্রনাথ দেশকালের প্রেক্ষিতে জনসংযোগের উৎকৃষ্ট মাধ্যম কী হতে পারে, তা নিয়েও গভীরভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। সেই সময়টা কেমন ছিল, তা প্রাসঙ্গিক নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধেও বলেছেন—'তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্নমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অধ্যাবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনে তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিকসের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।'

আমাদের দেশের সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মহত্তম দানটি কী, এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের এই মূল বক্তব্যটির আলোকেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় বলে আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগের বা তাঁর ভাষাতেই পলিটিকসের উপরওয়ালামুখী এই কর্মপ্রচেষ্টাকে জনসাধারণের অভিমুখী করতে, এককথায় গণমুখী করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসঙ্গত বলে মনে করতেই পারতেন না'—এই অদ্ভুত জনবিমুখ ব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী-সম্মিলনীতে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তনের প্রথম প্রচেষ্টা চালান। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তদানীন্তন রাষ্ট্রনেতারা এতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন এই মর্মে যে, 'ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি!'

দেশের মানুষের কাছে দেশের সমস্যা তুলে ধরার, তাঁদের সঙ্গেও সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার, সমাধানের পথ নির্ণয় করার মাধ্যম কী করে হতে পারে দেশের ব্যাপক মানুষের অপরিচিত একটি বিদেশী ভাষা,

"...দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমান-লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমান লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, আমাদের এক দেশ নয়।"

(পল্লীসেবা পল্লীপ্রকৃতি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাসক ব্রিটিশ সরকারের ভাষা, সে কথা বুঝতে পরাধীন ভারতবর্ষেই কংগ্রেসের বহুকাল অপব্যয় করতে হয়েছে, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে আজও কংগ্রেস এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করতে অপারগ।

জনবিমুখ, জনস্বার্থবিরোধী এই পলিটিকসের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথকে দাঁড়াতে হয়েছিল সক্রিয়ভাবে সেই রাজশাহী-সম্মিলনী থেকেই।

আমাদের দেশের পলিটিকসের ইতিহাসে, উপরওয়ালামুখী অভিজাতবর্গের স্বার্থবাহী ও জনস্বার্থবিরোধী এই রাজনীতিকে গণমুখী ও জনস্বার্থবাহী চরিত্রদানই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম দান : এই সত্যটি অন্তত আজ, তাঁর একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে দেশের মানুষকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।

তাই, মেলাকেই সেদিন রবীন্দ্রনাথের জনসংযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম বা গণমাধ্যম বলে মনে হয়েছিল। কেননা, মেলাতেই যাত্রা-গান-কথকতা উপলক্ষে দেশের জনসাধারণ আনন্দে সমবেত হন—মেলাতেই দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হয়, ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং, মেলাতেই 'আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া আজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা' উচিত বলেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল।

তা'ছাড়া—'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান।

'এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকটি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের কর্তব্য, নিজ নিজ জেলার মেলাগুলিকে উজ্জীবিত করে নবপ্রাণে সজীব করে তোলা। শুধু তাই নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটিও রবীন্দ্রভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচী যে কতটা বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী ছিল, আজ একাশি বৎসরের ব্যবধানে থেকেও তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ঃ প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

'আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না।'

বস্তুত, তদানীন্তন 'কংগ্রেস-কনফারেন্সের মাঝখানে খুব....বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চটপটা করতালি' এবং 'যেন বরযাত্রীদল গিয়াছি—আহার-বিহার আরাম-প্রমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত' দেখে ক্ষুব্ধ-বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই 'আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে' তারই দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মেলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে।

তথাপি একালের পাঠকেরও মনে হতে পারে, মেলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি করেন নি? তাঁর প্রস্তাব ও পরামর্শ কি সেকালের প্রেক্ষিতেও তেমন বাস্তবসম্মত ছিল? তাঁর সমকালেই কি গ্রামীণ মেলাগুলি বহুলাংশে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায় নি? মেলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অত্যুৎসাহ কি কতকাংশে কবিসুলভ রোমান্টিক কল্পনাসম্ভূত নয়?

বস্তুত, এ বিষয়েও যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সজাগ ও সচেতন ছিলেন, তা-ও লক্ষণীয়। তিনি মেলাগুলিকে ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে শুধু ব্যবহারের কথাই বলেন নি, 'কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে উদ্ধারের'ও প্রস্তাব করেছিলেন। লিখেছিলেন—

'আমাদিগকে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।'

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ভুলে গেলে চলবে না, এই প্রবন্ধটি নিছক কালগত বিচারেই রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত বা পরিণত সমাজ-চিন্তা বা রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ কোনো দলিল নয়। রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রভাবনার বিশিষ্ট একটি কালপর্বের পল্লীসঞ্জীবনের খসড়া রূপরেখাটি মাত্র এই প্রবন্ধে নিহিত। তাঁর ব্যক্তিগত রাষ্ট্রচিন্তার স্বরূপ ও কালানুক্রমিক পরিচয় প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী এখানে স্মরণ করতে হবে—

'আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী, তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। ....যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। ....রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে।'

সেই ঐক্যসূত্রটিকে উদ্ধার করা সহজ নয়। তা' করতে হলে, কোন্ 'রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই'—এই পরামর্শও যথেষ্ট বলে মনে করেন নি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর চিন্তার গতিশীলতার বাস্তব সত্যটির সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিতে ভুলে যান নি যে, তাঁর চিন্তার অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ সমগ্রতাও! তাই লিখেছিলেন—'বস্তুত সেটাকে অংশে-অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।'

অর্থাৎ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের মূল কথাগুলি কী, প্রবন্ধের কোন্ কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ কোন্ অংশ গৌণ, তা বুঝে নিতে হবে। কোন্ মানদণ্ডে এই মুখ্য-গৌণের বিচার করবো? রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার সামগ্রিক পরিণত যে-রূপ, সেই রূপটিকে সামনে রেখে তবেই বুঝতে পারি, কোন্ ঐক্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট কোন্ ভাবনাকে গ্রথিত করা চলে।

প্রথমেই লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নামই ছিলঃ 'স্বদেশী সমাজ'। কেননা, বারংবার নানা রচনায় সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'চিরদিন ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নিচে।

দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষ্ণার্তকে জল দিয়েছে, ক্ষুধার্তকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা—গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।....এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।'

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার এই একটি মূল সূত্র। অর্থাৎ ভারতবর্ষের পলিটিক্স নিয়ে তিনি যা-কিছু আলোচনা করেছেন, তার মেজর প্রেমিসটিই ছিল এই—'রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।'

'পাশ্চাত্ত্য রাজার শাসনে এখানেই ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে' অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত তার সামাজিক স্বরাজকে রাজশাসন অধিকার করায় 'গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে—শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশ্বত্থ গাছ, জাল-জালিয়াত মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না। রোগে-তাপে-দৈন্যে-অজ্ঞানে-অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।'

এই অবস্থায় দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদ বলে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন—দেশের প্রতি দেশের মানুষের সর্বব্যাপী অনীহা ওঔদাসীন্যকে। লিখেছিলেন, 'সকলের চেয়ে বিপদ হলো এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকার-বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে।'

অতঃপর,

> 'স্বদেশী-সমাজে তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা—এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম।'

কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়ে একদিন যখন চরকা-কাটা আর খদ্দর-পরাকেই 'সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ' বলে ঘোষণা করলেন, তখনই রবীন্দ্রনাথ এ-হেন অবাস্তব যান্ত্রিক অভ্যাস দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়াকে দেশের মানুষের প্রতি 'অপমান'-রূপে চিহ্নিত করতে দ্বিধামাত্র করলেন না! লিখলেনঃ 'খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ, এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে।'

রবীন্দ্রনাথ গভীর গ্লানি ও বেদনাবোধের সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে প্রসাদভিক্ষার তদানীন্তন কংগ্রেসী রাজনীতিকে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত করেছিলেন কিন্তু স্বদেশী সমাজ-এর যুগে দেশে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশপ্রভুর রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা ও গ্লানি অনুভব করতেন না বরং যাঁরা এই ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের পক্ষে অমঙ্গল ও অসম্মানজনক বলে মনে করেছেন, তাঁদেরই "পেসিমিস্ট, অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন।"

শুধু সেকালেই যে এঁরা ছিলেন, তা নয়, একালেও এমন রবীন্দ্র-দূষণের দুর্লক্ষণ মাঝে-মাঝেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, যাতে মনে হতে পারে, ব্রিটিশ প্রভুর দুয়ারে মিহি সুরে বা গলা মোটা করে ভিক্ষার জন্য সমবেত হওয়ার পরিবর্তে দেশনেতা ও দেশবাসীদের রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশের সাধনায় বাস্তব কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রবৃত্ত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং সে-কাজে আত্মনিবেদন করেছিলেন, তা বুঝি তাঁর দ্বিধা ও দুর্বলতারই নিদর্শন।—এই ধরনের অপব্যাখ্যা ছিল জেনেই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে—'আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ দ্রাক্ষাগুচ্ছ লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই।'

॥ দুই ॥

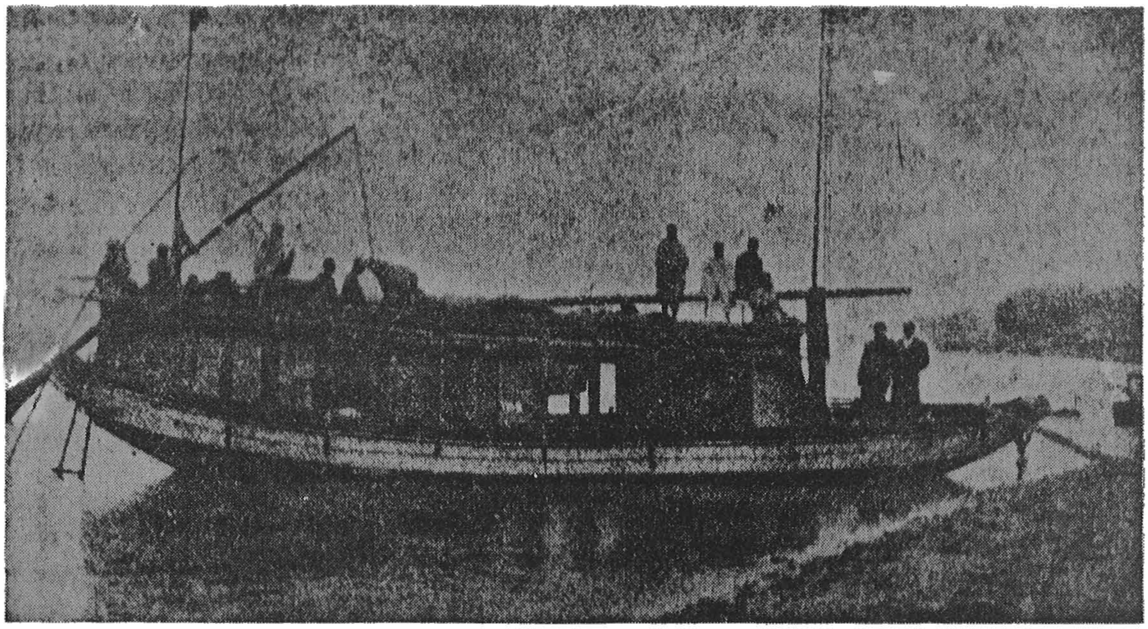
কেউ-কেউ আজও এই অপভাষ্য রচনার মূঢ়তা প্রকাশও করতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি সংগ্রামবিমুখ ছিলেন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মনোভাব তাঁর ছিল না আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের যুগ থেকেই বারবার স্বদেশের সাধনার দিকেই ঝুঁকেছিলেন অথবা গান্ধীজীর বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নি, তা হলে বলবো—এ হেন অপভাষ্য রচনার মূলে শুধু অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যই নয়, নিছক রবীন্দ্রদূষণের নিশ্চিত অপচেষ্টাও নিহিত। কেননা রবীন্দ্রনাথই সর্বাগ্রে, বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক তথাকথিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন আর গান্ধীজীর বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনকে বিচার করেছিলেন বিশুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব দিয়েঃ আর্থ-সামাজিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ('সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

ব্রিটিশের প্রতি কংগ্রেসের তোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট প্রতিবাদ, এমনকি ঘৃণাও—তাই নিন্দিত ও নিঃসঙ্গ হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েও তিনি গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও অনুভব করেন নি। স্বদেশী সমাজ রচনার যুগে বা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য গান্ধীজীর আহ্বানের কালে ভিন্নতর মত পোষণ ও প্রকাশের এবং তদনুযায়ী কর্মসূচী হাতে-কলমে গ্রহণের জন্য যে-সৎসাহসের প্রয়োজন হয়েছিল, তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত সেকালে বা একালেও অতীব বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা, অগণিত দেশবাসীও তখন গান্ধীজীর অভিমতেরই পোষকতা করেছিলেন। এইসূত্রে সকলেরই মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজী যখন বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রসঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে জোড়াসাঁকোর বৈঠকে বসেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই গান্ধীজীর গৌড়বাসী অন্ধভক্তের দল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে বিদেশী বস্ত্রের বহ্নুৎসবে মেতে উঠেছিল!

বস্তুত স্বদেশী সমাজ-এর যুগেও রবীন্দ্রনাথই দাঁড়িয়েছিলেন 'ভিক্ষা'র রাজনীতির বিরুদ্ধে। তার প্রতিক্রিয়াও তখনই দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুয়ারে 'ভিক্ষাবৃত্তি'র বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তখনই 'পেসিমিষ্ট' বা 'আশাহীনের দল' এই অভিধায় চিহ্নিত করা হতো! রবীন্দ্রনাথকেও সেই নিন্দা মেনে নিতে হয়েছিল। অবশ্য 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, 'আশাহীন' বা 'পেসিমিস্ট' আসলে কারা! তিনি লিখেছিলেন—

> আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিস্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ! গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ-কথা আমি কোনমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি।

'আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি'—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত-শোষিত ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার এই হলো মূলনীতি। স্বদেশ বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন? আমি ইতোপূর্বে দেখিয়েছি, 'ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি'—এই নির্ণয় রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভারতবর্ষকে সেভাবে জানেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষ ধরা পড়েছিল, শ্রমজীবী মানুষও। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে বিশ্বাস করার জোরটা পেয়েছিলেন, কেননা তাঁর স্বদেশ মুষ্টিমেয় অভিজাত ও ভদ্রলোকদের স্বদেশ ছিল না, এইখানেই রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির ভিত্তিটি



পদ্মাবক্ষে কবির বোট

খুঁজে পেয়েছিলেন সঠিকভাবেই। তাই 'পর'-এর অর্থাৎ ব্রিটিশের 'প্রসন্নতা' তথা দয়ার উপরে তাঁকে তাঁর দেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যগ্র হতে হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি' করে 'যে সার্থকতা'কে সেদিন জাতির অন্বিষ্ট বলে তাঁর মনে হয়েছিল, তা যদি জাতির স্বোপার্জিত না হয়, তা'যদি ব্রিটিশের প্রসন্নতার উপর ভিত্তি খুঁজে পেতে চায়, তা'হলে যে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসংশয়।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই তো তাঁর বক্তব্য ছিল— আমি নিশ্চয়ই জানি যে, যে-উপায়েই হোক, আমরা নিজেরই মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব, ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।'

স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধা ও মমত্ব সৃষ্টি ও বৃদ্ধি এবং বিদেশী পণ্যের যথাসাধ্য পরিহার্যতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকে পাছে কেউ ভুলভাবে দেখেন, তাই 'স্বদেশী সমাজ'-এর যে-সংবিধান রচনা করা হয়েছিল সে-সময়ে, তার আটটি প্রতিজ্ঞার প্রতি আমি এ কালের জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি—

"১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমজের কোনোপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজী খানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়ে সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সমাজের কর্তব্য আবদ্ধ থাকিবে—

সামাজিক ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলাবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, বিচার ও সাহিত্য।"

স্বদেশী সমাজ-এর প্রস্তাবিত সংবিধানটি উদ্যোগের প্রথম পর্বে স্বভাবতই সাধারণ্যে প্রচারার্থ ছিল না। সংবিধানটি আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন সমাজচিন্তা তথা রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, এই সংবিধানে সমাজপতি বা অধিনায়কে যে-ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে। সমাজপতি বা অধিনায়ক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না।'

শুধু 'স্বদেশী সমাজ' নয়, 'পল্লীসমাজ'-এর একটি সংবিধানও রচিত হয়েছিল। সেই সংবিধানটিও আলোচ্য প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

পল্লীসমাজ

সংবিধান

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে। শহর গ্রাম কি পল্লী-নিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজ-ভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন। পল্লীসমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীসমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন।

উদ্দেশ্য

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব-সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা-সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ পথ্য সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদির পালন-দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা-স্থাপন।

১০। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১। সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য-ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্তি করা।

১২। মিলনমন্দির ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩। পল্লীর তত্ত্ব-সংগ্রহঃ অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসিগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি অবনতি, বিদ্যালয় পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা বসন্ত অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্ধন।

১৫। জেলা-সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্যের সহায়তা করা।"

পরিকল্পিত স্বদেশী সমাজ ও পল্লীসমাজ এবং উভয় সমাজ সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংবিধান দুটি পর্যালোচনা করলে এ-বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না যে, পল্লীপঞ্চায়েত এবং সমবায় পদ্ধতির মূল কথাগুলি এই সময়েই রবীন্দ্র-ভাবনায় দানা বেঁধে উঠেছিল। আর যদি তারও আগে সূত্র অন্বেষণ করি, তা' হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই ১৮৬৭ সালে যে-চৈত্রমেলার সূচনা হয়েছিল, সেই চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যেই স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রভাবনার বীজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং সমবায় পদ্ধতি—দু'টির মধ্যেই পল্লীপ্রধান ভারতীয় সমাজের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ঠিকানা নিহিত দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায় পদ্ধতির উপর রবীন্দ্রনাথ কেন এত জোর দিয়েছিলেন, কেনই বা মনে করেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের করতলগত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের করুণার প্রত্যাশী হয়ে তাদের মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আমাদের বর্তমান অচল এবং ভবিষ্যতও অন্ধকার অথচ ব্রিটিশ শাসককে উপেক্ষা করেই আমরা নিজেদের সমাজে নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করে নিতে পারি। আর সেটাই তখন আশু করণীয়—তার মূল কথাগুলি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যেমন পাই, তেমনি পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধেও (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) পুনরায় তিনি লিখেছিলেন—আমাদের দেশকে কেউ পুরোপুরি আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না, কেউ দয়া করে স্বদেশকে আমাদের হাতে তুলে দিতেও পারে না। আমরা আমাদের অধিকার যে-পরিমাণে ত্যাগ করেছি, সেই পরিমাণেই অন্যে অধিকার করেছে আমাদের দেশকে। লিখেছিলেন—'এই চিন্তা করেই একদিন আমি স্বদেশী সমাজ নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর এক বার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে'।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা এত বেশি করে কেন সমাজমুখী, তা স্পষ্ট হবে তাঁর এই চিন্তাসূত্র থেকে—'চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। .....চীন-ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।'

॥ তিন ॥

গান্ধীজী প্রমুখ কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত ও সমবায়প্রণালী আনুষ্ঠানিকভাবে অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপনে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে অবশ্য তাঁর প্রেরণা-উৎস 'ভারতপথিক রামমোহন'। ভারতবর্ষীয় সমাজ-কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায়-প্রণালীর অপরিহার্যতা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশের মানুষকে।

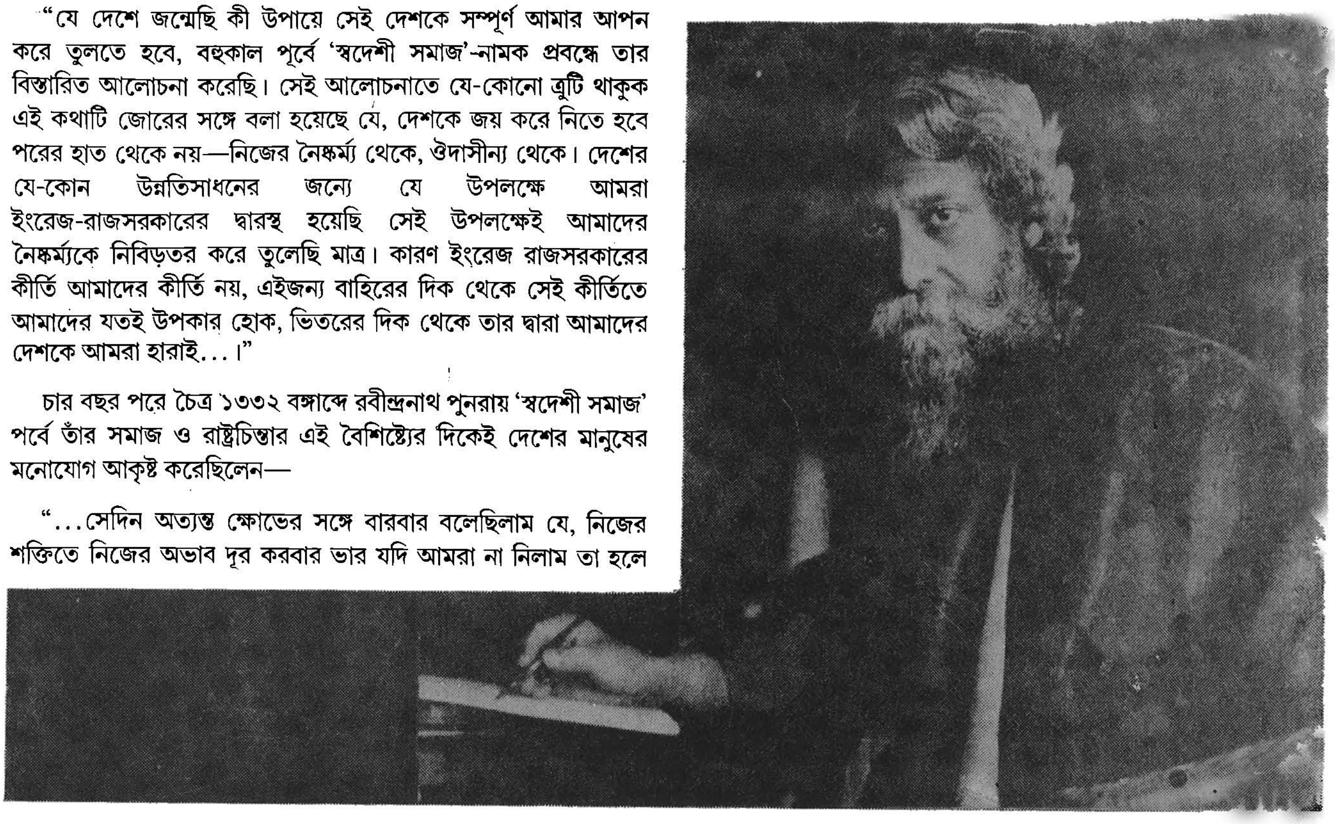
এই প্রবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত ''...আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে' অংশটি ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, যদিও এই প্রবন্ধেরই পরবর্তী অংশে 'কো অপারেটিভ ষ্টোর'-এর উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তথাপি, সমবায়-প্রণালীর উপযোগিতা ও প্রবর্তন প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট রবীন্দ্রভাবনা উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'সমবায়' প্রবন্ধটি থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার শ্রেয় বিবেচনা করেছি আমি।

১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রকাশিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটিরও মূল ও পূর্বসূত্রগুলি অবশ্য ঠিক একবছর আগে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই (এবং তৎসহ এক মাস পরে প্রকাশিত প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট অংশে) পাওয়া যায়।

আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তা-বিষয়ক রচনাবলীতে পরবর্তী সময়ে বহুবার ১৯০৫ সালে লেখা এই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির উল্লেখ করে গেছেন অক্লান্তভাবে। যেমন, কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন—

"১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলাম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

"যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে, বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ'-নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়—নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোন উন্নতিসাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ ইংরেজ রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই...।"



চার বছর পরে চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় 'স্বদেশী সমাজ' পর্বে তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই দেশের মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন—

"...সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলেছিলাম যে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব দূর করবার ভার যদি আমরা না নিলাম তা হলে দেশকে পাওয়াই হলো না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্য, অন্নের জন্য, জ্ঞানবিস্তারের জন্য, অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য, আমাদের লোকেরা রাজদ্বারে সম্মিলিত কণ্ঠে ভিক্ষা করবার উদ্দেশে সভায়-সভায় সংবাদপত্রে-পত্রে কখনো বা মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো বা ক্রোধের তাড়নার রাজভাষা আলোড়িত করে তুলছিলেন...আমি সেই আবেদনের পুনঃপুনঃ পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। তার কারণ কেবল এই অত্যন্ত বাহুল্য কথা নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় দেশের অভাব ও দুঃখ দূর হতে পারে...তার আর-একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের রাজশক্তির সঙ্গে যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা ভিক্ষুকের মতো করলে চলে না।"

রবীন্দ্রভাবনার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করতে হলে একটি মুহূর্তেই জন্য ভুললে চলবে না, রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল ভারতবর্ষ নামের একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে। মধ্যবর্তী আশি বছরের জীবনপরিধি শুধু দীর্ঘ নয়, সমকালীন স্বদেশ ও বিশ্ব-পরিস্থিতিও দারুণ জটিল, ঘটনাবহুল, বহুবিচিত্র পরিবর্তন পরম্পরায় মুহুর্মুহু দ্রুত ধাবমান। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা মূলত সেই দ্রুত ধাবমান বিচিত্র ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক ও মূলত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার দলিল।

রবীন্দ্রভাবনার লিপিবদ্ধ সেইসব রূপের কোনো-কোনো অংশ আজ শুধু পাঠকের, গবেষকের অস্বস্তিই জাগায় না, ত্রুটিপূর্ণ বলেও মনে হয়। মাত্র সতেরো বছরের ব্যবধানেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছিলেন ...'সেই আলোচনাতে ('স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে) যে-কোনো ক্রটি থাকুক'...ইত্যাদি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি, এমন-কী ভুলও থাকতেই পারে। সেগুলি অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে কিন্তু রবীন্দ্রভাবনার সেই অংশবিশেষকেই মুখ্য বা সমগ্ররূপে গন্য করাটাও আদৌ বস্তুনিষ্ঠ হবে না।

ব্রিটিশ রাজশক্তির দাক্ষিণ্য ভিক্ষার পরিবর্তে তখন রবীন্দ্রনাথ জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধনই কাঙ্ক্ষিত মনে করেছিলেন। ১৯০5 সালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব অনুভব করতে হবে, অনুভব করতে হবে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও—'আত্মশক্তিদ্বারা দেশকে যে পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারব সেই পরিমাণেই রাজশক্তির সঙ্গে সমকক্ষভাবে আমাদের ব্যবহার চলতে পারবে। এক পক্ষে কেবল প্রার্থনা, অন্য পক্ষে কেবল দাক্ষিণ্য, এর মাঝখানে যে ফাঁক সেটা অসীম। সে আমাদের আত্মাবমাননার প্রকাণ্ড গহ্বর। তখনকার কালের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি দুই অসমানের মিলনের সেতু নির্মাণ করতে লেগেছিল। আমি তখন বলেছিলাম—অসাম্যের মিলন অসম্মানের মিলন।

'আমি বলেছিলাম ভিক্ষা নেব না, নিজের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করার দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার করব।'

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে লিখেছিলেন, '...স্বরাজ কাকে বলে, সে আমরা সুতো কেটে খদ্দর পরে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না'। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণে ও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিত্য-অকুণ্ঠিত। তথাপি, রাষ্ট্রচিন্তায় গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিধাহীনভাবে সুস্পষ্ট।

তাই, চরকা-কাটাকে রবীন্দ্রনাথ নিছক একটি 'বাহ্য অনুষ্ঠান'-রূপে চিহ্নিত করেছেন বারংবার। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন, আত্মশক্তি উদ্বোধনের বাস্তব দৃষ্টান্ত জাতির সামনে স্থাপন করা হোক। সীমিত পরিসরের মধ্যে হলেও সেই দৃষ্টান্ত সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। একটিমাত্র গ্রামকে কেন্দ্র করেও যদি আমাদের স্বদেশের সাধনা মূর্ত হয়ে ওঠে, তাহলেই স্বরাজের স্বপ্নের চিত্র ও চরিত্রও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। তাই লিখেছিলেন—'যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার-পরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না—স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।'

রবীন্দ্রনাথ চরকার চালনাকে 'যান্ত্রিক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি কবি বলে নয়, রাষ্ট্রচিন্তায় যথেষ্ট বাস্তবসম্মত পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলেই। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দেও গান্ধীচিন্তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নিরূপণ করলেন রবীন্দ্রনাথ—'আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারংবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।...বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে।'

'বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ'—রবীন্দ্রনাথের এই সংশয় বছর আঠেরো পরেই ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট মধ্যরাতে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যরাতের সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকে যদি 'বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ'-লাভ বলে রবীন্দ্রভাষায় চিহ্নিত করা যায়, সত্যের অপলাপ হবে না। শুধু তাই নয়, এই ধরনের 'বাহ্য স্বরাজ' বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে এই বিশাল দেশের অগণিত মানুষকে স্বদেশের যথার্থ সাধনায় আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ করতে অপারগ হবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাই এই সূত্রেই লিখেছিলেন—'আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তারপরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি।...স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথা সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।'

এইসব কারণেই ১৯০৫ সালের ঐতিহাসিক কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ জাতির আত্মশক্তি উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায়-প্রণালী প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে, সমকালের কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানও নয়, বঙ্গভঙ্গের যুগে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায় প্রণালীর অপরিহার্যতা অনুধাবন করে জাতীয় জীবনে সেগুলি তৎক্ষণাৎ প্রবর্তনের জন্য সুস্পষ্ট উচ্চারণে আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রধানত কবিরূপেই প্রসিদ্ধ এবং কে না জানতেন, তিনি কলকাতার বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারেরই সন্তান, তখন তাঁর বয়সও মাত্র চুয়াল্লিশ।

এ হেন ব্যক্তিকে আমাদের দেশে মহাপুরুষ কিংবা অবতার, ঋষি কিংবা অন্যবিধ লোকোত্তর ক্ষমতাবিশিষ্ট পুরুষরূপে চিহ্নিত করে পূজাঞ্জলি অর্পণই স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচারে-বিশ্লেষণে আকস্মিকতা বা দৈবী অপব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

এ কথা ঠিক যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতির এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ঐতিহ্যের সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে নবজাত আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একটি যুগোপযোগী মেলবন্ধনও ঘটেছিল ঠাকুর পরিবারে।

আধুনিকতার বোধ ও বাস্তব জনজীবন-চেতনা প্রখর না হলে রবীন্দ্রনাথ চরকা প্রসঙ্গে এমন সোজাসুজি এমন নির্ভীক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারতেন না সেই সময়ে, গান্ধীজী যখন ভারতীয় রাজনীতিতে একছত্র অধিপতির আসনে অধিষ্ঠিত—

'আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই।'

রবীন্দ্রনাথ চরকা-চালনাকে 'বাহ্য প্রক্রিয়ায় অন্ধ পুনরাবৃত্তি' বলেছেন, তা কীভাবে 'পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের পথ' হতে পারে ঃ এই ছিল তাঁর ক্ষুব্ধ প্রশ্ন। 'চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রেখেছি'—গান্ধীজী এতকাল পরেও সেই একই মূঢ়তাকে যুগপৎ রাজনৈতিক আর আধ্যাত্মিক ছদ্মবেশ পরিয়ে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছেন ঃ 'দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ'কেই গান্ধীজী দেশের মুক্তির পথ, স্বরাজ-সাধন যাত্রার 'রাজপথ' বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ, বিচলিত। প্রশ্ন করছেন—'আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে—সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে? স্বরাজ-সাধন যাত্রায় এই হলো রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?'

রবীন্দ্রনাথ তাই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে লেখা 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে পুনরায় দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—'আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কবে কোন্ সুপ্রভাতে আমাদের আবেদনে-নিবেদনে বিগলিত হয়ে দয়া করে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবো আর তারপরে আমরা স্বদেশের সাধনায় মগ্ন হব, নিজেদের চরিত্র গঠন করবো, দেশের কাজে হাত লাগাবো—এই ধরনের যুক্তিক্রম ও কর্মসূচী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আদৌ কোনো সায় ছিল না। অলস দায়দায়িত্বহীনতার এই ধরনের অজুহাতকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তিরস্কৃত ও বিদ্রূপ-বিধ্বস্ত করেছেন বারম্বার। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন—

> যে মানুষ বলে 'আগে ফাউন্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব', বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব', তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙ করা কাঠামোটার' পরেই।

অনুরূপ আরো একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

> একজন আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেকদিন থেকে বলে এসেছিলেন, 'রীতিমতো স্টুডিও আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না।'—তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না, ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল ঃ স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না, মুখও চলে না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের তখনও অনেক দেরি, কংগ্রেস তার সূচনাপর্বে নিছক আবেদন-নিবেদনের স্তরেই তখনও নিতান্ত তাৎপর্যবিহীন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে জেনেছিলেন, 'আমাদের জীবনেরভিত্তি রয়েছে পল্লীতে'। বহু বছরের ব্যবধানে ৩০ ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লেখা শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত শতাব্দীর শেষ দশকের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।—

'আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায়, তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ এবং কত বড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল।'

এই অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাটি লাভ করেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—দেশের মানুষের জীবনের ভিত্তিটা যে পল্লীতে, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন।

এই সত্যের প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে ঘটেছিল তৎক্ষণাৎ। পল্লীবাংলার মানুষের বেদনা ও অসহায়তা তাঁর অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল বলেই 'তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ-দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে-এঁকে প্রকাশ করেছিলাম।' প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ দাবী করেছেন—'আমি একথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পল্লীবাংলার অভিজ্ঞতাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে জনজীবনের অভিজ্ঞতাকে শুধু সাহিত্যের উপকরণরূপেই ব্যবহার করে শৌখিন মজদুরিতেই তাঁর কর্তব্যের অবসান হলো বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর নিজের ভাষায়—

'সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই সব অসহায়-অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই?'

রবীন্দ্রনাথ বারম্বার অক্লান্তভাবে উচ্চারণ করছেন, তবু অদ্যাবধি দেশের এমন-কী শিক্ষিত অংশের সকলেরও সেসব কথা কর্ণগোচর হয় নি, তাই পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি—

'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁধে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় থেকে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কীভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।'

রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন, আমরা যদিও ভারতবর্ষকে তথাকথিত ভদ্রলোকদের দেশ হিসেবেই ধরে নিয়েছি, কিন্তু এর চেয়ে বড়ো মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। তাই তাঁর—

'তখন কেবলই মনে হতো, জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব, সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে! পল্লী-জীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয়, তা ভেবেই উঠতে পারি নি।'

কবি রবীন্দ্রনাথ কেমন করে কর্মী রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, তার নেপথ্য ইতিহাস এই কালপর্বেই, গত শতাব্দীর শেষ পর্বেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছিলেন—'আমার অন্তর্নিহিত গ্রাম-সংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ....সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল, যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন, তাই গ্রহণ করবো, এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম।'





রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

এই বছরটা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) জন্মশতবর্ষ। সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন: '......বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের বা বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্‌লা ভাষা' বলে ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র সুনীতিকুমার বলেছেন:

'যাঁরা কেবল ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা করেন, অনেক সময় তাঁরা 'সাহিত্য' বোঝেন না। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যাখ্যা কেউ কেউ ক'রেছেন—'যা কেবল ব্যাকরণের সহিত পড়া যায়'। নিছক ব্যাকরণকারকে সংস্কৃতে 'শাব্দিক' বলা হয়—শব্দ আর শব্দের বাহ্যরূপ নিয়েই যাঁদের কারবার। 'শাব্দিক' আর 'রসিক' এ দু'জনের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ। ....কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখতে পাই—তিনি শাব্দিকও বটেন, কবিও বটেন। শব্দ আর অর্থ, উচ্চারিত ধ্বনি আর তার ভিতরের ব্যঞ্জনা, এই দুইয়ের সম্বন্ধেই কবির মনে স্পর্শকাতরতা ছিল। ভাষার নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু সে নাড়ীনক্ষত্রের জ্ঞানটাই চরম বস্তু নয়, সে-কথাটা তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন। ......তাছাড়া, শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়ার যোগ্য বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তাঁর ছিল। আমাদের দেশে বহুকাল ধ'রে এই ধারণা চলে আস্‌ছিল যে বাঙ্‌লা ভাষা আর বাংলা ব্যাকরণের নিকট হ'চ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজকল্প দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাঙ্‌লাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা বাঙ্‌লাভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরবার চেষ্টা ক'রেছিলেন আর জোর গলায় ব'লেছিলেন যে, সংস্কৃতের সব নিয়ম বাঙ্‌লায় চলবে না, বাঙ্‌লার নিজস্ব স্বরূপটিকে ধ'রে দিতে হবে, যেটি বাংলাকে চিরকাল ধ'রে সংস্কৃতের সঙ্গে এক দড়িতে বেঁধে রাখবে না। এই দুইজন মনীষী হ'চ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এঁদের পথেরই পথিক ছিলেন, আর মনে হয় এঁদের চেয়ে আগেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছিল.......।'

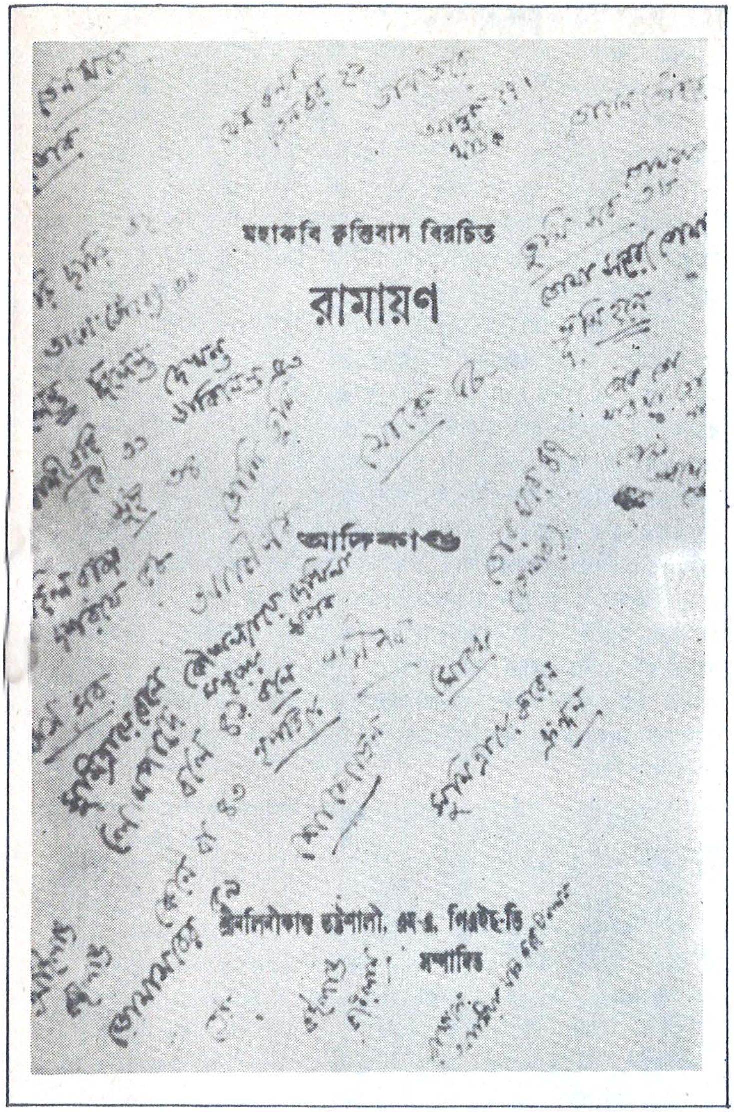
বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার প্রথম পরিচয় যে প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায় সেই 'বাংলা উচ্চারণ' যদিও প্রকাশিত হয়েছে ১২৯২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, তবু এ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তার সূচনা যে ১৮৭৮-৮০ নাগাদ হয়েছিল তার উল্লেখ ঐ প্রবন্ধেই আছে। বাংলা উচ্চারণের 'বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম' অনুসন্ধানের তাগিদ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যখন তাঁর বয়স সবে আঠার-উনিশ। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। বাংলা বানান ও উচ্চারণ যেমন তাঁর গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তেমনি শব্দার্থ ও রূপতত্ত্ব নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়, ধন্যাত্মক শব্দ, বিভক্তি, ক্রিয়ামূল, ধাতু, নির্দেশক প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বিস্ময়কর ও তুলনাহীন। খাঁটি বাংলার চারিত্র নিয়ে যে-আলোচনা তিনি শুরু করেছিলেন তার চেয়ে বেশিদূর এখনও এগোন যায়নি।



আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়হ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭



রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা প্রধানত বিধৃত আছে যে দুটি গ্রন্থে সেগুলি হল বাংলা শব্দতত্ত্ব আর বাংলাভাষা পরিচয়। তিনি নিজেকে কোথাও বলেছেন 'বৈয়াকরণ নহি' বা 'ব্যাকরণ ব্যবসায়ী নহি', কোথাও বা 'পণ্ডিত নই' আবার কোথাও বা 'শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু'। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে একজন ভাষাবিজ্ঞানীকে যে খুঁজে পাওয়া যায় তা সুনীতিকুমার থেকে পবিত্র সরকার সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। পবিত্র সরকার ত বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী স্থান শুধু বাংলা ভাষাতত্ত্বে নয়, পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও।' রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গ্রন্থে সংকলিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধে পবিত্র সরকার আরো বলেছেন, 'ধ্বনিতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের কাজের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক মূল্য এখন পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্যক স্বীকৃতির অপেক্ষা করছে।'

'বাংলা' এই বানানটি যে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত একথা আজ আমরা ভুলেই গেছি। আগে লেখা হত বাঙ্গালা বাঙ্গলা। পদ্যরচনায় যুক্তাক্ষরের দ্বিমাত্রা অনুসারে বাঙ্গলা শব্দে চারমাত্রার হিসাব, অথচ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' লেখার সময় বাংলা শব্দে কবির অভিপ্রেত তিন মাত্রা। তাই ঙ্গ দিয়ে বানান লেখা চলবে না, চাই অনুস্বার দিয়ে বাংলা। এটা হল 'ছন্দব্যবসায়ী কবির কৈফিয়ত'। কবির অন্যতর দৃঢ় যুক্তিটি হল: 'আমার প্রদেশের নাম আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। 'বাঙ্গলা' মুখে বলি নে লিখতেও চাই নে। যুক্তবর্ণ ঙ্গ-এ হসন্ত চিহ্ন নিরর্থক। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে, কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয় রূপ তো বর্ণমালায় আছে—সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।'

কি আর কী বানান দুটির প্রয়োগও রবীন্দ্রনাথের। বাংলা-ভাষা পরিচয় গ্রন্থে ১৪ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেছেন: 'কি যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। উহ্য বিশেষ্যের সহযোগে বিশেষণে এর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ: অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিস্ময় বোঝাতে, যেমন: কী সুন্দর।......বিশেষণ প্রয়োগে 'কী', যথা: কী কাজে লাগবে জানি নে। 'কী' বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বস্তুক বা অনির্দিষ্ট বোঝায়: ওর কী দশা হবে, কী হতে কী হল। বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, যেমন: 'কী রাম কী শ্যাম কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না।' অন্যত্র লিখেছেন, 'অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। 'তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়,' এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে। এখানে বানানের তফাত না থাকলে ভাবের তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।'

বাংলা সর্বনাম শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা খটকার জায়গা সম্বন্ধে চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলাভাষা পরিচয় গ্রন্থের ১৪ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে:

"আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে' এমন কথা শোনা যায়। কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিষ্কার হয় না। এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয়। আবার সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তাহলে দ্বিধা মেটে। 'আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে' বাক্যটা স্পষ্ট। গোল বাধে বহুবচনের বেলায়। কেননা বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দের' আর কর্মকারকের 'দের' একই চেহারার। এর একমাত্র উপায় 'কে' বিভক্তি দ্বারা কর্মকারককে নিঃসংশয় করা। 'আমাদেরকে তোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষার অমার্জনীয় ঢিলেমি।'

সংস্কৃত ব্যাকরণবিধির আনুগত্য থেকে বাংলা মুক্ত হোক এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। তাই প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সন্ধানে তিনি তৎপর ছিলেন। বাংলা বহুবচন, সম্বন্ধ পদ, উপসর্গ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁকে রীতিমতো গবেষণামূলক আলোচনা করতে দেখা যায়। যেমন তিনি দেখিয়েছেন: 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য ভাষায় তাহা নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধি বিচিত্রও; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।' বাংলা শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত সংকলন করে তিনি সেগুলিকে সাজিয়েছেন এভাবে—পুনরাবৃত্তিবাচক (বারে বারে, কথায় কথায়), পরস্পর-সংযোগবাচক (চোখে চোখে, কাঠে কাঠে), নিয়তবর্তিতাবাচক (সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে), দীর্ঘকালীনতাবাচক (চলতে চলতে, হেসে হেসে), প্রকর্ষবাচক (ঠিক ঠিক, নিজে নিজে), ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার দ্যোতক (যাব যাব, জ্বর জ্বর, কাঁদো কাঁদো)। এছাড়া আছে বহুলতাবাচক (নতুন নতুন, কালো কালো)। 'বাংলা বহুবচন' নামে একটি প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ শব্দদ্বৈতের উদাহরণ দিয়েছেন। সেখানে পরিমাণ-সম্বন্ধীয় (বস্তা বস্তা, মুঠো মুঠো) এবং সময়-সম্বন্ধীয় (বার বার, মাস মাস) বহুত্ববাচক বিশেষণের উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এগুলিকে তিনি 'বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ' বলে

উল্লেখ করেছেন। বাংলায় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে এগুলির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলা-ভাষা পরিচয় গ্রন্থে ১৩ অধ্যায়ে বলেছেন, 'খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধূ ধূ করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁ ঝাঁ : মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উস্‌খুস্‌, নিস্‌পিস্‌ ফ্যালফ্যাল কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের থেকে যেন উপরি পাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।'

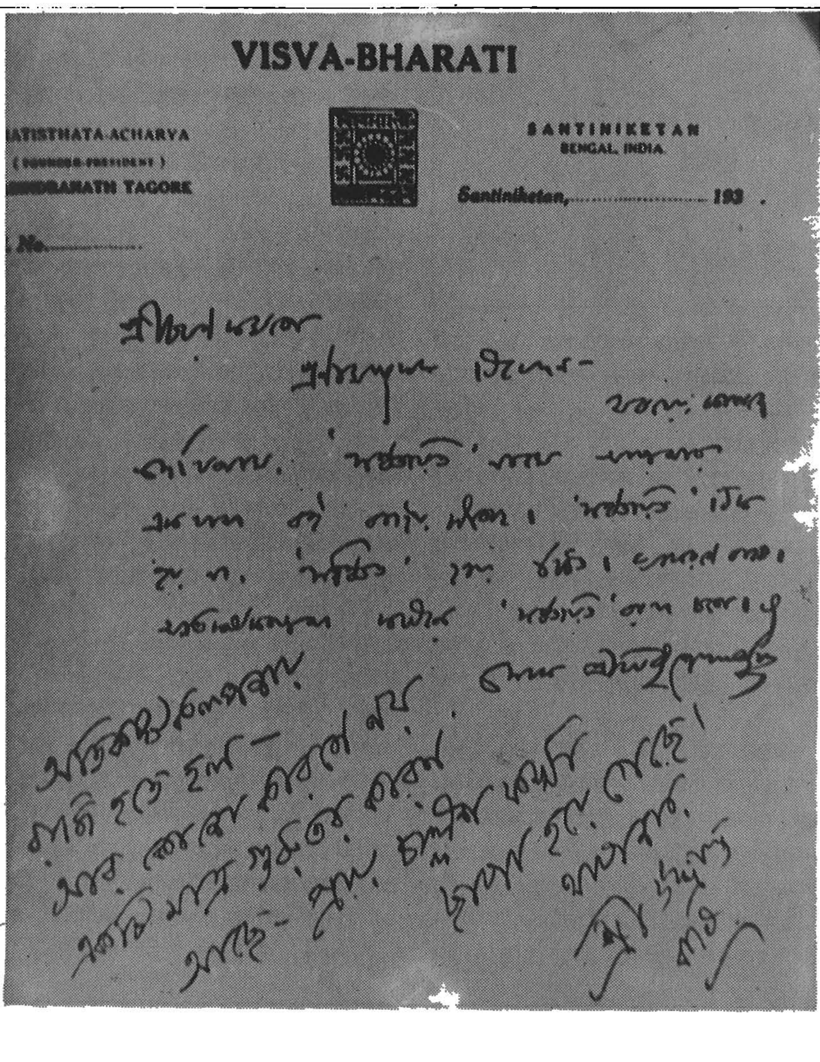
ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে আমাদের ভাষায় সবরকম ইন্দ্রিয়বোধই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হয়ে থাকে। 'গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে। সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিতভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।'

আবার ধ্বনির সঙ্গে যেসব ভাবের দূরসম্বন্ধও নেই তাও বাংলায় ধ্বনির সাহায্যে ব্যক্ত হয়, যেমন কনকনে শীত। শূন্যতা, স্তব্ধতা, নিঃশব্দতাসূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টান্ত হল খাঁ খাঁ, ধূ ধূ, হুহু, হাঁহাঁ। বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা হয় টকটকে, টুকটুকে, রগরগে, ধবধবে প্রভৃতি শব্দে। অবস্থাবিশেষে শব্দের যে হ্রস্বদীর্ঘতা ঘটে সেটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন: 'ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।'

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়াপদেরও অকারাদিক্রমে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথ এটি সংকলন করেন। এমন বিস্তৃত তালিকা সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ নিয়ে কিন্তু তেমন আলোচনা আর হয়নি।

বলা চলে, খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে উপকরণ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব নিয়ে তার বিন্যাস রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন। এখনও পর্যন্ত এ পথে তিনিই বুঝি একতম।

চলতি বাংলা ভাষার বানানবিধি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা সবার জানা। তাঁরই প্রেরণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বানানের নিয়ম বেঁধে দেন। তাতে অবশ্য প্রচুর বিকল্প বিধান ছিল। সেই বানানবিধি নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে সেই উপলক্ষে নানা নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে তাঁর মতামত ও মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তৎসম শব্দে হস্তক্ষেপ না হয় না করা গেল, অতৎসম বাংলার বানান যেন নিজের নিয়মে লেখা হয় তাই ছিল তাঁর অভিমত। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, 'সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে, এবং চিরদিন থাকিবেই—সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে—কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিশ আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয়।' তিনি চেয়েছিলেন 'বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসংগত নিয়মগুলি' উদ্‌ভাবিত হোক।


VISVA-BHARATI

SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA.

Santiniketan, ... 193 .

'সঞ্চয়িতা'র নামকরণ বিষয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রীর পত্রে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত উত্তর



রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত মনিয়ের উইলিয়মস্-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের একটি পৃষ্ঠা

বাংলায় তদ্‌ভব শব্দে যেন উচ্চারণের আনুগত্য মানা হয় এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষরবিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন—কিন্তু রসনা নির্জীব নয়—অক্ষর যাই লিখুক। রসনা আপন সংস্কারমতই উচ্চারণ করে চলে। সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোলো আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে, সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই। কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।'

'বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলায় ব্যাকরণ এক নহে'—একথা রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। ইউনিভারসিটি ইনস্টিস্ট্যুট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে উপস্থাপিত 'ভাষার ইঙ্গিত' নামে প্রবন্ধটির উপসংহারে কবি বলেন, 'মাতাকে সংস্কৃত ভাষার সমাস-সন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ববোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।'

বাঙালির উচ্চারণের যে নিজস্ব প্রবণতা আছে তাকে স্বীকার করে নিয়ে অতৎসম বানান লেখা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। এই শতাব্দের গোড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'বাংলা ব্যাকরণ' নিয়ে প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'নিজের জিনিস নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিসে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে—এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।'

রবীন্দ্রনাথ 'যখন' শব্দের বানান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন শব্দটি যৎক্ষণ থেকে আগত, অথচ ক্ষণ যদিও খন হল যৎ-এর 'য' রয়ে গেল 'জ' না হয়ে। খাঁটি বাংলায় যেমন মূর্ধন্য ণ-কে দন্ত্য ন করা স্বাভাবিক তেমনি অন্তঃস্থ য-এর বর্গ্য জ হওয়াই সংগত। কবি নিজে তাই যোড়াসাঁকো-কে জোড়াসাঁকো করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার কমিটি অসংস্কৃত শব্দে ণত্বষত্ব গ্রাহ্য না করে দন্ত্য ন-এর বিধান দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'ভূরি ভূরি সাধুবাদ' দিয়েছেন।

তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাংলা স্ত্রীজাতিসূচক কথাগুলিকে খাস বাংলা নিয়মেই ব্যবহারের পক্ষপাতী, 'খাস বাংলা হচ্ছে হ্রস্ব ই'। তাই চাষি, দামি, দাগি, দোকানি, ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি শব্দ 'সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়যোগে নহে, বাংলা ই প্রত্যয়যোগে' নিষ্পন্ন করেছেন।

বাংলা স্ত্রীলিঙ্গে হ্রস্ব ই যে স্বাভাবিক তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছেন: 'ঘোটকীর দীর্ঘ ঈ-তে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে—কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই, তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে।... হ্রস্ব ই-কে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ-র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।'

নীচ আর নিচে নিয়েও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। নীচ সংস্কৃত শব্দ, তার মানে হল mean। বাংলায় নিচে হল ক্রিয়াবিশেষণ, তার মানে হল below।

এছাড়া সংস্কৃতে রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্ববর্জন, পদান্তে বিসর্গ ও হসন্ত বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানে রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি সায় ছিল।

রাজশেখর বসুকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ...'অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়াকার করব।....'

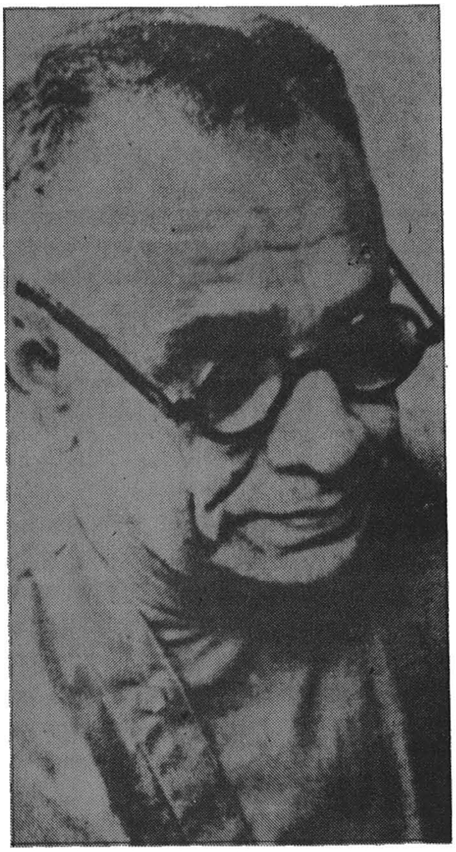
সেটা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। তারপর প্রায় ষাট বছর কেটে গেল। বাংলা বানানের সংস্কার নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা হয়েছে। ব্যাকরণসম্মত অথচ বাহুল্যবর্জিত বানানের আদর্শ রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে গিয়েছেন। তবু দ্বিধা এখনো গেল না। বোধকরি আমাদের রক্ষণশীল মনোভাবই এজন্য দায়ী।

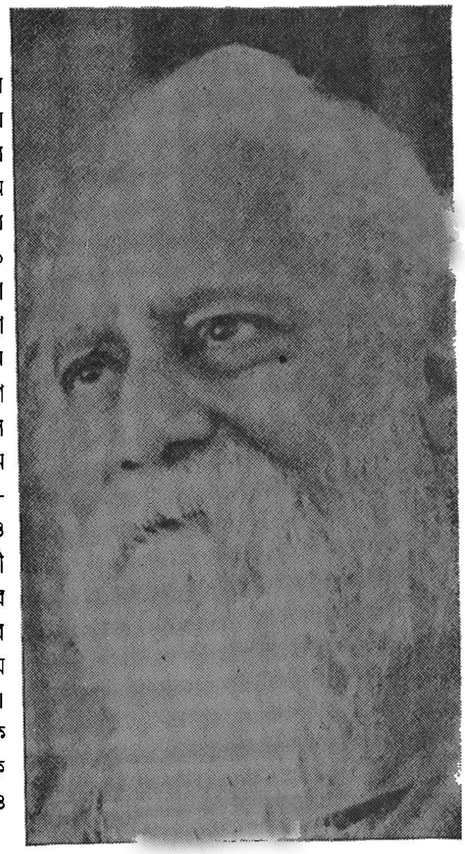




রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে শিশিরকুমার

সঞ্জীব সেন





॥ এক ॥

১৩ এপ্রিল ১৯১৯, স্থান পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ। এই সময় গভর্নর ও'ডয়ের এবং জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছিল। এই উদ্দেশ্যেই ৯ এপ্রিল পাঞ্জাবে নতুন সৈন্য তলব করা হয়েছিল। ১০ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসকেরা অমৃতসরের দু'জন জনপ্রিয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে বহিষ্কার করলে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীর-ঘেরা ময়দানে একটি বড় ধর্মীয় সমাবেশ হয়েছিল পুরুষ-নারী-শিশুসমেত। সেখানে প্রতিবাদের হাওয়াও ছিল। জেনারেল ডায়ারের হুকুমে সৈন্যবাহিনী অবিরাম গুলি চালায়। এর ফলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে এক হাজার অসহায় মানুষ নির্মমভাবে নিহত ও প্রায় দু'হাজার আহত হয়। ডায়ার কার্ফু জারি করে। চিকিৎসা-সাহায্য পৌঁছুতে না পারায় অনেক আহত প্রাণ হারায়। পরে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চলে।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরিণ দুর্বলতা এবং গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয়তায় কংগ্রেস এতবড় অত্যাচারের কোনো প্রতিবাদ করল না। রবীন্দ্রনাথ একা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর মণিহার 'নাইটহুড' (১৯১৫ সালে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেন। তিনি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যে চিঠি লেখেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। "....The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, bearing conspicious exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been mated out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that its can claim no Political expediency, far less moral justification.

.........And these are reasons which have painfully compelled me to ask your excellency, with due deference and regret, to relieve me of my tiltle of Knighthood, which I had the honour to accept from his majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration."

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিন যাঁরা সেই সময় রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থাকতেন, যেমন প্রশান্তকুমার মহলানবিশ, অধ্যাপক এন্ড্রুজ তাঁরা বুঝেছিলেন কী মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেস, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশও কবিকে বড় সভাসমিতি করতে তেমন উৎসাহ দেন নি। চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি (রবীন্দ্রনাথ) বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনি সভাপতি, তখন

সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারব না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি ? আমার (রবীন্দ্রনাথের) নিজের কথা নিজের মত করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলার সুযোগ পেলুম।"

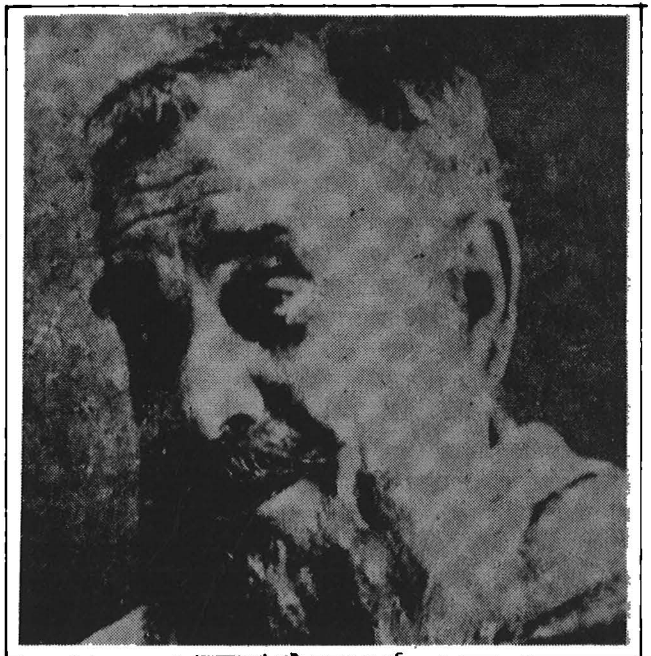
('লিপিকা'র সূচনা। শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬৭)

এই ঘটনা সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে আলোড়িত করেছিল। ১৯১৩ সালে শিশিরকুমার ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। সেই বছর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এবং ১৯১৩ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। শিশিরকুমার এবং সুনীতিকুমার দু'জনেই বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। শিশিরকুমার এবং সুনীতিকুমার শুধু বন্ধুই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে সারস্বত যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। শিশিরকুমার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ১৯১৪ সালের জুলাই থেকে ১৯২১ জুলাই পর্যন্ত। শিশিরকুমার ও সুনীতিকুমার প্রমুখ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন, তখন তাঁদের শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। অধ্যাপক মন্মথোমোহন বসু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত মানুষ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য ভাণ্ডার তাঁর কাছে বিপুলভাবে উন্মুক্ত ছিল। বিশেষ করে নাটকের উপর অধিকার ছিল অবিসংবাদিত। তিনিই শিশিরকুমারকে বিশেষ প্রেরণা দেন এবং প্রথম যৌবনে শিশিরকুমার ও সুনীতিকুমার নাটক প্রযোজনায় একসঙ্গে কাজ করেন। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখছেন—"(সুনীতিকুমার) প্রথম যৌবনেই য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করতেন। তখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও মার্জিত রুচির এই তরুণ অভিনেতার সঙ্গে দীর্ঘকাল বন্ধুত্ব সুনীতিকুমারের। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে গ্রিক বেশবাস সুনীতিকুমার পরিকল্পনা করেন। নাটকে সহজাত আগ্রহ ছিল বলে প্রায়ই দেখতে যেতেন, দেখাতে নিয়ে যেতেন অন্য বন্ধুদের। শিশিরকুমারের নটপ্রতিভা মুগ্ধ অভিভূত করে সুনীতিকুমারকে।"[১] নাটক হচ্ছে যৌথশিল্পের সমন্বয়। সমস্ত দর্শন, কলা, সমস্ত বিদ্যা সমন্বিত হয়ে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশলাভ করে, 'নাট্য' হয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়।

"নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।
ন তজ্ জ্ঞানং তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।"
(নাট্যশাস্ত্র)

সুতরাং মানুষের অধিত বিদ্যার আধার, লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি, যে নাটক তার প্রতি শিশিরকুমারের অনুরাগ এবং আকর্ষণ যৌবনের উন্মেষ থেকে। শিশিরকুমারের মত নাট্যতত্ত্বে জ্ঞানী মানুষ জেনেছেন যে, নাটক সামাজিকের দ্বারা এবং সামাজিকের জন্য। এবং সমাজের প্রতিটি আন্দোলন, মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা সমস্ত শিল্পের মধ্যে নাটকের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়। যেহেতু নাটক সরাসরি অনেক মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়। বিশ্বের সমস্ত মঞ্চ-নাট্যকারদের মতো রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন। তাই প্রায় সমস্ত রবীন্দ্র-নাটকে সমাজের আন্দোলন ও আলোড়ন প্রতিফলিত। প্রতিবাদী রূপ।

শিশিরকুমারের প্রিয় অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বাঙালির নাট্যচিন্তা প্রসঙ্গে বলেছেন—"বাঙালীর স্বাধীন মনোবৃত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙালী তাহার স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে ধর্ম সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা রাজনীতি সমাজনীতি সকল বিষয়েই বাঙালীর


'শেষরক্ষা' নাটকে চন্দ্রের ভূমিকায়

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বস্তুতঃ বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্রতা এরূপ প্রাচীন ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুস্থাপিত যে, তাহাকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নহে।"[২] পারম্পর্য বিবেচনা করলে শিশিরকুমারের মধ্যে অনন্যতন্ত্রতা ও সুদৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত চেতনা তাঁকে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে নিয়ে গেছে। সুতরাং ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা এবং রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ অধ্যাপক শিশিরকুমারকে সাহস যুগিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ মহলে এই বিষয়টি তখন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সময়কাল থেকে এবং রবীন্দ্রজীবন থেকে শিশিরকুমার যে শক্তি, সাহস ও কর্মতৎপরতা আহরণ করেছিলেন, তা তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধের আরম্ভের প্রাসঙ্গিকতায় শিশিরকুমারের 'পদ্মভূষণ' সম্মান ত্যাগ করার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ তারিখে শিশিরকুমার ভাদুড়ি দিল্লীর হোম সেক্রেটারী শ্রীবি এন ঝাকে একটি চিঠি লেখেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। শিশিরকুমার লেখেন—"I received a congratulatory telegram from the Home Secretary addressed to 'Srirangam', my theatre, which has been taken away from me by an order of the Court over three years ago for failure to pay rents. There are men in the Government and in the Akadamy, who are aware of the fact that the theatre has been my life's work, and they know that I have to-day no stage of my own to act on. They also know that there is no public-owned non-commercial stage, even in Calcutta, devoted to the cause of the advancement of the theatre as an integral part of our life as a nation, and the Government have no plans to build one.

If the Government really wished to honour me and through myself, the cause I have served for nearly forty years, a more befitting tribute would have been the gift

of a public stage to the city of Calcutta. For it is too late to retrieve the theatre I have lost.

I cannot accept the honour, and would request you to find out the means to relieve me of the burden of receiving it."

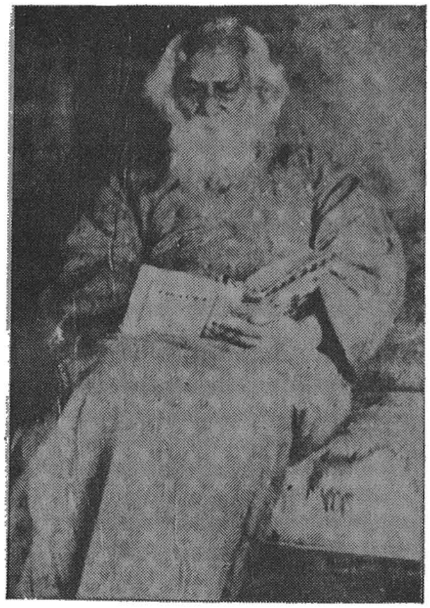
এই দুটি প্রতিবাদী চিঠির ভাষা এবং উপস্থাপনারীতি আলাদা। শিশিরকুমারের লেখার মধ্যে এত বিনয় নেই, যা রবীন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যে আছে। দুই অবস্থার ব্যবধান চল্লিশ বছর। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ইংরেজ শাসককে, আর শিশিরকুমার লিখেছেন স্বদেশী শাসকদের। কিন্তু বলাই বাহুল্য, শিশিরকুমারের রবীন্দ্র-সান্নিধ্য তাঁকে ব্যক্তিসত্তা প্রকাশের সাহস জানিয়েছে, জুগিয়েছে স্পষ্ট কথা বলার অধিকার।

।। দুই ।।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয়তার সব প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্থিতি পেয়েছিল। এবং সেই শিক্ষাই পরবর্তীকালে দেশ-কাল-সময়কে অতিক্রম করে সব শিক্ষার দর্শন হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে। আজ বিশ্বে ধর্ম ও জাতীয়তার উগ্র প্রভাব দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। এর আর্থ-সামাজিক কারণ হয়তো আছে, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় ঐতিহ্যবিমুখতা একটি অন্যতম কারণ। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলেন শিল্পের ঐতিহ্য চেতনা, এবং তা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় সমন্বিত। শিশিরকুমার নিজে বলেছেন—"রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রান্তর থেকে যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমনকি বার্ধক্যে পদার্পণ করার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।"[৩]

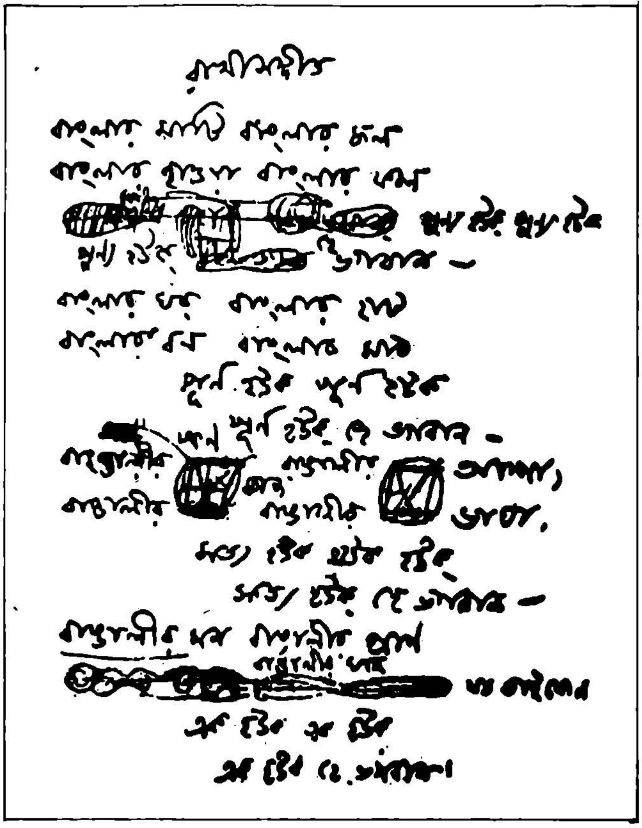
শিশিরকুমার দীর্ঘদিন কমার্শিয়াল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, তিনি একজন অন্যতম প্রধান নাট্যপ্রয়োগবিদ্‌রূপে সবসময় থিয়েটারকে নানা প্রয়োগনৈপুণ্যে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, যা তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন রাশিয়ার কনস্ট্যানটিন, স্তানিস্‌লাভস্কি (১৮৬৩—১৯৩৮), অস্ট্রিয়ান বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা ম্যাকস্ রাইনহার্ড (১৮৭৩-১৯৪৩, এঁর কর্মক্ষেত্র অবশ্য জার্মানি), জার্মান নাট্য পরিচালক এরউইন পিসকাটর (১৮৯৩—১৯৬৬), বেরটোল্ট ব্রেশট্ (১৮৯৮—১৯৫৬) এবং অবশ্যই গিরিশ ঘোষ (১৮৪৪—১৯১১) প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বের কাছ থেকে।

'অন্য থিয়েটারে', 'এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার', 'আর্ট থিয়েটার' ইত্যাদি নামে থিয়েটার যে নতুন উৎভাবনা, যা বাংলা থিয়েটারে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের অবদান, যেকথা শিশিরকুমার-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন, "যৌবনের প্রান্তর থেকে যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন", এবং শিশিরকুমারের যা দৃঢ় চাহিদা ছিল—"There is no public-owned non-commercial stage, even in Calcutta,"[৪] সেই সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রয়োজন। যা আমাদের রবীন্দ্রনাথ-শিশিরকে বুঝতে সাহায্য করবে।



মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে

ANDREW DAVIES, কেমব্রিজ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত তিনি একটি মূল্যবান বই লিখেছেন[৫]। সেখানে তিনি বলেছেন—"but as a working definition one might use the phrase non-commercial, i,e.theatre whose primary objective is something other than the making of a financial profit." তিনি আরো বলেছেন, "A truly popular from of drama based upon improvisation, variety and absence of any regid distinction beween stage and audience was replaced by a tradition of theatre which was elitist and spoke only to and for a few, ...The subsidised Companies which have grown up since the Second World War have been allowed a certain freedom to experiment whilst largely protected commercial pressures."



রবীন্দ্রনাথ এবং শিশিরকুমারের নাট্য-দর্শন একই ধারায় প্রবাহিত যার কিছু সংক্ষেপিত উক্তি এনড্রু ডেভিসের বই থেকে উদ্ধৃত করা হলো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন একটি মহৎ এবং বড় প্রতিষ্ঠান। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল প্রশ্নাতীত। সুতরাং তিনি তাঁর 'আদার থিয়েটার' গোটা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শহরে করতে পেরেছিলেন, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় তো বটেই, কখনো সাহায্য করতে কখনো সাহায্য তুলতে। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন থিয়েটারকে অবজেক্‌টিভলি দেখার ও করার। তবুও শিশিরকুমার তাঁর ধ্যানের থিয়েটারকে রূপায়িত করতে পারেন নি, অন্য থিয়েটারের এক্সপেরিমেন্ট আরো সফলতায় নিতে পারেন নি সামগ্রিক সহায়তার অভাবে।

শিশিরকুমারের অভাববোধটা কোথায়, এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি যেমনভাবে পেতে চেয়েছিলেন নাট্য-সংস্কৃতির পুনর্গঠনে, তেমনভাবে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় নি। অন্যভাবে বলা যায়, একমাত্র শিশিরকুমার ব্যতীত আর তেমন কেউ রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছোন নি। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬—১৯১৬) তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকে মঞ্চে আনেন[৬]। কিন্তু মঞ্চসজ্জা ও নাটক প্রযোজনায় অমরেন্দ্রনাথের বহু কৃতিত্ব থাকলেও রবীন্দ্রকাহিনী দ্বারা মঞ্চে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করেন নি। তবে তাঁর বড় অবদান যে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এনেছেন।

গিরিশচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উপযুক্ত এ্যাসেসমেন্ট ছিল না। তিনি সারা জীবন নাটক লেখা, অভিনয় ও প্রযোজনা নিয়ে বিভিন্ন মঞ্চে খুবই ব্যস্ত থাকতেন, এবং তাঁকে নিয়ে টানাটানিরও শেষ ছিল না। ফলে, পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্রের মনটাতে দ্বন্দ্ব ছিল, রবীন্দ্রনাথের লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি তিনি খুব পছন্দ করেন নি। তৎকালে আর একজন প্রধান নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু অসহিষ্ণু ছিলেন। এর অন্যতম কারণ ব্রাহ্মধর্ম হতে পারে, যেখানে উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের স্নায়ু-বিতর্ক ছিলই, যা রবীন্দ্রনাথ আরো বড় আন্তর্জাতিক ভাবনার 'গোরা' উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন।

তবে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদের তৃষ্ণা ছিলই, তা নাটকে ও আলোচনায় প্রতিফলিত। কিন্তু তিনি সেই মতবাদকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'হিন্দুধর্মের' সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই ভাবনা তাঁর কথাতে—"এই স্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে ধর্ম ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না। কারণ ভারতবাসী সকলে একধর্ম নহে।...... এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন, নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্মই প্রকৃত 'হিন্দুধর্ম'। মনুষ্য মাত্রই পরমাত্মার মূর্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরমধর্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নরসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানুষের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্মে পার্থক্য কোথায়?"[৭]

বিতর্কটা উঠেছিল 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) নিয়ে। প্রসঙ্গ উঠেছিল যে-সমস্ত ব্যবহারিক পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানে মুসলিমদের স্থান রাখা হয়নি, যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল হিন্দুদের। উপরের উল্লেখিত (বিবেকানন্দের কথা) গিরিশের জবানীতে দেখা যায় মানবসেবার নামে হিন্দুধর্মেরই জয়গান করা হয়েছে— "এই সেবাধর্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম।" অর্থাৎ হিউম্যানিজিম্‌কে ধর্মের বটিকা দ্বারা হজম করবার চিরাচরিত রীতি। গিরিশচন্দ্র সেই প্রভাবেই অনুপ্রাণিত। অথচ রবীন্দ্রচিন্তা প্রবাহিত হয়েছে অন্য ধারাতে। তিনি বলেছেন— (ক) "য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধি দ্বারা তাঁদের কর্মকে মহৎ করে তোলেন,—তাঁরা দূরকালের জন্যে প্রাণপণ করেন, সর্বদেশের জন্য। তাঁরা যথার্থ ভক্ত—"[৮]।

(খ) "এই জন্যেই ধর্মের নাম দিয়ে পৃথিবীতে নিদারুণ উপদ্রব ঘটচে এমন বৈষয়িক লোভের তাগিদেও নয়। ধর্মের আক্রোশে যদি বা উপদ্রব নাও করি তবে ধর্মের মোহে মানুষকে নির্জীব করে রাখি তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে-মজ্জাতে নির্দিষ্ট করে ফেলি দৈবের প্রতি দুর্বলভাবে আসক্ত করে, নানা কাল্পনিক বিভীষিকার বাধায় পদে পদে প্রতিহত করে তাকে লোকযাত্রায় অকৃতার্থ ও পরাভূত করে তুলি। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সেই হতভাগ্য দেশে সর্বপ্রকার দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গল অব্যাখ্যাতে অচল হয়ে ওঠে।"

(গ) "দেশে চারদিকে তোমার শত্রু আছে ম্যালেরিয়া, মূর্খতা, গোঁড়ামি, নিরুদ্যম, পরস্পর ঈর্ষ্যা কলহ নিন্দুকতা মূঢ়ের আত্মাভিমান, আরো কত কি—এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা, সুবিবেচনার দ্বারা—এর উপর পঞ্জিকাবিহারী শত্রুভয় আর বাড়াও কেন? যে দেশের হাড়ে মজ্জায় নানা আকারে ভয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েছে,—এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না, সে দেশকে বাঁচাবে কে?"

(ঘ) "যারা নিজেকে ধর্মকর্মের পুতুল করে তোলে তারাই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের প্রতিদিন পুনরাবর্তনের দ্বারা নিজের শূন্যতাকে ভরাট করে মনে করে জীবন সার্থক হলো। যে সকল ক্রিয়াকর্মে বুদ্ধির অন্ধতা এবং হৃদয়ের জড়তা, সেই সমস্ত নিরর্থকতার জালে নিজেকে নিয়ত জড়িয়ে রাখা ভুলিয়ে রাখার মত দুর্গতি আর নেই।"



গিরিশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত তফাৎ এখানেই। এই জন্যই গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্র-নাটক করেন নি। এমনকি তাঁর কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন নি। একবার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (পূর্বে যাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে) গিরিশচন্দ্রকে 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই উপন্যাসকে 'দুর্নীতিমূলক" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের এই ধরনের শুচিবায়ুতা ছিল, যেখানে শিশিরকুমার একেবারেই মুক্ত। বিশাল রবীন্দ্রনাথের রচনা ও কর্মকাণ্ডের খুবই সামান্য অংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, যার মৌলিক উপাদান নাট্যসারথি শিশিরকুমার গ্রহণ করেছিলেন নাট্যদর্শন হিসেবে। তাই তাঁর রবীন্দ্রমূল্যায়ন সংস্কারমুক্ত।

শিশিরকুমার বলেন,—"লোকশিক্ষার জন্য যতরকম প্রয়োজন সকল জাতির মধ্যে আছে, তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, রোমক সভ্যতা, জগতের সফল সভ্যতার যুগে এমন কি বর্তমানের কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে পর্যন্ত অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁদের বলে দিতে হবে না যে, ফাইন আর্টের আরম্ভ স্থাপত্য, দেবায়তন, চার্চ ও মসজিদ নির্মাণকৌশল থেকে এবং এর পূর্ণ পরিণতি নাটকে। নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না। নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিকরা বলেন, নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে। 'No playwright has come halves with the actor more than Shakespeare'—এই যে শেক্সপিরীয়ান অন্তর্দৃষ্টি নাটক লেখার সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। তাঁর 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'তপতী', যাঁরা অভিনয় করেছেন বা অভিনয় দেখেছেন এ বিষয়ে তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্য-সাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সঠিক যোগ সম্বন্ধ সেটা সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হতে পারতো। কিন্তু হায়, এত কিছু হবার পূর্বেই—

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
রিক্ত হলো সভাতল, আঁধারের মসী অবলেপে
স্বপ্নছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হলো
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনি সংকেতে।"[৯]

শিশিরকুমারের এই অভিব্যক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে অভিমান যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হলো না। শিশিরকুমার এখানে বলতে চেয়েছেন, গিরিশপরবর্তী যে নাট্যশালা যার মালিক ও সংগঠকগণ অবশ্যই ভালো অভিনয়কেন্দ্রিক নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছেন (নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ), যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে এসেছে। কিন্তু প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ যে নাটক ও নাট্যশালা প্রবর্তন করেন, সেই বিষয় ও প্রয়োগরীতি আলাদা—"তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নাট্যসাহিত্য নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করিয়া নাট্য-রচনা শুরু করিলেন। তাঁহার নাটকের সহিত পূর্ববর্তী নাট্যধারার কোনো যোগ নাই। তাঁহার নাটকীয় চেতনার উৎস হইয়াছে তাঁহারই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি।"[১০] রবীন্দ্রনাথের নাট্য-বৈশিষ্ট্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমানার মেলবন্ধন, চেতনার মেলবন্ধন, মানুষের জীবনের জয়গান এবং সমাজের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিচ্ছবি। শিশিরকুমারের ধ্যানে ছিল এই নাট্যধারার স্থায়ী প্রবর্তন, চিন্তা ও প্রয়োগের নতুন দিগদর্শন। এই এলিটিস্ট নাট্যভাবনা সাধারণ রঙ্গালয়ে পৌছায় নি। শিশিরকুমারের একক চেষ্টায় অনেক এগিয়ে গেছে।

।। তিন ।।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই, যার ধারাবাহিকতা উনিশ শতকে আশির দশক থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা হলো শিক্ষিত-মধ্যবিত্তদের মধ্যে রবীন্দ্রানুরাগ। শিশিরকুমারের (জন্ম ২ অক্টোবর ১৮৮৯, মেদিনীপুরে মাতুলালয়ে) পিতা হরিদাস ভাদুড়ি ছিলেন রুড়কি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার। তিনি উচ্চপদে চাকুরি করতেন এবং প্রবাসে থাকতেন। ফলে, হরিদাস ভাদুড়ির পরিবারে ইংরাজি শিক্ষাচর্চা ও ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ স্থায়ী হয়েছিল। শিশিরকুমারের মাতা কমলেকামিনী, মাতামহ অত্যন্ত সুপুরুষ কৃষ্ণকিশোর আচার্য। তিনি শিশিরকুমারের বাল্যকালে পঠন-পাঠনের দেখাশুনা করতেন। কৃষ্ণকুমার ছিলেন জাতীয়তাবাদী মানুষ। ন্যাশনাল নবগোপাল মিত্রের (হিন্দুমেলা ১৮৬৭ খ্যাত)-প্রভাব তাঁর উপর ছিল এবং রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই কৃষ্ণকিশোরের জীবনধারায় ছিল ইংরাজি শিক্ষার যুক্তিবাদ এবং জাতীয়তাবাদ। তাঁর প্রভাব শিশিরকুমারের মধ্যে লক্ষিত হয়। এবং শিশিরকুমার বাল্যকাল থেকেই ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের (শেলী, কীটস, বায়রন প্রমুখ) রচনার সঙ্গে পরিচিত হন, সুকণ্ঠে

আবৃত্তি করেন। তাঁর শেক্সপীয়ারের বই সেই সময় থেকে। শিশিরকুমারের চেহারায় ছিল মাতামহের আভাস, আবৃত্তির প্রতি অন্তরঙ্গ অনুরাগ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় রবীন্দ্রকাব্যে। শিশিরকুমারের মা কমলেকামিনী ছিলেন অপরূপা ব্যক্তিত্বময়ী। জ্যেষ্ঠপুত্র শিশিরকুমারের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি শিশিরকুমারকে নাট্য সম্পর্কে পরামর্শও দিতেন।

হরিদাস ভাদুড়ি কলেজ স্ট্রীট এলাকায় একটি বড় বাড়িতে বাস করতেন। রাঁধুনি, ঠাকুর, কাজের লোক, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এক বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করতেন হরিদাস ভাদুড়ি। কলেজস্ট্রীট তখন যুক্তি-তর্ক ও আন্দোলনের পীঠস্থান। সময়টা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট্, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ প্রভৃতি ছিল তর্ক-বিতর্ক সাংস্কৃতিক ও স্বদেশিক আন্দোলনের ভূমি। রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই প্রায় সকলেরই আলোচ্য বিষয় ছিলেন—সাহিত্যে কাব্যে এবং জীবনচর্চায়। সেই সময় যাঁরা শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের মধ্যে দাদাঠাকুর, সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, গৌরিশংকর ভট্টাচার্য প্রমুখেরা ছিলেন। অর্থাৎ শিশিরকুমারের সঙ্গে তৎকালীন সারস্বত যোগ খুবই অন্তরঙ্গ ছিল। এবং যেমন শিশিরকুমারের মা ও ভাইরা (পাঁচ ভাই তারাকুমার, বিশ্বনাথ, হৃষীকেশ, মুরারী মোহন এবং ভবানীকিশোর। একটি বোন—গৌরীদেবী) সকলেই বড়দা শিশিরকুমারের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে ভালবাসতেন, তেমনই তাঁর বন্ধুরা। শিশিরকুমারের অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করতে ভালবাসতেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে কাটাকাটা উচ্চারণে কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি অত্যন্ত মনোহারী হতো। যৌবনে বন্ধুদের আসরেও শিশিরকুমারের আবৃত্তি শুনতে সকলেই পছন্দ করতেন। অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার লিখছেন "১৯২২ সালের প্রথম বর্ষা নেমেছে। মনে হচ্ছে ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়েছিল। আমাদের বৈঠকটা ছিল তাঁর স্মৃতিসভা। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তাঁর নতুন কবিতা, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনলাম,

বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল রণভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়,

এই পড়া সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছিল যার সত্যমিথ্যা জানি না। শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাকি কবিতাটি শোনার পর রাস্তায় বের হয়ে আপার সার্কুলার রোডের ট্রাম-লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, যদি জানতাম যে আমি মারা গেলে কবি আমার উদ্দেশে এমনই একটি কবিতা লিখবেন তাহলে আমি এখনই ট্রামে চাপা পড়তে রাজি আছি"।[১০] এই উদ্ধৃতি শিশিরকুমারের রবীন্দ্রকাব্যপ্রিয়তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী স্মৃতিচারণ করেছেন—ছাত্র জীবনেই শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর কণ্ঠে 'বন্দীবীর' (রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত) কবিতায় আবৃত্তি সকলেরই প্রশংসা পেয়েছিল।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। নাটক—'বৈকুণ্ঠের খাতা', স্থান—কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট্ (প্রথমে নাম ছিল Society for the Higher Training of Youngmen)। পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং নাট্যগবেষক মন্মথমোহন বসু (১৮৬৮-১৯৫৯) মহাশয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন শিশিরকুমারের প্রেরণাদাতা এবং নাট্যশিক্ষক। এ কথা শিশিরকুমার নিজের মুখে বারবার বলেছেন। সেই সময় কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সারস্বত চর্চার কেন্দ্র। এখানে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য পণ্ডিত সুধীজন নিয়মিত আসতেন। শিশিরকুমার ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটের সদস্য হন স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময়। কলেজের তখন নাম ছিল জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ কলেজ। সেখানে তিনি 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটে শিশিরকুমারের পারফরমিং আর্টসের দিকেই বেশি ঝোঁক দেখে মন্মথমোহন বসু তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে 'রেবতী' চরিত্রে অভিনয় করতে বলেন। শিশিরকুমার নারী চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হননি। ঐ মঞ্চেই শিশিরকুমার ১৯১২ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় রবীন্দ্রনাথ দেখতে এসেছিলেন। কারণ তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজনেই এই অভিনয়। শিশিরকুমারের কেদারের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। কেদারের পার্টে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঠাকুরবাড়িতে অভিনয় করেছিলেন। এই খবর জানতে পেরে শিশিরকুমার খুবই প্রেরণা লাভ করেন।

॥ চার ॥

"মঞ্চে রবীন্দ্রভাবাদর্শের প্রবক্তা শিশিরকুমার" বলেছেন প্রবীণ নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১২], একথা আমরা বলেছি, শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলেন জীবনদর্শন ও সাহসিকতা এবং সেই আদর্শই তিনি প্রয়োগ করেছেন মঞ্চে রবীন্দ্রপ্রতিভার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে। ফলে, তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কাছে পৌঁছুতে পেরেছিলেন উত্তরকালে।

সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন শিশিরকুমারের অন্যতম বন্ধু। তাঁর নাটক 'তখত-এ আউস' শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয়েছে। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শিশিরকুমার। শতদল গোস্বামীর একটি লেখা থেকে জানা যায়[১৩] যে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সবন্ধু জোড়াসাঁকোতে যেতেন রবীন্দ্র-সন্দর্শনে। 'সেখানে ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের স্নেহধারা অকৃপণভাবে তাঁদের মাথায় এসে পড়ে।' অর্থাৎ ঠাকুরবাড়িতে শিশিরকুমারদের প্রবেশ ছিল অবারিত। তবে এককভাবেও শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন নাটক সম্পর্কে নানা পরামর্শ নিতে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগকলার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি রচনা করেন ১৯০২ সালে (বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), তাতে তিনি তাঁর নাট্য প্রয়োগভাবনা অনেকটাই প্রকাশ করেছেন। ১৯১৫ সালে 'ফাল্গুনী' রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের আগে তিনি কিছু প্রয়োগ-পরিচিতি ব্যাখ্যা করেন। (এই তথ্য জানা যায় দর্শক হিসেবে কালিদাস নাগ মহাশয়ের ডাইরি থেকে। ২৫ এপ্রিল, ১৯১৫)। নাটকের আগে রবীন্দ্রনাথ দর্শকমণ্ডলীকে বলেন—"সম্প্রদানের দিনে আমি কতকটা বিচলিত হয়েছি—আমার কন্যাটি (নাটকটি) আপনাদের কাছে কিরকমভাবে গৃহীত হবে। আমি আমার কন্যাকে সম্পূর্ণ নিরাভরণা করে আপনাদের সামনে এনেছি এবং যেহেতু অলঙ্কার মাঙ্গলিক হিসাবে প্রয়োজন, তখন বরপক্ষ (দর্শক) আপনারাই তা দেবেন।.......নাটকের অনেক সরঞ্জামের দাবি আমি পূরণ করতে পারিনি। কতকটা ইচ্ছে করেও করিনি। দৃশ্যপট, কনসর্ট, যবনিকা প্রভৃতি সব বাদ দিয়েছি। এই যে গাছের ডাল কেটে কৃত্রিম বন তৈরি হয়েছে—এটাও আমার ইচ্ছে ছিল না, এই সব সরঞ্জাম দর্শকদের অনেক সাহায্য করে। কিন্তু এই সাহায্যই সম্প্রতি এমন বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে দর্শকদের কল্পনা নাকি লোপ হবার সামিল হয়েছে। নাট্যকারের লেখায় যদি প্রাণ থাকে তাহলে দর্শকবৃন্দের কোন বাধাই থাকা উচিত নয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কল্পনা করে নিতে। আশা করি এ ক্ষেত্রে আপনারা

তাই করবেন এটি আমার বিনীত নিবেদন।" রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধের ভাবনা তিনি প্রয়োগে আনলেন 'ফাল্গুনী' নাটকে। ফাল্গুনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। ফাল্গুনী নাটক পরে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়।

ঠাকুরবাড়ির মঞ্চসজ্জা করতেন হ·চ·হ· (হরিশচন্দ্র হালদার), তিনি অতি নিকৃষ্ট বিলিতী অনুকরণে দৃশ্যপটগুলি আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। একথা জানিয়েছেন শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।"[১৪] রবীন্দ্রনাথ পরে এই বিলিতী অনুকরণ বর্জন করেছিলেন। চিত্রপট অপেক্ষা চিত্তপটে বেশি আস্থাশীল ছিলেন তিনি। এই শিক্ষাই শিশিরকুমার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিলিতী নকল ত্যাগ করে ভারতশিল্পের প্রবর্তন করেন। "পরবর্তীকালে আমাদের চোখের সামনেই অবশ্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রমুখ বিখ্যাত নটপ্রধানগণকেও বিলিতী নকল ছেড়ে মঞ্চসজ্জায় ভারতশিল্পের প্রবর্তন করতে দেখেছি।"[১৫]

জোড়াসাঁকোতে ফাল্গুনী নাটক করার সময়ও বিলিতী মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জা বর্জিত হয়েছিল। নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন। তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটিমাত্র লাল ফুল এবং তার উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা। সম্ভবত, শিশিরকুমার ঠাকুরবাড়ির প্রযোজনা ফাল্গুনী দেখেছিলেন। বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং এই প্রযোজনা দেখে শিশিরকুমার নাট্যপ্রযোজনার আঙ্গিক সম্পর্কে সূত্র পান। শিশিরকুমার বিদেশের নাট্যপ্রযোজনা বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত থিয়েটার এবং আধুনিক ইউরোপীয় থিয়েটারের (মেয়ার হোলদ্, ব্রেশট প্রমুখ) সংমিশ্রণ ঘটেছে। যাত্রা থিয়েটার অপেরা মিলেমিশে গেছে। নাটকের যা এক নতুন উদ্ভাবনা।

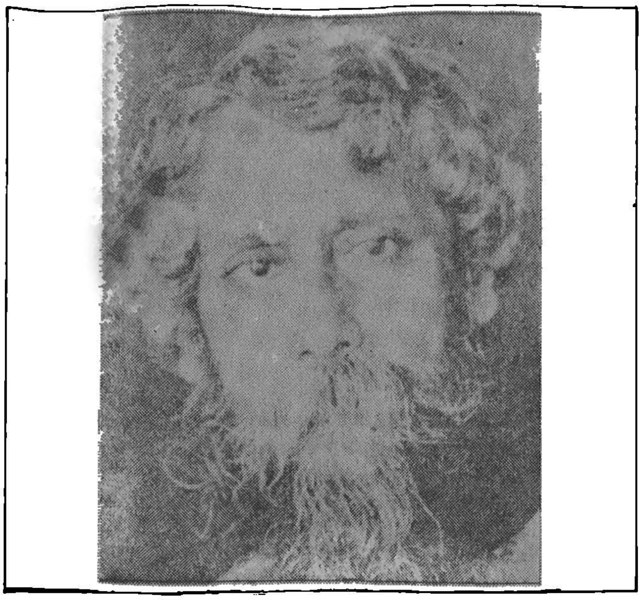
শিশিরকুমার ১৯২১ সালে ওল্ড ক্লাবের সদস্য হিসেবে স্টারে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অভিনয় করেন এবং নাট্য-পরিচালনা করেন। লেখক ও সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় (আসল নাম—প্রসাদ রায়, ১৮৮৮—১৯৬৩) ২৫ জুন ১৯২১ তারিখে 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় লেখেন— "........জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাইরে বাংলা নাট্যজগতে সর্বপ্রথমে নবযুগোপযোগী প্রয়োগকৌশলের পরিচয় পেয়েছিলুম সেই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাট্যাভিনয়েই। শিশিরকুমারের অভিনয় তখনও যে অতুলনীয় ও প্রথম শ্রেণীর হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য ......।" অর্থাৎ হেমেন রায় ঠাকুরবাড়ির প্রযোজনার সঙ্গে শিশিরকুমারের নাট্য-পরিচালনার নৈকট্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চে এই গুণগত পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

শিশিরকুমার অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে পেশাদারী মঞ্চে যোগ দেন ১৯২১ সালে। ম্যাডান কোম্পানি কর্নওয়ালিস সিনেমাকে (বর্তমানে হাতিবাগানে শ্রী সিনেমা হল) রঙ্গমঞ্চে রূপান্তরিত করেন, নাম দেন বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি। শিশিরকুমার এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) 'আলমগীর' নাটকে সফলতার সঙ্গে অভিনয় করেন। কিন্তু ম্যাডান কোম্পানির সঙ্গে শিশিরকুমারের বনল না। আদর্শের অনেক তফাৎ। মালিক চান—অর্থ রোজগার, শিশিরকুমার চান গুড থিয়েটার। শিশিরকুমার ম্যাডানে তিনটি নাটকে অভিনয় করে ওদের ত্যাগ করেন।

শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটারে 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন ৬ আগস্ট ১৯২৪ তারিখে। পঞ্চম রজনীতে বিশেষ আমন্ত্রণে (১৭ আগস্ট ১৯২৪) শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নাট্যমন্দিরে সীতা দেখেন। রবীন্দ্রনাথ সীতার উপস্থাপনা ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু নাটকটি তাঁর ভালো লাগেনি। তাই তিনি তাঁর দুটি নাটক শিশিরকুমারকে দিয়েছেন মঞ্চায়নের জন্য। একথা রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানিয়েছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে।



রবীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী



শিশিরকুমার ছাড়াও অন্য গোষ্ঠীও রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছেন। জনসম্বর্ধনা লাভে এগিয়েছিল 'রাজা ও রানী এবং 'চিরকুমার সভা'। হাতিবাগানের স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেন চিরকুমার সভা ১৮ জুলাই, ১৯২৫ তারিখে। রবীন্দ্রনাথ দেখতে এলেন ২৫ জুলাই। ভূমিকাতে ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীলাসুন্দরী, রাণীসুন্দরী, নীহারবালা প্রমুখ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' নাম দিয়ে নাটকাকারে পরিণত করেন। পরে তিনি 'শেষের রাত্রি' গল্পটিকে নাট্যরূপ দেন 'গৃহপ্রবেশ' নামে। স্টারে অভিনয় হয়েছিল ৫ ডিসেম্বর ১৯২৫।

শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের সাতটি নাটকের মঞ্চায়ন ও অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন। এই নাটকগুলো হলো বৈকুণ্ঠের খাতা, বিসর্জন, শেষরক্ষা, তপতী, চিরকুমার সভা, শ্যামা ও যোগাযোগ। এই নাটকগুলোর মঞ্চায়ন উপলক্ষে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা'কে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করার পূর্বে শিশিরকুমারের হাতে দেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন—"আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রভক্ত শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ির আগ্রহাতিশয় দেখে কবি চিরকুমার সভাকে নাটকাকারে গেঁথে প্রথমে তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন—তখন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে সীতা চলছে মহাসমারোহে। ....মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'চিরকুমার সভা'র মহলাও শুরু হলো। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে একসংগে ভালো গান গাইতে ও ভালো অভিনয় করতে পারেন অক্ষয়ের ভূমিকার উপযোগী এমন অভিনেতা পাওয়া গেল না।"[১৬] শিশিরকুমার পরে স্টারে একরাত্রির জন্য চিরকুমার সভাতে অভিনয় করেন (২৯ জুলাই ১৯২৯) চন্দ্রবাবুর ভূমিকায়। পরে নাট্যনিকেতনে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) চিরকুমার সভাতে রসিকের ভূমিকায়ও অভিনয় করেন[১৭]।

রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ করেছেন শিশিরকুমারের জন্য। শিশিরকুমার দর্শকদের মানসিক অবস্থা, আচার-বিচার অনুমান করে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন নাট্যরূপের কিছু পরিবর্তন করতে শেষের দিকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হন নি। শিশিরকুমারের প্রতি স্নেহবশত তিনি যোগাযোগের উপসংহার খানিকটা বদলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—"তোমার যোগাযোগ ক'দিন মনে রাখবে? আমার যোগাযোগ বরাবর থাকবে।"

শিশিরকুমার প্রায়ই জোড়াসাঁকো অথবা শান্তিনিকেতনে যেতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করতে। বিসর্জন মঞ্চস্থ করার সময়ও এই সক্রিয় সম্মেলন কয়েকবার ঘটে। রবীন্দ্রনাথ নাটকের কিছু সংস্কার করেন। নতুন গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের 'বিসর্জন' অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেখেন। 'শেষরক্ষা' নাটক শিশিরকুমার অসাধারণ দক্ষতায় মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে রাতে নাট্যনিকেতনে 'শেষরক্ষা' দেখতে যান, সেই অভিনয় দেখতে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আমন্ত্রণে উপস্থিত হন। একই প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে নাটক দেখা একটা বড় প্রাপ্তি। একথা বলেছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল শিশিরকুমারকে দিয়ে 'রক্তকরবী' নাটকটি করানো। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার রক্তকরবী মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। পারেন নি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নাট্যরূপকে (শ্রীনরেন্দ্র দেবকৃত) মঞ্চে আনতে। এর কারণ, শিশিরকুমারের একধরনের অস্থিরতা। হৃদয়ের টান ও মননের টানের সঙ্গে ব্যবহারিক থিয়েটারের দ্বন্দ্ব তাঁকে বারবার অস্থির করে তুলেছে। নিজের নাট্যমঞ্চ ছিল না, ছিল না বিদেশী নাট্য-প্রতিভাদের মতো করে একস্পেরিমেন্ট ও সৃষ্টি করার অর্থ। প্রায় সারা জীবন অসংখ্য প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে করতে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন, শিশিরের প্রচণ্ড উদ্যম কত বাধা পাচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথ একসময় শিশিরকুমারকে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের একটি অসাধারণ চিত্র দিয়েছেন অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ যখনি কলকাতায় আসতেন শিশিরকুমারকে ডেকে পাঠাতেন কবিতা শোনাবার জন্য। 'যোগাযোগ' রবীন্দ্রনাথ দেখতে এসেছিলেন স্টার রঙ্গমঞ্চে। "কবির আগমন বার্তা নাট্যাচার্য পূর্বে প্রচার করেন নি। অভিনয় শেষে কবিকে প্রণাম করতে গেলাম। প্রেক্ষাগৃহে তখন শ'দুয়েক দর্শক তখনও কবির প্রতি শ্রদ্ধায় অপেক্ষা করছে। উচ্ছ্বসিত কবি বললেন—'শিশির তোমাকে আমি ভেবেছিলাম বিপ্রদাসরূপে দেখব। কিন্তু তোমার মধুসূদন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তুমি তোমার সংস্কৃতি, রুচি, ব্যক্তিত্ব, চালচলন, কথাবার্তা সবকিছু লুকিয়ে রেখে কি করে মধুসূদন করলে? আর কঙ্কা, তোমার কুমুদিনী যেন বাস্তব হয়ে এখনও আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।' নাট্যাচার্য বললেন—'কিন্তু দেখুন না কটি লোক এই অভিনয় দেখতে এসেছে।'[১৮]

অথচ 'রীতিমত নাটক' (জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত) দর্শক নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমি কি অনেক আগে জন্মেছি।" দর্শকদের রুচি বুঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রীতিমত নাটক দেখতে চাইলেন। শিশিরকুমার বললেন—ও নাটক আপনার দেখার মতো নয়। তবুও রবীন্দ্রনাথ রীতিমত নাটক দেখতে এলেন। দু'পাশে বসলেন শিশিরকুমারের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশিরকুমার সেই অভিনয়ে নার্ভাস, তাঁর খুবই সংকোচ হচ্ছিল। অভিনয় শেষে সবাই প্রণাম করলে রবীন্দ্রনাথ বললেন—"বাঙলা দেশ এই রকম নাটক চায়, ঠিক আছে আমি চেষ্টা করে দেখি আমি পারি কিনা।" নাট্যাচার্য বললেন— "না, এ ধরনের নাটক আমরা আপনার কাছ থেকে চাই না। আপনি যা দিয়েছেন তার মূল্যবোধ আজ হয়ত হবে না। কিন্তু বাঙালি একদিন না একদিন আপনার এই নাটকের মূল্যায়ন ভবিষ্যতে করতে পারবে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের প্রায় পঞ্চাশ বছরে আমরা অনুভব করছি শিশিরকুমারের সেই ধারণা কত বড় সত্যতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারের দর্শন আজ সারা বাংলাদেশে ও ভারতে পরিব্যাপ্ত।

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুকুমারী ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃঃ ২০
২। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৯)। পৃঃ ২১
৩। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ। সম্পাদনা—দেবকুমার বসু। পৃঃ ৩১-৩২
৪। কলকাতার এবং জেলাগুলোতে পাবলিক থিয়েটার বা সরকার-অধীন থিয়েটার এখন (১৯৯০) অনেকগুলো আছে। যদিও আরো বেশি প্রয়োজন। যেমন—অহীন্দ্র মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, ইনভারসিটি-ইনস্‌টিটিউট, মহাজাতিসদন, গিরিশ মঞ্চ প্রভৃতি। জেলাগুলোতেও রবীন্দ্রভবন আছে; বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব রঙ্গালয় আছে, কিন্তু এটা বাস্তব যে, শিশিরকুমারের সময়ে তেমন কোনো সরকারী হল ছিল না বা তাকে দেওয়া হয় নি, যেখানে তিনি তাঁর ভাবনায় থিয়েটারকে পাওনাদারদের রক্তচক্ষুর বাইরে রূপায়িত করতে পারেন।
৫। OTHER THEATRES. Andrew Davies. (Preface এবং Introduction) আজকের গ্রুপ থিয়েটারের সমস্যার কথাও বলেছেন—"although in recent years the reduction of public subsidy in relation to rising costs and inflation has meant that commercial criteria are beginning to dominate these companies programmes and methods."
(Publisher—Macmillan Education Ltd. London)
৬। "রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস, অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া, পূর্বেই মহলায় পড়িয়াছিল। এখন তিনি টাকা হাতে পাইয়া, ২৭ শে নভেম্বর, ১৯০৪, তাহা মহাসমারোহে অভিনীত করাইলেন। প্রথমাভিনয় রজনীর পরিচয়লিপি ঃ—মহেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেহারী—মনোমোহন গোস্বামী, বিনোদিনী—কুসুমকুমারী, আশা—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), অন্নপূর্ণা—জগত্তারিণী, রাজলক্ষ্মী—পান্নারাণী।"

(রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ। শ্রীরমাপতি দত্ত। পৃঃ ৩৮০)

২৪শে জুলাই ১৮৯৭ অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। এই সুখ্যাতি শুনে রবীন্দ্রনাথ ও নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটারে এসে 'রাজা ও রানী' নাটকের অভিনয় দেখেন। অমরেন্দ্রনাথ 'বিক্রমদেব' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

(রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ। পৃঃ ১৫৫-৫৬)

৭। গিরিশ-মানস। উৎপল দত্ত। পৃঃ ৭৫
৮। (ক) চিঠিপত্র। নমব খণ্ড। পত্র সংখ্যা—২৩
(খ) ঐ পত্র সংখ্যা—৫৩
(গ) ঐ পত্র সংখ্যা—৫৬
(ঘ) ঐ পত্র-সংখ্যা—৯৯
৯। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ। সম্পাদনা-দেবকুমার বসু। পৃঃ ৩২-৩৩
১০। বাংলা নাটকের ইতিহাস। অজিতকুমার ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩০৯
১১। প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। সুশোভন সরকার। পৃঃ ৮
১২। মঞ্চে ও নেপথ্যে শিশিরকুমার। পশ্চিমবঙ্গ। শিশিরকুমার সংখ্যা। ১৯৮৯
১৩। দেশ। ১৭ মার্চ ১৯৯০
১৪। রবীন্দ্রস্মৃতি। শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পৃঃ ৩৭
১৫। ঐ
১৬। রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার। জগন্নাথ ঘোষ। পৃঃ ১২
১৭। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ রঙ্গালয়। হরীন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রভাবনা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৩। সপ্তম বর্ষ। নবম-দশম সংখ্যা। পৃঃ ২৬
১৮। দেশ। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯। শিশিরকুমার ঃ অন্তরঙ্গ স্মৃতি। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।
১৯। ঐ



রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার



নৃপেন্দ্র সাহা

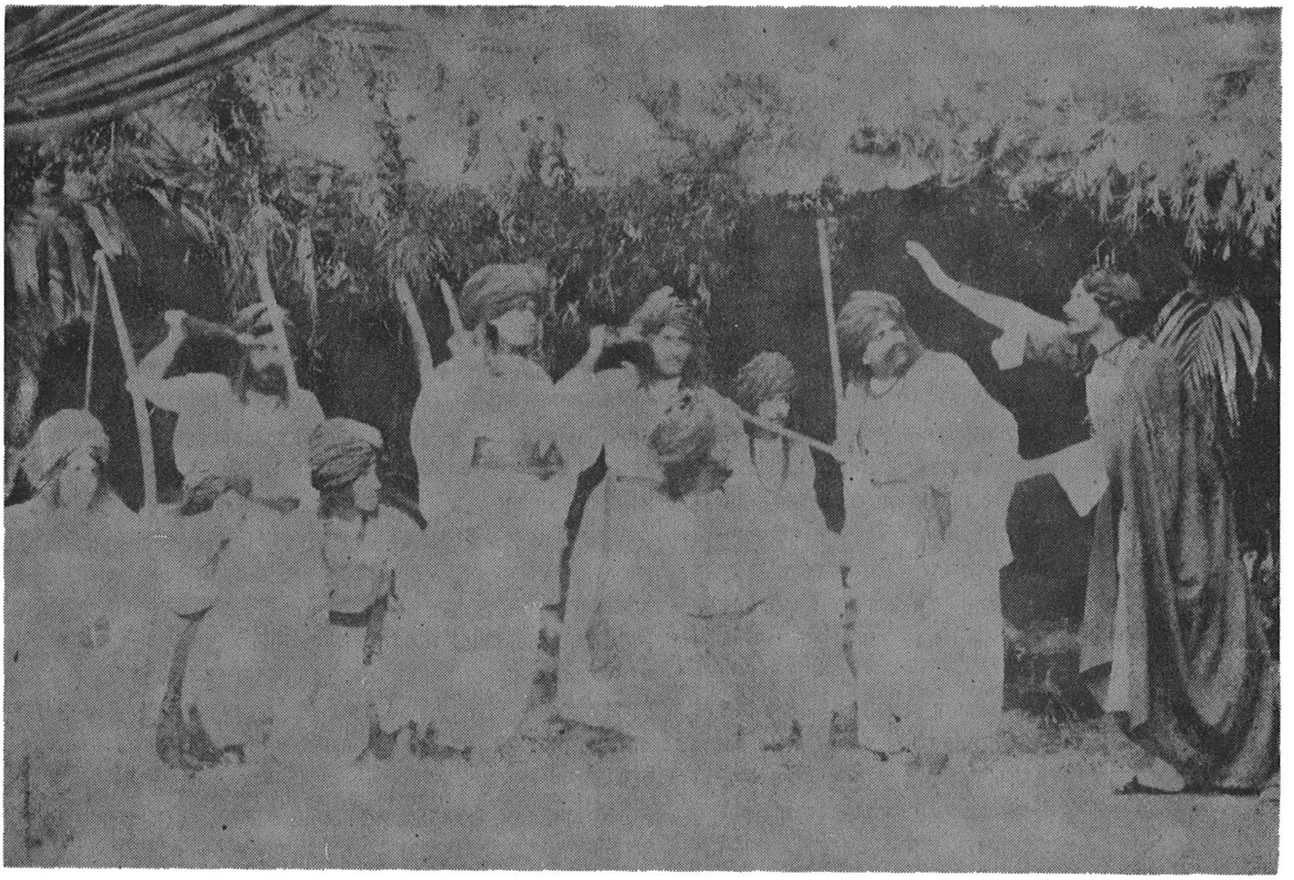
'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার' নামেই[১] সম্প্রতি একখানি সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয় রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভা কিভাবে রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে তদানীন্তন সাক্ষ্যপ্রমাণে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করা; এছাড়া রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য ও তার প্রয়োগভাবনা বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি এতাবৎ কম লিখিত হয়নি; রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর নাট্যভাবনাকে নানাভাবে গ্রথিত করে গেছেন নাট্যরচনা ও প্রযোজনার পাশাপাশি, সেই রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারকে কেন বাংলা থিয়েটারের মূল ধারার থিয়েটাররূপে বিবেচনা করা গেল না, অথচ এই রবীন্দ্র থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে বাঙালী মন ও মননের নিজস্ব নাট্যরূপটি, তারই এক বিনীত অনুসন্ধানে বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনকালে তেষট্টি বছর[২] ধরে নিরন্তর নাট্যচর্চার দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চপ্রয়োগের ধারায় একটি পৃথক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় উল্লেখ্য নাট্য-রচনা ও প্রযোজনা তাঁর জীবনকালেই সমাদৃত হয়েছিল এবং উত্তরকালে তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছে রুচিশীল নাট্যপ্রেমিকের কাছে। তা সত্ত্বে তাঁর নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চভাষাকে বাংলার নিজস্ব নাট্যধারার প্রাত্যহিকতার সঙ্গে সর্বাংশে জড়িয়ে নেওয়া গেল না, এর কারণ কি? এর কারণ কি সেই বহুকথিত প্রবাদবাক্য যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কেবল আইডিয়ার বাহনমাত্র[৩]? এতে নাট্যগুণ নেই। কিংবা যে নাটক পাবলিক স্টেজে পর্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল, সেই 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যখন বলেন যে 'এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্রাবল্য, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি।[৪] এবং এই বক্তব্যই তাঁর অধিকাংশ নাটক সম্পর্কে প্রযোজ্য? কিংবা রবীন্দ্রজীবনকালে তাঁর প্রতিটি নাটকের সফলতম মঞ্চপ্রয়োগের যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক[৫] থেকে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যপ্রবাহে সার্থকতম রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনার ঐতিহ্য নির্মাণ সত্ত্বেও রবীন্দ্র সাহিত্য গবেষক প্রমথনাথ বিশীর ভবিষ্যদ্বাণী 'দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচির যতই উন্নতি হোক রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবেনা।'[৬] —মন্তব্যই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠবে।

এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বিষয়ে শিশিরকুমারের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিশির কুমার লিখছেন—



'বিসর্জন' (১৮৯০) অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ



'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

'বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্ত্তা। যৌবনের প্রারম্ভ হতে যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্ত্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।...আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানাদিক থেকে।'[৭]

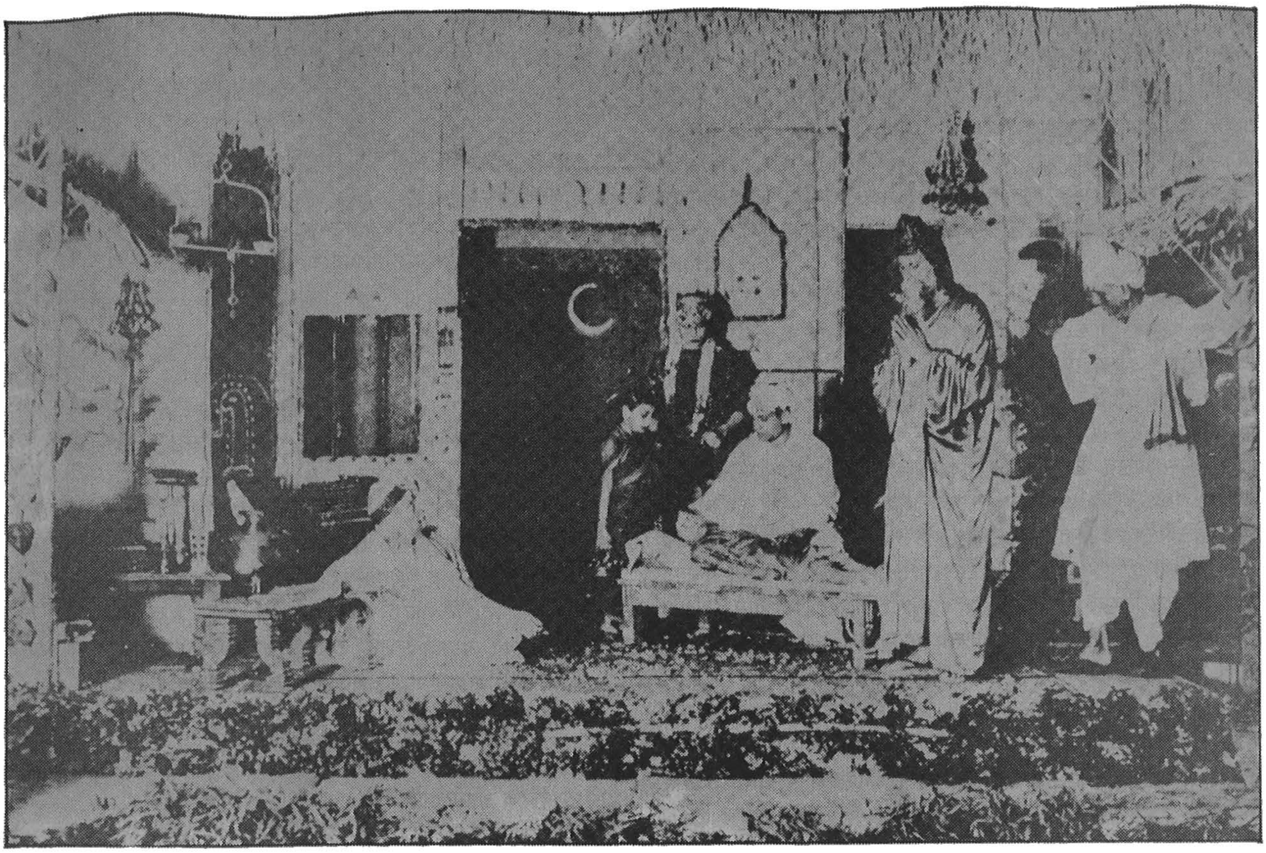
এ পর্যন্ত শিশিরকুমার যা বলেছেন, তা তাঁর অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন বাস্তবতাও বটে; তবে এর পরেই নাট্যকার ও প্রয়োগশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি একটি অভিযোগ করেছেন, যে অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে শিশিরকুমারও নিশ্চিত ছিলেন না, এবং উত্তরকালও এ অভিযোগের কোন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেনি। শিশিরকুমার অভিযোগ করছেন—

'সে অপূর্ব প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত আপনার আলোকে উজ্জ্বল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলা সাহিত্যের হয়ে সমান আসন দাবী করা সম্ভব ক'রে তুললো, সেই নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তাঁর শক্তির এবং প্রাচুর্যের অতি অল্প অংশই ব্যয় করলেন। যেভাবে শেক্সপীয়ার, ইবসেন বা হাউপ্টম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সবল করে তুলবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠতো তা হলে আজকে বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্নপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো।'[৮]

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও তার নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, সে অবদান সম্পর্কে শিশিকুমারের অভিযোগ যে যথার্থ নয়, একথা আজ বাংলা থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা ও ভাবনা সম্পর্কে অবহিত সামান্যতম কৌতূহলী পাঠকও স্বীকার করবেন। শিশিরকুমারের এ অভিযোগের মধ্যে আক্ষেপ যত আছে, তথ্য ও যুক্তির সমর্থন তত নেই।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় যখন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামাঙ্কিত হয়ে যাত্রা শুরু করে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র এগারো। এবং ১৮৭৭-এ তিনি যখন 'এমন কর্ম আর করব না'য় অলীকবাবু-র ভূমিকায় প্রথম তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন, তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী?', 'আয় ঘুরে আয় সোনারচাঁদ' (বেঙ্গল থিয়েটার); 'আদর্শ সতী', 'চোরের উপর বাটপাড়ি','প্রণয়কানন', 'বিদ্যাসুন্দর ও কুব্জ' প্রভৃতির পাশাপাশি 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (গ্রেট ন্যাশনাল), 'মেঘনাদ বধ' (ন্যাশনাল থিয়েটার) ইত্যাদির অভিনয় চলছিল। ১৮৮১তে প্রথম যখন তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' বিদ্বজ্জনসভায় মঞ্চস্থ হচ্ছে, তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হচ্ছে 'হামির', 'রাসলীলা', 'তিলতর্পণ', 'শিবের বিবাহ', 'কুব্জ', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক এবং ধর্মপ্রাণ দর্শকরুচির উপযোগী অতিশায়িত ভাবাবেগের নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের এইসব নাটক ও তার প্রযোজনারীতি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে খুব একটা উৎসাহিত করেনি, যদিচ সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধের প্রেরণা, এবং এই



প্রেরণাসূত্রেই সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচালক ও নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক থিয়েটারের পরিচালক ও শিল্পীদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'রবিজীবনী'[৯] সূত্রে জানা যাচ্ছে ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'নবীন তপস্বিনী' দেখতে যান রবীন্দ্রনাথ, কিংবা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর জন্য (গ্রেট ন্যাশনালে ১৫ জানু শনিবার ১৮৭৬ প্রথম অভিনীত) দেশাত্মবোধক গান 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' রচনা করে দেন তিনি। এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সঙ্গে তাঁদের ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ও করেছেন বলে শোনা যায়।[১০]

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষানবিশী পর্বে যেমন সময় দিয়েছেন, তেমনই তাঁর নাট্যজীবনের সূচনাপর্ব থেকে (১৮৮৬-র ৩রা জুলাই গ্রেট ন্যাশনালে কেদার চৌধুরী নাট্যরূপায়িত 'বৌঠাকুরানী' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' কিংবা ১৮৯০-এর ৭ই জুন এমারেল্ডে অভিনীত হয় 'রাজা ও রানী') পরিণত কাল পর্যন্ত তাঁর একাধিক নাটক ও উপন্যাস-গল্পের নাট্যরূপের প্রয়োজনায় নিরন্তর আগ্রহী ছিলেন। অপর দিকে, একটি তথ্যে দেখা যায়, একমাত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়া সেযুগের সাধারণ রঙ্গালয়ের সব বিশিষ্ট ও শক্তিমান পরিচালক, নটনটীরাই তাঁর নাটকে অভিনয় করেছেন।[১১] অর্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বাংলা রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে কোন উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি—যদিচ কোন প্রযোজনাকেই প্রয়োগ শিল্পের বিচারে ব্যর্থ বলা যায় নি। এই যখন তথ্য, তখন রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেওয়া যায় না; তিনি আসলে সাধারণ রঙ্গালয়ের থেকে তাঁর নাট্যভাবনাকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁর শিল্পভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসার কারণে।

আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয় ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের থেকে এবং ভেতর থেকে বেশি পরিমাণেই জানতেন, এবং নাট্যকার ও কবি রবীন্দ্রনাথকেও যে তিনি খুব দূর থেকে জানতেন, তা নয়; এবং তাঁর এই উভয় জানাকে তিনি মেলাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মেলে নি। রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছেন, তাঁর নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় করার জন্য একাধিকবার পুনর্লিখন, বর্জন, সংযোজন সবই। তা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে থেকেছে, আর রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাগুণে সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরাল এক অ-সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

শিশিরকুমার পুরোপুরি থিয়েটারের লোক, সেই থিয়েটারের আবির্ভাব, বিকাশ ও তার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন তার থেকে খুব পৃথক নয়, তবে তিনি এই থিয়েটারের লোক নন বলেই হয়ত তাঁর মূল্যায়ন কিছুটা নির্মম। শিশিরকুমার লিখেছেন,

> 'আমাদের দেশে যাত্রা ছিল আমাদের দেশের মাটীর জিনিষ। দেশের লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে নাড়া দিয়েছিল যাত্রার গীতাভিনয়। ঠিক যেভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটীতে শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার, যার বয়স তখনও সত্তর পার হয়নি, ঠিক সেইভাবে দেশের লোকের প্রাণের সঙ্গে, দেশের মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে কিনা সেটা ভেবে দেখবার জিনিষ।'[১২]

অন্যত্র লিখছেন,—

'যাত্রার লোকপ্রিয়তা ছিল, প্রশংসনীয় পালার নাম হতো, ভলো গাইয়ে বাজিয়ের নাম হতো কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি হতো না। সুধী সমাজে

যাত্রার দলের লোক তা সে যত বড় শিল্পী হোক না কেন আদৃত হতো না।....তারপর এলো থিয়েটার। ১৮৭২ সাল থেকে থিয়েটারের আরম্ভ হলো। থিয়েটারে আমরা আসর তুলে দিলাম। নটদের তুলে নিলাম মঞ্চের উপরে। সচরাচর অক্ষম চিত্রকরের আঁকা দৃশ্যপটের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে পাত্রপাত্রী অভিনয় শুরু করে দিলেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই দেখি ধনশালী ও কৃতবিদ্য লোকেরা যেন দেশে বিলাতী ধরণের থিয়েটার না থাকাটা খুবই লজ্জার বিষয় এই মনে করে অর্থব্যয় করে দল জুটিয়ে দেশের এই অগৌরব মোচন করতে লেগে গেলেন।'[১৩]

আর একস্থলে লিখেছেন,

'এই যে নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে তা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। দেশে ভাবের বন্যা এনেছে নিঃসন্দেহ। বহুকালব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাট্যশালার দায় কম নয়। কিন্তু ঐ নাট্যশালা আজও সমাজের অঙ্গ বলে স্বীকৃত নয়।'[১৪]

বাংলা থিয়েটারের উৎপত্তি ও বিকাশের ওপর শিশিরকুমারের এই পর্যবেক্ষণে যে বেদনা ও আক্ষেপ জড়িয়ে আছে—সেই বেদনা ও আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন অধিকতর উন্নত ও পরিব্যাপ্ত বলে তিনি একটি সমান্তরাল থিয়েটার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যে থিয়েটার বাংলার জাতীয় থিয়েটারের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করতে পেরেছে বলে একালের নাট্যবিশেষজ্ঞরা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

'বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়।'[১৫]

'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় পৌষ (১৩০৯ বঙ্গাব্দে, ইং-১৯০২) উপরের মন্তব্য, করার পর ২৫ বছর বাদে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'নাচ ঘর' পত্রিকায় পেশাদারী রঙ্গালয়ের বিপরীতে তাঁর নিজের কথা লিখেছিলেন এই ভাবে—

'যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারবে না।'[১৬]

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যরীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করেছেন এই বলে—

'রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা যে কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাঁহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়।'[১৭]

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপতা নিয়ে সেকালে যথেষ্ট আলোচনা হত। এই প্রসঙ্গে মণি বাগচি তাঁর 'পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক'[১৮] শীর্ষক প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখছেন,

'বছরটা আমার ঠিক স্মরণে নেই, নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ[১৯] একবার 'রক্তকরবী' অভিনয় করলেন। কবি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। একেবারে সামনের দিকে একখানা গদি আঁটা চেয়ারে কবি বসেছিলেন।... অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।...অভিনয়ের পর কবিকে আমি একটা প্রশ্ন করলাম প্রবোধবাবুর অনুরোধেই। 'পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতি আপনার সহানুভূতি নেই, সহযোগিতা নেই, এই অভিযোগ অনেকদিনের। 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ভিন্ন জাতির উন্নতি হতে পারে না, একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন।'

কবি সেদিন ভালো 'মুডে'ই ছিলেন। স্বল্প কথায় সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্মটা এই ছিল:

'আমি যে পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছি, সে পরিবেশের সঙ্গে পেশাদার থিয়েটারের একটা বড় রকমের অমিল দেখতে পাই। শিশিরকুমার আমার সঙ্গে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন সাধারণ মঞ্চে, আমি সম্মত হতে পারিনি এই কারণেই। সহানুভূতি বা সহযোগিতার প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা অমর দত্তর যুগ থেকেই আমার নাটক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে, সে অভিনয় দেখতে আমি এসেছি, একালের থিয়েটারেও আমি একাধিক নাটকের অভিনয় দেখেছি, বিশেষ করে শিশিরের অভিনয়। তোমরা যে ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা বলো, তার মধ্যে একটা যুগের প্রেরণা ছিল, গিরিশচন্দ্র ছিলেন তারই প্রতীক। তবুও আমি এর থেকে দূরে ছিলাম, কাছে আসতে পরিনি।'

এর পর গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করায় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ মণি বাগচিকে জানিয়েছিলেন,

'দ্যাখো, গিরিশচন্দ্র যে একজন জিনিয়াস্, এবং তিনিই যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, এই প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা অভিমত আছে, যেটা আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেছি পাছে কারো মনে আঘাত লাগে। তিনি একটা বিশেষ চিন্তাধারার পরিবেশন করেছেন যার সঙ্গে আমার চিন্তাধারার কোন মিল দেখতে পাই না। পেশাদার মঞ্চের তিনি নাট্যগুরু, এবং তাঁর এই গৌরব লাঘব না করে আমি শুধু এইটুকু স্বীকার করব যে, এদেশে থিয়েটার বস্তুটিকে বাঙালির চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে তাঁর প্রতিভা সার্থক হয়েছে।'

সাধারণ রঙ্গালয়, তার নাটক, প্রযোজনা-বৈশিষ্ট্য ও তার প্রতি তদানীন্তন জনসমর্থন রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল খুব স্পর্শকাতর বিষয়। তাঁর নাট্যভাবনায় তাঁর কবিসত্তাই নিয়ন্ত্রক। তা সত্ত্বেও দেশী ও বিদেশী থিয়েটারের ধ্রুপদী ও সমকালীন রীতিনীতিকে অঙ্গীকার করেই তিনি তাঁর নিজস্ব একটা থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন যে থিয়েটারে দেশীয় লোকনাট্য যাত্রা, এবং এলিযাবেথীয় থিয়েটার হাত ধরাধরি করে নিজস্ব জাতীয় ভাব ভাষা সংস্কৃতিতে মূর্ত হতে চেয়েছিল। নাট্যকার ও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরাল যে থিয়েটারের প্রবর্তন চেয়েছিলেন সে-থিয়েটারও একটি আন্তর্জাতিক ভাবনা। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকেই সাধারণ পেশাদারী রঙ্গালয়ের সমান্তরাল লিটল থিয়েটার প্রর্বতন হয়েছিল, আমাদের দেশে তার প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি লিখলেন,

'সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকের মুখ চেয়ে যেমন চলবে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে-সব উঁচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে।

এমন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হলে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।'[২০]

এই কারণে খুব সঠিকভাবেই 'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারে'র গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন—

গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমরেন্দ্র থেকে শুরু করে অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরী পর্যন্ত বিস্তৃত পেশাদারি থিয়েটারের সমান্তরে নাট্যপ্রযোজনার 'অক্লান্ত কর্মী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল বাঙালীর যথার্থ নাট্য আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারই আমাদের প্যারালাল থিয়েটার।'[২১]

এ দেশে এই প্যারালাল থিয়েটার বা স্বতন্ত্র ধারার মঞ্চভাষার প্রথম সার্থক প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। যেমন আইরিশ থিয়েটারে ডবলু বি ইয়েটস, ফরাসী থিয়েটারে পিপলস্ থিয়েটারের প্রবক্তা রোমা রোলাঁ, জার্মান থিয়েটারে বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট, আমাদের বাংলা থিয়েটারে তেমনই রবীন্দ্রনাথ। শিশিরকুমার যে আবেগে জার্মান থিয়েটারে গার্টুড হাউপ্টম্যান বা নরওয়েজিয়ান থিয়েটারে ইবসেনের ভূমিকার কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই ধারণায় বাংলার পাবলিক থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করা। হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) ছিলেন নরওয়ের থিয়েটারের সমালোচনামূলক বস্তুবাদী ধারার প্রবর্তক, যে ধারার নাট্যসৃষ্টির জন্য উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ইবসেনীয় নাট্যাদর্শ প্রচলিত হয়ে গেল। কবি ইবসেন নরওয়েজীয় জাতীয় রোমান্টিক ধারায় নাট্যরচনা শুরু করে সমকালীন সমাজ সমালোচনামূলক বস্তুবাদী ধারার প্রবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক রচনার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। মানুষ ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্রে রেখে মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ইবসেনের 'পিলারস অব দি সোসাইটি', 'ডলস হাউস', 'গোস্ট', 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' 'রোজমারসম' তাঁর নাট্যবিশ্লেষণ ও রচনারীতির জন্য সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছিল। বাংলা থিয়েটারে ইবসেনের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন শিশিরকুমার—সে তাঁর মঞ্চভাষার প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতার কারণে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ একই বার্তা বহন করেছেন সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষের জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাঁর নাট্যের মঞ্চভাষা বস্তুবাদী ছিল না, তা ছিল কাব্যনাট্যের ভাষায় প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়। ফলে রবীন্দ্রনাথ কেন ইবসেনের মত প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষতাসহ এলেন না থিয়েটারে, এ আক্ষেপ টেঁকে না। ঠিক তেমনই জার্মান থিয়েটারে গার্টুড্ হাউপ্টম্যান (১৮৬২—১৯৪৬) মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে শাণিত প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে যে থিয়েটার গড়েছিলেন, তার মঞ্চভাষা ছিল বস্তুবাদী ইবসেনের থেকেও প্রাত্যহিকতার অনুপুঙ্খতায় আরও নগ্ন। তাঁর নাটকে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নায়ক আর একক নায়ক থাকে নি, যৌথ নায়কে রূপান্তরিত হয়েছিল, সমাজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য। উত্তরকালের বিপ্লবী নাট্যকার ব্রেশটের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল হাউপ্টম্যানের মধ্যে। এই বস্তুবাদকে বাংলা মঞ্চে আনবার স্বপ্ন দেখেছিলেন শিশিরকুমার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত তাঁর সমগ্র জীবনসাধনায় প্রকৃতিবাদের কাছেও ঘেঁসেন নি; যদিচ বিপ্লবের পদধ্বনি তিনি যথাকালেই শুনিয়েছেন 'কালের যাত্রা','রথের রশি'র মধ্যে হাউপ্টম্যানের সমকালেই।

॥ দুই ॥

সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারার সমান্তরালভাবে রবীন্দ্রনাথ তবে কোন ধারণায় বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, সে ধারণা কি দেশীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক রসবোধের বাইরের কোন ধারা, না কি একান্ত অন্তর্গত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববোধের সমীপস্থ কোন নান্দনিক পালারূপ যার রূপ খুঁজে ফিরেছেন চিত্রপট থেকে চিত্তপটে।

কবি, তারপর তিনি নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী। তাই তাঁর সমগ্র কবি জীবনের সমান্তরাল যে নাট্যশিল্পীর জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন,



গুণবতীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র ও রাজার ভূমিকায় কুমার রায়

তার পরতে পরতে তিনি তাঁর এই নাট্যবোধকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, আমরা তারই অনুসরণে চেষ্টা করি তার নাট্যবোধ ও মঞ্চভাষাকে বুঝে নিতে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তাঁর দ্বিতীয় নাট্যরচনা। ১৮৮৪তে প্রকাশিত। এটি তাঁর জীবনকালে অভিনীত হয় নি। এই নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'-তে কবি নাট্যকার লিখছেন 'আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'

'এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া প্রকাণ্ড বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে।' কবিবর্ণিত প্রকৃতির পরিশোধের এই বিষয়বস্তুই যেন সমগ্র রবীন্দ্রভাবনার নির্যাস। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের পার্থিব ভাবনার দ্বন্দ্বের এক সমীভবন ঘটে যায় তরুণ রবীন্দ্র মননে।

সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত এই পালার মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথকে যেমন খুঁজে পান, তেমনই কবি রবীন্দ্রনাথকে যে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ভবিতব্য নির্ধারণ করে দেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বাংলা নাট্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনদর্শন সংযুক্ত করলেন তা মূলত বস্তুবাদী মানবিকতা এবং মঞ্চভাষা নিঃসন্দেহে কাব্যরূপময় রোমান্টিকতা।

॥ তিন ॥

'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরচনা। ১৮৮১-র ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অন্য ধারার থিয়েটারের প্রবর্তনা করলেন। এই গীতিনাট্য রচনায় সাঙ্গীতিক রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার ও অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের ওপর নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সর্বোপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থিয়েটার ও তার সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করে দেশীয় থিয়েটারের একটি আদর্শ মঞ্চভাষা যেন তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন। এডওয়ার্ড টম্পসন বলেছিলেন, 'দ্য টিউনস্ অব্ দ্য জিনিয়াস অব্ বাল্মীকি আর হাফ ইণ্ডিয়ান, হাফ ইউরোপীয়ান, ইনস্পায়ার্ড বাই মুর'স্ আইরিস মেলডিজ্। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন 'দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল।' এবং আমরা বলব এই বাল্মীকি প্রতিভা-র সূত্রেই বাংলা থিয়েটারে প্রথম পালাবদল হল। প্রথম অভিনয় ও তার পরবর্তীতে বহু অভিনয়ধন্য এই গীতিনাট্যের প্রয়োগ-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদকে কাটাতে পারেন নি। বাংলা মঞ্চেও তখন এই বাস্তবধর্মিতা ছিল প্রবল। মঞ্চের সাজসজ্জা ও শিল্পীদের রূপসজ্জায় হরিশচন্দ্র হালদার, অবনীন্দ্রনাথ, নীতিন্দ্রনাথ তাঁদের কল্পনা অনুযায়ী রূপারোপ করেছেন, বাল্মীকিবেশী রবীন্দ্রনাথের যে ছবিখানি আজ সর্বাধিক নন্দিত, তাতে বাল্মীকির পিঠের দিকে 'বিলিতি রাজরাজড়াদের ম্যান্টল্-এর আদলে'[২২] কেন জোব্বা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা দস্যুদলকে কেন কাবুলবাসীর পোশাকে সজ্জিত করা হয়েছিল—তার কারণ ত' একটাই যে দৃষ্টিনন্দন করা। 'দর্শকরা কবির সেই বাল্মীকির বেশ দেখে চিত্রার্পিতের মত নির্নিমেষনেত্রে'।[২৩] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আর একটি তথ্য জানা যায় যে 'রাঙাপদ পদ্মযুগে' গানখানির বাগেশ্রী রাগিনীর সুরে মুগ্ধ দর্শকরা নেপথ্যগমনোদ্যত বাল্মীকিকে 'এনকোর এনকোর' ধ্বনি দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে এনে 'গানের পূর্ববৎ আমূল পুনরাবৃত্তি' করিয়েছিলেন। তদানীন্তন বাংলা মঞ্চের 'এনকোর' প্রথার কাছে রবীন্দ্রনাথকে এভাবেই তখন হার মানতে হয়েছিল। পরবর্তীতে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনয়কালে (২৫, ২৭ ও ২৮ অগাস্ট ১৯২৩) ৬২ বছরের রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহরূপে মঞ্চাবতরণকালে দর্শকরা যাতে উৎসাহিত হয়ে হাততালি দিয়ে নাটকের রসভঙ্গ না করে, তার জন্য আগে থেকেই গ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের সতর্ক করা হত।[২৪] এই হল সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন।

১৮৮১ থেকে ১৯৪০ দীর্ঘ ছয় দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ছিল রিপার্টরি থিয়েটার। কলকাতার জোড়াসাঁকো, স্টার থিয়েটার, কাশিয়াবাগান, বির্জিতলা, বিজনি রাজবাড়ি, পার্ক স্ট্রিট, সঙ্গীত সমাজ, জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা, আলফ্রেড থিয়েটার, ম্যাডান থিয়েটার, এম্পায়ার থিয়েটার, নিউ এম্পায়ার, আশুতোষ কলেজ হল, শ্রীরঙ্গমঞ্চ, ছায়া সিনেমা; তারপর শান্তিনিকেতনের নাট্যঘর (এটি কি কবির সেই লিটল্ থিয়েটার মঞ্চের আদলে গড়া)—এখানে যে কত অভিনয়ই হয়েছে; এরপর পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট (সারদা মেমোরিয়াল হল), চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা; পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া; বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বোম্বাই (একসেলসিয়ার থিয়েটার), মাদ্রাজ, ওয়ালটেয়ার, পাটনা (এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস), এলাহাবাদ (রিজেন্ট), লাহোর (প্লাজা), দিল্লি (রিগ্যাল থিয়েটার), মীরাট, লখনৌ (উত্তরপ্রদেশ কৃষি প্রদর্শনী), শিলং (অপেরা হল); এবং ভারতের বাইরে সিংহল পর্যন্ত[২৫] রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার তাঁর গীতিনাট্য, নাটক, প্রহসন ও নৃত্যনাট্যের প্রযোজনাবৈভব, নিয়ে 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ' থেকে মুক্ত হয়ে 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, যে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই' সেই রঙ্গমঞ্চের সন্ধান করে গেছে দীর্ঘ ষাট বছর ধরে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও তাঁর থিয়েটার 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) থেকে শ্যামা (১৯৩৯) পর্যন্ত রচনা ও প্রযোজনাকর্মের মধ্য দিয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান করে গেছে সে অনুসন্ধান হল 'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।'[২৬] 'রক্তকরবী' নাটক প্রসঙ্গে কবি এই চিরকালের সত্যটিকে অভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মুখবন্ধে। 'আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তাহলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।... নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছেন যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।'[২৭]

এই সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই দেশী বিদেশী, জাতীয় আন্তর্জাতিক, লোকনাট্য ধ্রুপদী নাট্য—সব ধারার থিয়েটারের অন্তর্গত রূপটিকে তিনি আত্মস্থ করে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর থিয়েটারের রূপটিকে—

'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।'

১৩০৯ বঙ্গাব্দ (১৯০২)-এর এই 'রঙ্গমঞ্চ' ভাবনা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শান্তিনিকেতনে প্রথম মঞ্চস্থ 'ফাল্গুনী' নাটকের মঞ্চভাষায় রূপ না পেলেও পরবর্তীকালে কলকাতায় বাঁকুড়ার বন্যার্তদের সাহায্য রজনীতে অভিনয়কালে (৩০শে জানুয়ারী,১৯১৬) এর মঞ্চভাষায় ঐ রঙ্গমঞ্চ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[২৮] এবং নাটকের সূচনা অংশ, যা কলকাতার অভিনয় উপলক্ষে লেখা হয়, তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাজা ও কবিশেখরের সংলাপের মধ্যে গেঁথে দিলেন—

'চিত্রপট —

'চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

'এ নাটকে গান আছে নাকি।

'হ্যাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'[২৯]

এই 'ফাল্গুনী'র মঞ্চসজ্জাতেও অবশ্য রবীন্দ্র নাট্যভাবনাকে মঞ্চশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেন নি। 'আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন....তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল এবং তার উপর একটি মাত্র ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।'[৩০] মঞ্চশিল্পী যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন, তবে তাঁর এই মঞ্চসজ্জার পেছনে জাপানী চিত্রকলার প্রত্যক্ষ প্রভাব বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংযত থাকতে পারেন নি মঞ্চসজ্জাকর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন—

'নদী আপন বেগের সময় মঞ্চের একদিকে সঞ্জীব আর একদিকে নিখিল দাঁড়িয়ে একটা নীল কাপড়কে ঢেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে।'[৩১]

আসলে সমাজসত্য তথা ভাবসত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্র নাট্যভাবনা একটি সুরের সন্ধান করেছে—যে সুরটিকে চক্ষু কর্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভববেদ্য করতে গেলে তার দৃশ্যরূপের আয়োজন করতেই হয়—এবং সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যকাব্যের মঞ্চভাষা অভিনয়, সঙ্গীত, আলো অন্ধকার রঙ সব কিছুরই সুসমঞ্জস যোগবিয়োগে গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসের তাণ্ডবে সভ্যতার অন্তর্গত দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে মানুষের প্রতিবাদী অন্তররূপটি ধরা পড়েছিল সে যুগের সব দেশের কবি লেখক নাট্যকার প্রয়োগশিল্পীদের সৃষ্টিতে। রোমান্টিসিজম্

ন্যাচারালিজ্ম রিয়্যালিজ্ম সোস্যালিজ্মের সমকালেই এসেছিল এক্সপ্রেশনিজ্ম্, কিউবিজ্ম্। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারে রোমান্টিসিজমের সূত্র ধরে রিয়ালিজ্ম, সোস্যালিজ্ম ও এক্সপ্রেশনিজ্ম এক সঙ্গেই এসেছিল। ৬২ বছরের জয়সিংহরূপী রবীন্দ্রনাথের যে আলোকচিত্রটি আজ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, তার মঞ্চসজ্জায় সোস্যালিস্টিক ভাবনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়েছে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব। 'রক্তকরবী' নাট্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে গগনেন্দ্রনাথ যে মঞ্চভাবনার আভাস দেন, তাতে কিউবিস্ট চিত্রকলার প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুভূত হয়। এবং ১৯৫৪-য় শম্ভু মিত্রের সৃজনশীল শিল্পসৃষ্টিতে যে 'রক্তকরবী' বাংলার অন্যধারার থিয়েটারের প্রতীক হয়ে ওঠে, তাতে মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী স্তরবিন্যস্ত যে বহুমাত্রিক মঞ্চসজ্জা রচনা করেন, তাতে 'বিসর্জনের' ঐ অবিস্মরণীয় ছবি ও 'রক্তকরবী' মলাটের প্রেরণাকে অস্বীকার করা যায় না, যদিচ নাট্যগ্রন্থনার মধ্যেই যমপুরীর সমাজের বিভিন্ন স্তরবিন্যস্ত মানবশ্রেণীর দ্বন্দ্বকেই মঞ্চশিল্পী স্থাপত্যধর্মী বিন্যাসে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এই একটি নাটক রবীন্দ্রনাথের, যেখানে লিরিক ও ড্রামাটিকের দ্বন্দ্বে তার অন্য নাটকের মত নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হতে বাধা পায়নি।

সামাজিক শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, নারীর মুক্তি, বিপ্লবের বার্তা ইত্যাদি প্রশ্নকে এক অসাধারণ মঞ্চভাষায় 'রক্তকরবী'র প্রতীকে রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার সৃষ্টি করে গেছে—এই একটি নাটকেই কবি আমাদের বাংলা থিয়েটারকে বিশ্বনাট্যের দরবারে উন্নীত করে গেছেন, এরপর রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারকে ইউরোপ বুঝতে না পারলেও বাংলা বা ভারতের থিয়েটারের কোন ক্ষতি নেই।

এখন বাংলা থিয়েটারের দুটি ধারা। একটি সাধারণ রঙ্গালয়ের বাণিজ্যিক প্রমোদ-উপকরণের ধারা, অন্যটি ৪০-এর দশকের গণনাট্য প্রবর্তিত ও আদর্শায়িত আজকের গ্রুপ থিয়েটারের ধারা। ৪০-এর দশক থেকেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিবাদী বাংলা নাট্যের মূলস্রোত সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে প্যারালাল থিয়েটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ১৯৪৭ থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটক আর বাংলা নাট্যের মূলস্রোতরূপে বিবেচিত হতে পারে নি, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণেই গণনাট্য প্রবর্তিত ধারাই আজ বাংলা নাট্যসৃষ্টির মূলধারা।

এবং সেই ধারায় রবীন্দ্র নাট্যভাবনা একটি বিশিষ্টতম প্রেরণা ও প্রবাহ। তাঁর 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা', 'মুক্তির উপায়', 'তপতী', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ' ও 'শাস্তি', 'দেনাপাওনা', 'বদনাম', 'তোতাকাহিনী' প্রভৃতি গল্পের নাট্যরূপ পাঁচের দশক থেকে প্রায়শ অভিনীত হয়ে চলেছে। সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করেছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা নির্দেশকরা কতখানি আত্মস্থ করতে পেরেছে তার উপর। রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার বহু সমস্যা—তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর থিয়েটারকে বুঝতে না পারার

তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তারপরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তা হলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জনারূপে সাহিত্যের আস্তাকুঁড়ে জমে ওঠে। ইবসেনের নাটকগুলো তো একদিন কম আদর পায়নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি। কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে। মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস; বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যতই নতুন হয়ে দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়।

—সাহিত্যের মাত্রা, সাহিত্যের স্বরূপ

সমস্যা। তারপর হল নাটকবিশেষে তার ভাব-ভাষা, গঠনবৈশিষ্ট্য, সংলাপ, সংলাপের ছন্দবিভাজন, উচ্চারণ, স্বরপ্রক্ষেপণ, চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয়-বাচিক ও কায়িক, অঙ্গসঞ্চালন, কম্পোজিশান, কোরিয়োগ্রাফ, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, আবহ-সঙ্গীত, গীত, আলোকসম্পাত—সব মিলিয়ে আজকের থিয়েটারের প্রাসঙ্গিকতায় সেই নাট্য নির্বাচন দলের সার্বিক সামর্থ্যের অন্তর্গত কিনা—এ সবই সমস্যা। এ ক্ষেত্রে নিয়ত অনুশীলন ও সমকক্ষতা অর্জনের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সৃজনশীল কল্পনা দ্বারাই আজকের গ্রুপ থিয়েটার রবীন্দ্র নাট্যভাবনাকে মঞ্চস্থ করতে পারবে, কারণ রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারই ত' আজকের অন্যধারার থিয়েটারের পথপ্রদর্শক।

পাদটীকা ঃ

১। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার। বিষ্ণু বসু। এপ্রিল ১৯৮৭। প্রতিভাস।

২। ১৮৭৭-এ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে 'এমন কর্ম আর করব না'য় অলীকবাবুর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চাবতরণ এবং তখন থেকে তেষট্টি বছরের মাথায় ১৯৪০-এ 'শ্যামা' মঞ্চস্থ হওয়ার কালেও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁকে মঞ্চে আসীন দেখতে পাওয়া যায়।

৩। Edward Thompson, Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist.

৪। ১৯৪০-এর ২৮শে জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে বাসকালে 'রাজা ও রাণী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশের সূচনায় কবির মন্তব্য। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ, ৮৭, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮৪ সংস্করণ।

৫। ১৯৫৪-য় বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন অন্য ধারার থিয়েটারের বৈপ্লবিক প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৬। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ।

৭। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ, পৃ. ৩০।

৮। ঐ

৯। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

১০। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকথা।

১১। ভারতী পরিষদ বার্ষিকী, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়, পৃ. ৯৫।

১২। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ, পৃ. ৩০।

১৩। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নাট্যশালা প্রসঙ্গে, ঐ, পৃ. ৫০।

১৪। ঐ।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ।

১৬। ঐ, লিটল থিয়েটারের ভাবনা, নাচঘর, ৩রা জুন, ১৯২৭।

১৭। ঐ, অন্তর বাহির, পথের সঞ্চয়।

১৮। মণি বাগচি, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক, গন্ধর্ব, রবীন্দ্র নাট্যসংখ্যা, ১৯৬১, পৃ. ৮২।

১৯। আশ্রমিক সংঘ নয়, টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ নাট্যনিকেতন মঞ্চে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেছিলেন ৬ এপ্রিল, ১৯৩৪। দ্রষ্টব্য, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় সারণি।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিট্‌ল থিয়েটারের ভাবনা, নাচঘর, ৩রা জুন, ১৯২৭।

২১। বিষ্ণু বসু, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, পৃ. ২৬।

২২। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রস্মৃতি।

২৩। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবির কথা।

২৪। অহীন্দ্র চৌধুরী, নিজেরে হারায়ে খুঁজি।

২৫। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ-অভিনীত প্রযোজিত নাটকর সারণি।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, ভূমিকা।

২৭। ঐ

২৮। পবিত্র সরকার, অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৯।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফাল্গুনী, সূচনা।

৩০। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী,রবীন্দ্রস্মৃতি,পৃ. ৩৭।

৩১। ঐ, পৃ. ৩৮।



রবীন্দ্র-নাট্যে প্রতিবাদ ঃ রক্তকরবী

মানস মজুমদার

যেমন তাঁর কোনো কোনো গল্পে বা কবিতায়, প্রবন্ধে বা উপন্যাসে, তেমনি তাঁর কোনো কোনো নাটকেও প্রতিবাদপ্রবণ এক শিল্পীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

যেমন 'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকে। প্রতিবাদপ্রবণ এক নাট্যকারের আমরা দেখা পাই। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তিনি। পুঁজিবাদী শোষণের ভয়াবহ রূপটি এ নাটকে তিনি আমাদের দেখিয়ে দেন।

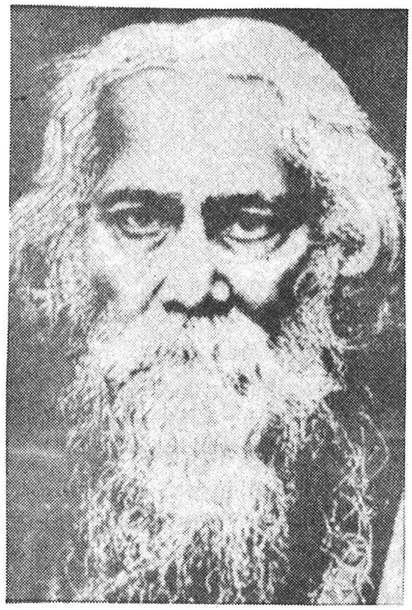
পুঁজিবাদীদের প্রতিভূটির নাম মকররাজ। যক্ষপুরীর অধিপতি। সোনা সংগ্রহের নেশায় বিভোর। অসংখ্য শ্রমিক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে সোনা আহরণের কাজে নিযুক্ত। যক্ষপুরীর বাইরে থেকে এসেছে তারা। তাদের অনেকেই একসময় ছিল কৃষক অথবা কৃষি-শ্রমিক। সোনার লোভ তাদের খনি-শ্রমিকে পরিণত করেছে। কৃষিপল্লী ক্রমশ উজাড় হতে থাকে। 'কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে আসা হয়। কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে।

কৃষিপল্লীতে যারা ছিল স্বাধীন, যক্ষপুরীতে তারা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কোনো মূল্য নেই সেখানে। পুঁজিবাদী শোষণতন্ত্রের শিকার হয় তারা। তাদের ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে মকররাজের পুঁজির পাহাড়টি স্ফীত হয়ে ওঠে।

পদে পদে মকররাজের অস্তিত্ব টের পায় তারা। কিন্তু দেখা পায় না। মকররাজ থাকে জালের আড়ালে। রহস্যময় তার অস্তিত্ব। সর্দার আর মোড়লের দল শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান করে। সর্দারদের পদ-মর্যাদা কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী। বড়ো সর্দার, মেজো সর্দার, ছোট সর্দার নামে পরিচিত তারা। সর্দারদের অধীনে থাকে মোড়লেরা। এক একটি এলাকার খোদাইকরা শ্রমিকেরা এক একজন মোড়লের শাসনাধীন। শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগ ঐসব মোড়লের সঙ্গে। মোড়লেরাই শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক। যক্ষপুরীর প্রকাশ্য গোপন সমস্ত সংবাদ মোড়লদের মাধ্যমে সর্দারক্রমে মকররাজের কাছে পৌঁছে যায়।

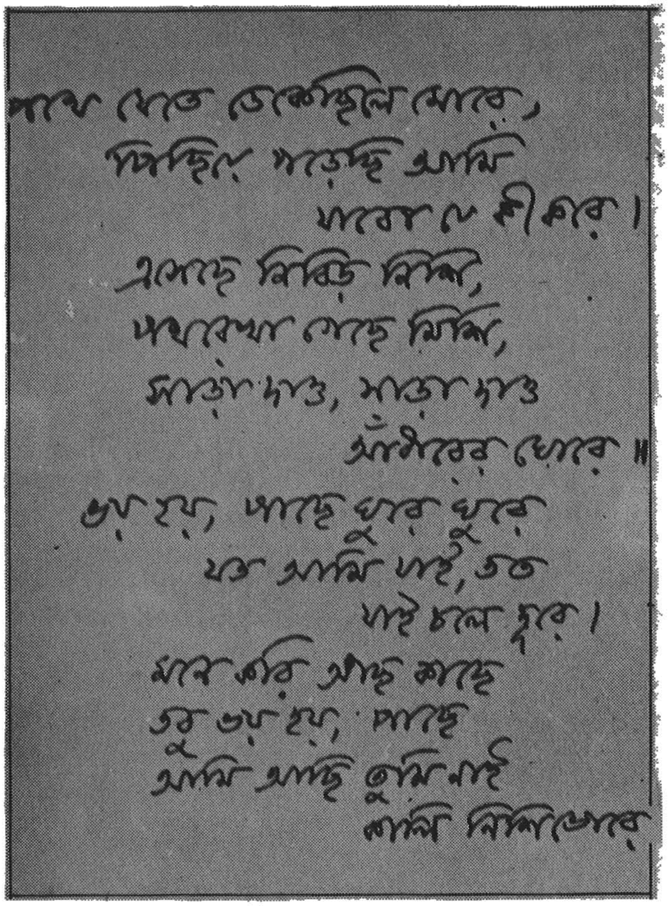
যক্ষপুরীর এক একটি এলাকা হ'ল এক একটি 'পাড়া'। পাড়াগুলির পরিচয় কোনো একটি অক্ষরযোগে—'ট', 'ঠ', বা 'ন' পাড়া। ঐ পাড়ায় বসবাসকারী শ্রমিকদের পরিচিতি বিশেষ একটি অক্ষরের সঙ্গে সংখ্যাযোগে। ব্যক্তি-পরিচয় ঢাকা পড়ে যায় সংখ্যার আড়ালে। শ্রমিক বিশুকে সকলে জানে ৬৯৬ হিসেবে। ফাগুলাল হ'ল ৪৭ ফ। দুঃসহ এক যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয় শ্রমিকেরা। বিশু তাই আক্ষেপ করে: 'গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।' এ আক্ষেপ প্রতিবাদেরই নামান্তর।

শ্রমিকদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় বাহুল্যের আভাসমাত্র নেই। সমস্ত রকমের স্বাচ্ছন্দ্যবর্জিত নিতান্তই সাদামাটা বন্দোবস্ত। স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়, স্বাধীনচিত্ততার জন্ম দেয়, পারিপার্শ্বিক দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে। যক্ষপুরীর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। শ্রমিক-শাসন ও শ্রমিক-শোষণের



আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
দুপুর



ব্যবস্থাটি তাই রীতিমতো কড়া। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত। যক্ষপুরীতে তাই 'মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে।' প্রয়োজনমতো এক একটি কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। শ্রমিকদের কখনো নেশায় ভুলিয়ে রাখা হয়, অস্ত্রপ্রয়োগে কখনো তাদের ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ দমন করা হয়, আবার কখনো বা ধর্মের আফিং খাইয়ে তাদের বশীভূত করা হয়।

শ্রমিকদের বাধ্য ও অনুগত রাখার জন্য প্রতিপালন করা হয় ছদ্মবেশী কিছু গুপ্তচরকে। অধ্যাপকের মতো বুদ্ধিজীবী কিংবা নামাবলী-শোভিত কেনারাম গোঁসাই যার দৃষ্টান্ত। এরা বেতনভুক, রাজসেবক হিসেবে বিশ্বস্ত। ছদ্মবেশে মকররাজ ও যক্ষপুরীর মহিমা-কীর্তন করে বেড়ায় তারা। নন্দিনীর প্রতি অধ্যাপকের উক্তিতে তার প্রমাণ পাই : 'আমরা যে ...মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।' ফাগুলালের প্রতি কেনারাম গোঁসাইয়ের উক্তিটিও সমসূত্রে স্মরণযোগ্য ঃ 'বাবা ৪৭ ফ, তোমার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলে ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হাল্কা হয়ে যাক।' যে-কোনো প্রকারে শ্রমিকদের ভুলিয়ে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। শ্রমিক-অসন্তোষ নির্মূল করাই তাদের ব্রত। খাসা বন্দোবস্ত।

যক্ষপুরীর শ্রমিকদের অবসরের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কেননা, অবসরের সুযোগে সংঘবদ্ধ হতে পারে তারা। তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা ব্যাপারে সচেতন হতে পারে। স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার প্রভাবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তাই এমনতরো সতর্কতা, নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা। যক্ষপুরীতে স্বাধীনতার কোনো বালাই নেই। বাক্-স্বাধীনতা? নেই। কাজকর্মের স্বাধীনতা? নেই। চলাফেরার স্বাধীনতা? নেই।

যক্ষপুরীতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত, কিন্তু পালানোর পথ রুদ্ধ। এ বিষয়ে বিশুর অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক ঃ "বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তবু চেষ্টা করে দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি।" পালানোর পথ বন্ধ কেন? তাতে যে বিপদ আছে। যক্ষপুরীর কুৎসিত রূপটি বাইরের জগতে যদি প্রকাশ হয়ে যায়!

যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা নানাভাবে শুধু শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়। তাদের প্রাণের কোনো মূল্য নেই। কর্তৃপক্ষ বেশি মুনাফার নীতিতে বিশ্বাসী।

॥ দুই ॥

'রক্তকরবী' নাটকে তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষে রয়েছে শোষকবাহিনী : মকররাজ, সর্দারকুল, মোড়লগোষ্ঠী, অধ্যাপক, কেনারাম গোঁসাই প্রমুখ। দ্বিতীয় পক্ষে শোষিতেরা : বিশু, ফাগুলাল, কিশোর, অনুপ, উপমন্যু, শক্লু, কঙ্কু, গজ্জু প্রমুখ। তৃতীয় পক্ষে রয়েছে নন্দিনী ও রঞ্জন। তাদের সহানুভূতি-সমর্থন দ্বিতীয় পক্ষটির প্রতি; অর্থাৎ শোষিতদের প্রতি। শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা। শোষিতদের তারা সাহস জোগায়। শোষককুলের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে।

যক্ষপুরীতে নন্দিনী আসে স্বাধীনতা আর আনন্দের বার্তা নিয়ে। শোষক ও শোষিত উভয় পক্ষকেই নাড়া দেয়। তার আবির্ভাবে উভয় পক্ষে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নন্দিনীর প্রতি বিভিন্ন জনের উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে—

শোষক পক্ষের প্রতিক্রিয়া :

(১) মকররাজের উক্তি—

(ক) 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না।'

(খ) 'আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।'

(২) অধ্যাপকের উক্তি—

(ক) 'যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।'

(খ) 'পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী।...এক-একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখির মতো হুশ করে উড়ে পালায়।'

শোষিতপক্ষের প্রতিক্রিয়া :

(১) কিশোরের উক্তি—

'আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।'

(২) 'যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।'

সর্দারের প্রতি ফাগুলালের উক্তিতেও এই প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট—'সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।'

॥ তিন ॥

যক্ষপুরীতে নন্দিনী আসে প্রতিবাদে দূতী হয়ে। মকররাজের ক্ষমতার দম্ভকে সে গ্রাহ্য করে না, তার সম্পদ-সম্ভার সে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যক্ষপুরীর যান্ত্রিক রীতি-নিয়মের প্রতি তার প্রচণ্ড অবজ্ঞা। মকররাজ ও তার অনুগতদের প্রতি বর্ষিত হয় তার বিদ্রূপ কটাক্ষ। যক্ষপুরী ও মকররাজ সম্পর্কে অধ্যাপকের প্রতি তার উক্তি স্মরণযোগ্য : তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'

মকররাজকে সে বলে : সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?'

অথবা : 'আমি কালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।'

সর্দারদের সম্পর্কে তার সবিদ্রূপ মন্তব্য : 'ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে।'

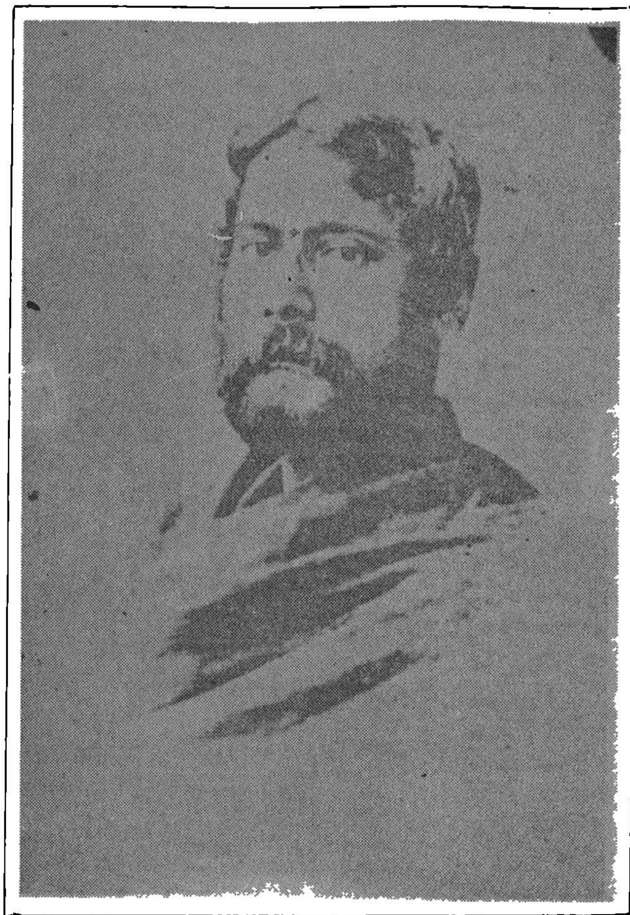
সর্দার সম্পর্কে তার শ্লেষতীক্ষ্ণ মন্তব্য কম উপভোগ্য নয় : 'ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক লিক করছে।' অন্যদিকে শোষিতের দল নন্দিনীকে দেখে ভরসা পায়। তাকে বিশ্বাস করে। অকপটে বলে তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা। বিশুকে রাস্তা দিয়ে পশুর মতো বেঁধে নিয়ে যেতে দেখে নন্দিনী। দেহে তার আঘাতের চিহ্ন। বিশু জানায় নন্দিনীকে, কুকুর মারা চাবুকে তাকে মারা হয়েছে। কিশোর নন্দিনীকে জানায় তার পেছনে ডালকুত্তা লাগানোর কথা। পালোয়ান নন্দিনীকে জানায়, তার ভেতরটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গেছে। তার দেহের শক্তি শুধু নয়, মনের সাহসটুকুও শুষে নেওয়া হয়েছে। রাজ-মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে অনুপ, উপমন্যু, শক্‌লু, কঙ্কুদের বেরিয়ে আসতে দেখে নন্দিনী। অত্যাচার-উৎপীড়নের বীভৎসতা বিচলিত করে তাকে। চেনা মানুষগুলিকে মানুষ বলে চেনাই যায় না।

নন্দিনীর মনে হয়, ওদের মধ্যে মাংস নেই, মজ্জা নেই, মনপ্রাণ কিচ্ছু নেই।

নন্দিনী মানুষের উপর মানুষের এই অপমান-পীড়নে শিউরে ওঠে। প্রতিবাদ জানায়। রাজার প্রতি উক্তিতে তার জ্বালা ও ক্ষোভটুকু গোপন থাকে না—'ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?' নন্দিনী ভয় পায় না সর্দারদের। স্পষ্ট ভাষায় সে-কথা জানিয়েও দেয় : 'আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।' সর্দারকে সে ব্যঙ্গ করে : 'আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।'

॥চার ॥

রঞ্জন নন্দিনীর প্রেমিক, প্রেরণাদাতা। যক্ষপুরীতে তার আবির্ভাব ঝড়ো হাওয়ার মতো। রঞ্জন মূর্তিমান বিদ্রোহী মোড়লের আদেশমতো কাজ করতে নারাজ সে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে রঞ্জন তাকে সেকথা জানিয়েও দেয় : 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।' 'বড়ো মোড়ল শাসনের সুরে কথা বললে রঞ্জনের কণ্ঠে শোনা যায় অট্টহাসি। বলে : 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।' কাজ বন্ধ করে খোদাইকরদের খোদাইনৃত্যে মাতিয়ে তোলে সে। বজ্রগড়ে তাকে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়, সকলকে বিস্মিত করে বাঁধন খুলে কুবের গড়ে সে উপস্থিত



হয়। কী যে মায়াবী আকর্ষণ তার, শ্রমিকেরা সহজেই তার আপনজন হয়ে ওঠে, তার পাশে ভিড় করে, দেখতে দেখতে ওর দলটি বড়ো হয়ে ওঠে। শুধু কি তাই? রঞ্জনের প্রভাবে মেজো সর্দারের মনের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে যায়। রঞ্জনের দেহে হাত দিতে চায় না সে। তার কণ্ঠ ধিক্কারে ভারি হয়ে ওঠে : 'আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

রঞ্জন ক্রমশই মকররাজের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মকররাজের হাতে প্রাণ দিতে হয় রঞ্জনকে। সে প্রাণদান বৃথা যায় না। রঞ্জনের স্মৃতি অত্যাচারিত শ্রমিকদের প্রেরণা জোগায়। রঞ্জনের সাহস ও সংকল্প তাদের পথ দেখায়। শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপ্রবণ হয়ে ওঠে তারা।

রঞ্জন 'রক্তকরবী' নাটকের অন্যতম প্রতিবাদপ্রবণ চরিত্র। আত্মোৎসর্গের মহিমায় উজ্জ্বল তার প্রতিবাদ। মৃত্যু তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে পারে না। নিজের প্রাণের বিনিময়ে বহু প্রাণকে রক্ষা করে সে। রবীন্দ্র-নাট্যধারায় এ ধরনের চরিত্র অবশ্য আরো আছে। 'রাজা ও রানী'র (১৮৮৯) সুমিত্রা, 'বিসর্জন'-এর (১৮৯১) জয়সিংহ, 'মুক্তধারা'র (১৯২২) অভিজিৎ স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্র-নাটকের প্রতিবাদী চরিত্রগুলি প্রাণ দিয়েই প্রাণের জয় ঘোষণা করে।

॥ পাঁচ ॥

রঞ্জনের মৃত্যু তাই গভীর তাৎপর্যময়। এ মৃত্যু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। তার প্রমাণ, রঞ্জন যে শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, সেই শোষণতন্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং মকররাজ অবশেষে তার নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তার জালের আড়াল ছিঁড়ে ফেলে সে।

ধ্বজাপুজোর ধ্বজা ভাঙে। তারপর বন্দীশালা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। সঙ্গে নন্দিনী আর ফাগুলালের দলবল। মকররাজ এভাবেই পরিবর্তিত হয়। যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে নিজেই বিদ্রোহের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। মকররাজ 'একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ' হয়ে ওঠে। 'রক্তকরবী' নাটকের উপসংহারপর্বে ফাগুলালের সঙ্গে মকররাজের কথোপকথনে তার এই পরিবর্তন স্পষ্টগোচর :

ফাগুলাল।...মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমার বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

শোষক মরকরাজ শোষণের বিরোধিতা করে। তার দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা শাসনতন্ত্রের ধ্বংস কামনা করে। শোষিতদের পাশে দাঁড়ায়। তার পরিবর্তন ঘটে।

এ পরিবর্তন আকস্মিক নয়। সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত। 'রক্তকরবী' নাটকের পূর্বাপর বিশ্লেষণে তা প্রমাণ করা যায়। প্রথম আবির্ভাবে রাজার গর্বোদ্ধত মূর্তিটি আমাদের চোখে পড়ে। মকররাজ সদম্ভে ঘোষণা করে : 'আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।' পরবর্তী আবির্ভাবে তার আক্ষেপোক্তি আমাদের কানে বাজে : 'হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' ক্রমে অসন্তোষের জাগরণ : 'এই ব্যাঙ.... একটা পাথরের কোটরের মধ্যে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। ...আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে থাকার থেকে ওকে দিলাম মুক্তি।' অসন্তোষ রূপান্তরিত হয় ক্রোধে। অধ্যাপকের উক্তি তার সাক্ষ্য : 'রাজা বোধহয় নিজের উপর রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।' চিকিৎসকের জবানীতে পাই রাজার বিরক্তির কথা : 'দেখলুম, রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।' অবশেষে রাজার মোহভঙ্গ ঘটে : ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।'

রবীন্দ্র-নাটকে এ ধরনের পরিবর্তনের আরো একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। 'রাজা ও রানী'র বিক্রমদেব অনুতাপে দগ্ধ হয়। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি প্রথাধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা হৃদয়ঙ্গম করে দেবী প্রতিমাকে গোমতীর জলে বিসর্জন দেয়। 'মুক্তধারা'র রণজিৎ তার ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়।

॥ ছয় ॥

এ নাটকের আর একটি প্রতিবাদপ্রবণ চরিত্র হ'ল কিশোর। নন্দিনী তাকে প্রেরণা জোগায়, রঞ্জন তাকে পথ দেখায়। নির্ভীক সে। সাহসের সঙ্গে মকররাজকে আক্রমণ করে। অবশ্য আত্মরক্ষায় সে সমর্থ হয় না। মকররাজের হাতে 'বুদবুদের মতো' নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু মকররাজের মনে প্রবল আলোড়ন তুলে যায়। বীরের মতোই মৃত্যুবরণ করে সে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্রতিবাদপ্রবণ।

বিশু ও ফাগুলালকেও প্রতিবাদপ্রবণ চরিত্র বলা চলে। বিশু একসময় যক্ষপুরীতে গুপ্তচরের কাজ করতো। পদমর্যাদাও কম ছিল না। কিন্তু বিবেক বড়ো বালাই। ক্রমে সে খোদাইকর শ্রমিকদের পক্ষ নেয়। তাদেরই একজন হয়ে ওঠে। দুঃখ পায়। লাঞ্ছনাও। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়। পদমর্যাদার মোহে বাঁধা পড়ে না। সে আঘাত করে। আঘাত পায়। পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার প্রকাশ্য গোপন সমস্ত দিকগুলিই তার চেনা হয়ে যায়। যক্ষপুরীতে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সে। নন্দিনী-রঞ্জন সেই ক্ষেত্রটি প্রসারিত করে। কিন্তু তাদের সাহায্য করে। তাদের কাজকর্ম সহজ করে দেয়। সর্দারকে ভয় পায় না বিশু। তাই সর্দার যখন শ্রমিকদের মধ্যে তাকে দেখে বলে : 'কী হে ৬৯ ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ দেখাতে।' তখন বিশুর উত্তর হয়ে ওঠে শ্লেষ-তীক্ষ্ণ : 'সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।' আবার সর্দারের—'ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি'র উত্তরে বিশুর ব্যাঙ্গোক্তিতেও তার প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় : 'তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।' চন্দ্রা যখন বলে : 'আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।'—তখন বিশু যে উত্তর দেয় তাতে শ্রেণী-চরিত্র সম্বন্ধে তার ধারণাটি অস্পষ্ট থাকে না : 'মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।'

ফাগুলাল বিশুরই দোসর। পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার ছল-চাতুরীটুকু তার কাছে অনুদ্ঘাটিত নেই। 'ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে' কেন তার কারণটি সে বোঝে। এ ব্যবস্থা সে মেনে নিতে পারে না। স্ত্রী চন্দ্রা যক্ষপুরী ছেড়ে তাদের ঘরে ফিরে যেতে চাইলে ফাগুলাল জানায় : ঘরের রাস্তা বন্ধ? কারণ, 'আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনাফা নেই।' শ্রমিক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ফাগুলাল এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। এ ব্যবস্থার প্রতি তার প্রবল ঘৃণা আছে। এ ব্যবস্থার বিরোধী সে। তার মন্তব্যে সেই ঘৃণা আর বিরোধিতারই প্রকাশ। প্রতিবাদেরও। প্রতিবাদী চরিত্ররূপে সে যে সক্রিয় তার প্রমাণ, কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে বিশুকে সে বন্দীশালা মুক্ত করতে চায়। নন্দিনীর প্রতি গোকুলের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নাটকের অন্তিমে রাজা যখন তাকে প্রশ্ন করে : 'কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ?' তখন ফাগুলাল নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দেয় : 'বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।'

॥ সাত ॥

সন্দেহ নেই, এ নাটক প্রতিবাদের। ন্যায়-নীতি বিবেকবর্জিত মুনাফাসর্বস্ব পুঁজিবাদী শোষণের বীভৎসতা এ নাটকে সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রেরণা জুগিয়েছেন।

মানুষ কী নিছক উৎপাদনের উপকরণ? তা তো হতে পারে না। তার প্রাণ আছে। স্বাধীন সত্তা আছে। ন্যায়-নীতি-বিবেকবোধ আছে। মানুষ জীবনে আনন্দ চায়, অবকাশ চায়। বিশ্ব-প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায় মানুষ। নাটকের 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...' গানে সেই কথাই ব্যক্ত হয়। এই গানের কলিটি ধুয়া পদের মতো এ নাটকে তাই বারবার ফিরে আসে।

মানুষ যন্ত্র নয়। স্থূল যান্ত্রিকতা মানুষকে পশু করে তোলে। মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায়। প্রাণের মৃত্যু ঘটে। ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাও মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে নেশা ভয়ংকর। প্রাণের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধী। প্রতিবাদপ্রবণ তিনি। 'রক্তকরবী' সেই প্রতিবাদের শিল্পরূপ।

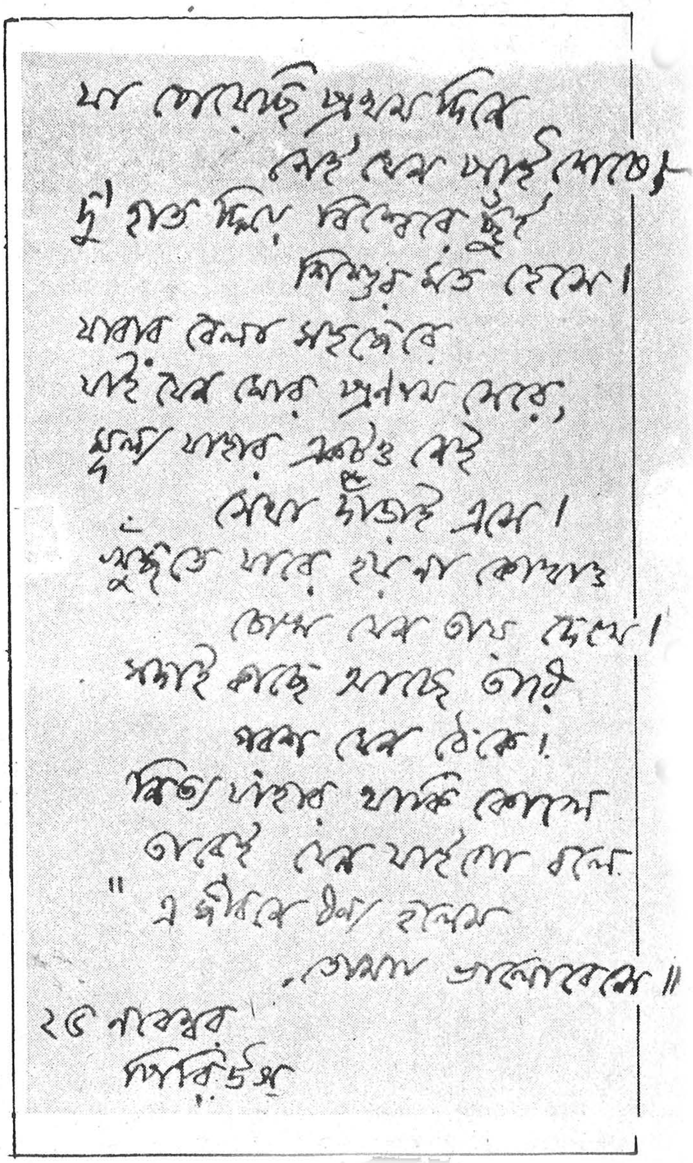


রবীন্দ্র সাহিত্যে কৃষকজীবন ও সমাজ

প্রতাপরঞ্জন হাজরা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা বহুমুখী। তাঁর বিপুলায়তন সাহিত্যে এসেছে অজস্র উপাদান, অজস্র মানুষ, অজস্র সম্প্রদায়। তবু তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো কৃষকজীবন ও সমাজ। তাঁর বিপুলায়তন সাহিত্যে কৃষক উপাদান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবনের শাশ্বত মহিমা। এই কৃষকজীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন—রচনার বিশ্লেষণে সেকথা অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে যে সময়ের সামাজিক পরিকাঠামোর কথা বলেছেন, সেই সময়ের অন্যতম সামাজিক দ্বন্দ্ব ছিল জমিদারের সঙ্গে গ্রাম্য কৃষকের। যদিও রবীন্দ্রনাথ সেই দ্বন্দ্বে কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন নি একথা সত্য,
ফলে তৎকালীন সমাজবাস্তবতা তাঁর সাহিত্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত না হলেও, গ্রামের দরিদ্র কৃষকসমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন জমিদার শ্রেণীর তুলনায় ভিন্ন। দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় ও তাদের সমাজের উন্নতির জন্য কবির যে নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনা ছিল, সে প্রমাণ শুধু তাঁর সাহিত্যে নয়, তৎকালীন তাঁর নানান সৃষ্টিকর্মের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে কৃষকজীবন ও সমাজ অনুসন্ধানের আগে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হ'ল, উনিশ শতকে বিদেশী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল দেশে, এল যে বাষ্প ও বিদ্যুৎনির্ভর যানবাহন ও উৎপাদনযন্ত্র, তা পুরোনো সমাজের ছাঁচে অনিবার্যভাবেই ডেকে আনল বৃহৎ একটি ভাঙন। গ্রামজীবনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত শহুরে মানুষরা তখন থেকেই পরিণত হলেন স্বতন্ত্র একটা শ্রেণীতে এবং পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে তাঁরা তৈরি করলেন যে নতুন কালের সংস্কৃতি, গড়ে তুললেন চিন্তা ও জীবনচর্যার যে নিজস্ব ছাঁচ, তার সঙ্গে চাষী কারিগর ও দৈহিক শ্রমের সাধারণ দেশবাসীর রইল না বিশেষ কোন সমাজমনস্কতার যোগ। নতুনকালের সমাজে গড়ে উঠল যেসব শুভ সংস্কারের আন্দোলন, যেমন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবারণ, জাতিভেদ অপসারণ, নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সম্প্রসারণ—তার কোনটাই স্পর্শ করল না এই অবহেলিত মানবগোষ্ঠীকে। অথচ এরাই হলো আশি শতাংশ মানুষ। উনিশ শতকের জাগ্‌তির ব্যর্থতা বোধহয় এখানেই। একই নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবেশে জন্মে এমন সাংঘাতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হতে দেখা যায় না কোন দেশেই সমষ্টি মানুষকে। এর ফলেই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এবং সংবাদপত্রে কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবন সমস্যার ছবি খুব সামান্যই ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বিপুলায়তন সাহিত্যেও তারা কতটা অনুপস্থিত। তাঁর ছোটগল্পে নিচুতলার যেসব মানুষের কথা আছে—তাদের একাংশ কৃষক। অথবা দৈহিক শ্রমের মজুর ও মাঝি-মালো শ্রেণীভুক্ত। 'গোরা' উপন্যাসেও আছে জমিদারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিক্ষোভের বিবরণ। 'মুক্তধারা'য় বাঁধ ভাঙার ইঙ্গিত আছে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এবং তাদের স্পর্শে সমাজরথের চাকা সচল হওয়ার সংবাদ আছে 'রথের রাশি'-তে। এইসব উদাহরণ কৃষকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মনোভাব বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। ভূমিহীন কৃষকের দুঃখকে তিনি নিজে কি চোখে দেখতেন, তা আরও ভাল করে বোঝা যায় 'দুই বিঘা জমি'-র উপেনের কাহিনীতে এবং 'গীতাঞ্জলি'র সেই গানে, যেখানে দেবালয়ের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মাঠের কৃষক ও রাজপথের খোয়া-ভাঙা মজুরের মধ্যে তিনি মহাজীবনের সন্ধান করতে বলেছেন।



বাংলাদেশের এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও এবং জমিদারির ভার গ্রহণ করার আগে সাধারণভাবে বাংলাদেশ থেকেই রবীন্দ্রনাথ রচনার অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু ১৮৯১-১৮৯৯ কালপর্বে পূর্ববাঙলার একটি বিশেষ ভূ-খণ্ডের পলি মৃত্তিকায় এসে কবি যে নানান শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলেন, তার অধিকাংশ তাঁর দরিদ্র প্রজাসাধারণ। সে অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেখানকার কৃষকজীবন ও সমাজকে জানার সুযোগ পেলেন। বিশেষ করে এই কালপর্বে শিলাইদহ ও শাহ্জাদপুরে বাসা বেঁধে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসী কৃষক, শ্রমজীবী ও দুঃস্থ সাধারণ মানুষের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মহাজনী ঋণ থেকে কৃষক খাতকদের মুক্ত করার জন্য ফজলুল হক যে আইন তৈরি করেছিলেন, সেই আইন এবং কৃষকদের সমস্যার কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সম্পন্ন রায়ত যাঁরা, তাঁদের জোতজমা, বাগান, পুকুর, গোরু-বাছুর আছে। ধান চাল ছোলা মটর আম কাঁঠাল মাছ ও হাঁস মুরগি থেকে তাঁদের ভাল আয়ও হয়। হয় বাঁশ তেঁতুল তুলো পাট থেকে। তাঁরাই হলেন গ্রাম্য সমাজের মাথা ও মুরুব্বি। কিন্তু তাঁরা আর কজন? বেশির ভাগই ত ভাগচাষী। অন্যের জমিতে চাষ করেন এবং যে ফসল ওঠে, তার বড় অর্ধেকটা দেন মালিককে, বাকিটা তোলেন নিজের ঘরে। এঁদের মধ্যে যাঁদের হাল বলদ আছে, কিম্বা যাঁরা বীজধান মজুত রাখতে পারেন, তাঁদের দিন তবু এক রকম করে যায়। কিন্তু হাল বলদ ও বীজ যাঁরা অন্যের কাছ থেকে কর্জ নেন, তাঁদের ভাগ্যে খাটাই সার হয়। নগদ টাকার প্রয়োজনে বছরের খোরাকী ধান তাঁরা আগেই বিক্রী করে ফেলেন। ক্ষুধার তাড়নায় বীজ ধানও খেয়ে ফেলেন। ভিটে মাটি থালা বাসন মহাজনের ঘরে বন্ধক দিয়ে তারপর স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে শহরের পথে পা বাড়ান। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় প্রত্যেকটি সংসার এবং ঠিকানাহীন ভিক্ষুকরূপে ঘুরে ঘুরেই শেষ হয় তাঁদের জীবন।" তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৮৯১-১৮৯৯ এই কালপর্বটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম পূর্ববাংলায় গমন করেন ১৮৭৫ সালে। এই সময় তিনি শিলাইদহের কাছে বিরাহিমপুর পরগণার খোরশেদপুরের গ্রামীণ পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তার সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন যখন ১৮৯০ সালে জমিদারির নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন পদ্মাপারে শিলাইদহের পল্লীভূমিতে। অবশ্য তাঁর কাজকর্মের সম্পর্ক পরে বেশি ছিল কালীগ্রাম পরগণার সঙ্গে।



বনমহোৎসব ঃ নন্দলাল বসু

জমিদারির সমস্ত অঞ্চল মাত্র দু'বছরে ঘুরেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, আমলা এবং মহাজনদের অত্যাচারের জন্যই গরীব গ্রামবাসী আরো গরীব হয়। নানাভাবে গ্রামবাসীদের তাঁরা শায়েস্তা করতে থাকেন। অবশেষে প্রজাদের এই দুর্দশা দূর করার পাকা ব্যবস্থার জন্য এবং তাদের পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা লাঘব করার উপায় হিসেবে ১৯০৫ সালে তাঁর জমিদারি কালীগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন। এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ফলে বহু প্রজা ঋণমুক্ত হয় এবং অনেক মহাজন ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আরও একটি জিনিস করেছিলেন, তা হ'লো—জমিদারির আয়ও যেমন বাড়িয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বাড়তি আয়ের অধিকাংশই কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। জমিদার ও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, ছাত্রাবাস ও মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। জমিদারির কাজে এসে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবল মহাজনেরা যে কিভাবে দুর্বল গ্রামবাসীদের বঞ্চনা ক'রে আরো প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের শোষণের প্রবৃত্তি যে মনের কত গভীরে মূল বিস্তার করেছিল, তা দেখে তিনি জমিদারির কাজে এসেই দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে কড়া নজর রাখতে লাগলেন আমলা মহাজন ও জোতদারের ওপর। গ্রামের সব ছেলেপুলে গরু-লাঙ্গল-ঘরকন্নাওলা সরল নিরুপায় নিঃসহায় নিতান্ত পরনির্ভর ভূমিহীন চাষাভুষোদের তিনি একান্ত আপনজন মনে করে তাদের দুঃখের বোঝা লাঘব করতে কিছু না কিছু করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি গান গেয়েছেন—

"আয়রে মোরা ফসল কাটি—
ফসল কাটি, ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আগুন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।"

"পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতায় প্রায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—

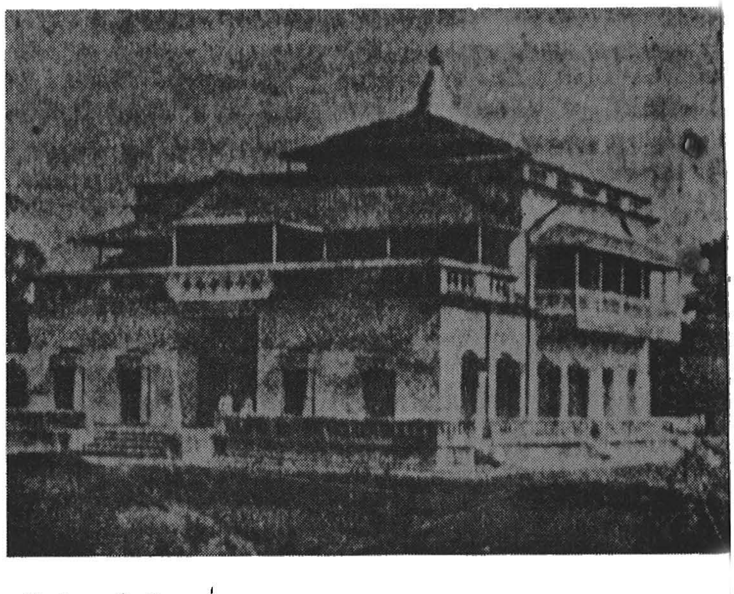
"কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—
সেদিন আমার হত মনে
ওই সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।"

জমিদারির কাজে এসে দরিদ্র গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুললেও, জমিদার ও জমিদারি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ, অপূর্ণতা ও নিন্দার কথা বলা হলেও এবং রবীন্দ্রনাথ তা বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিলেও, আমরা বলতে পারি, এ ঘটনায় তাঁর জীবন ও সাহিত্য উভয়েরই পট-পরিবর্তন হয়েছে। তা না হলে তিনি বলবেন কেন—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।"

আগেই বলেছি পূর্ববাংলার পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার দরিদ্র কৃষক-সমাজ ও গ্রামবাসীদের নিকট-সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য উভয়েরই পটপরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তিত পটভূমিতে এবারে আমরা কবির 'গল্পগুচ্ছে' প্রবেশ করলেই কৃষকজীবন ও সমাজ অনুসন্ধানকরণ স্পষ্ট হবে। 'গল্পগুচ্ছে' তিনি পল্লীর মানুষ ও জীবনের প্রতি সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলেন সত্য, তবু অধিকাংশ গল্পোৎসাহীর দৃষ্টি ও রুচি স্থূল বলে, সে আকর্ষণ কোনোদিনই তেমন তীব্রভাবে প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় সাহিত্যরসিকের কথা বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের গল্প বাঙালি পাঠকের কাছে যতটা প্রিয় বা সমাদৃত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-রাজসিংহ-চন্দ্রশেখর-প্রতাপ সীতারামের কাহিনী। বিরাট বিরাট চরিত্র, চমকপ্রদ কার্যকলাপ। যখন তিনি সামাজিক স্তরে নেমে এসেছেন, তখনও জমিদার কৃষ্ণকান্তের পরিবার, জমিদার নগেন্দ্রনাথ। এইসব উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজ তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির অপরিচিত ছিল না। তার ওপর এইসব বড়ো বড়ো চরিত্রের বড়ো বড়ো সুখ-দুঃখের পাশে কোথায় লাগে তুচ্ছ রতন, রামকানাই, রাইচরণ, দুখিরাম-ছিদাম আর ফটিকের ছোটখাটো বেদনা। আসলে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সাহিত্য-পাঠকের কাছে পল্লীর সহজ-সরল পরিবেশ চিরকালই অজ্ঞাত। কেবল অজ্ঞাত নয়, ঐ ঘরোয়া সুখ-দুঃখের ছোট ছোটো ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত পল্লীজীবন সম্বন্ধে শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো কৌতূহলই ছিল না। শিক্ষিত নাগরিকের কাছে পল্লীজীবন একান্তই রসহীন। অবশ্য সেদিনের পল্লীসমাজেও সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বাস ও প্রথার ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন সুখে-দুঃখে ভরে উঠত। পল্লীজীবনের গতি বড়ই মন্থর, ঘটনাগুলি বড়ই কৌতূহলের রসবর্জিত। পল্লীর এই পরিবেশ, এই সব মানুষ এবং তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ নৈরাশ্য সম্বন্ধে একদিন সাহিত্য-পাঠকের একটুও ঔৎসুক্য ছিল না। কারণ সেকালের শিক্ষা শহরবাসী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বভাবসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তরুণ বয়সের মন নিয়ে সেই পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ এবং নরনারীর একেবারে কাছাকাছি গিয়ে বাস করতে হ'ল। যদিও যত কাছে তিনি যেতে চাইলেন, প্রহরীবেষ্টিত আভিজাত্য তাঁকে সে নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করল, তবু শহুরে রাজাবাবু গ্রামে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, পল্লীর এই সাধারণ মানুষের জীবনগুলি নাগরিক মানবের মতোই গভীর কৌতূহলময়, এদের সুখ-দুঃখেও আনন্দ-করুণার রস জমে ওঠে, যার মূল্য কোনমতেই তুচ্ছ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me....They seemed to belong to quite another world." যাঁরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ উঁচুতলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে, নিচুতলার মানুষকে তিনি ভালো করে দেখার বা চেনার সুযোগ পাননি, কবির উক্ত উক্তি নিঃসন্দেহে তাঁদের ভ্রান্তি নিরসন করবে। কেননা গ্রাম্য কৃষকের জীবন ও তাদের সমাজকে তিনি ভালো করেই চিনেছিলেন, আর চিনেছিলেন বলেই তাদের রক্ষা করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করেছিলেন।

'গল্পগুচ্ছের' গল্পে কৃষকজীবন ও সমাজের ছবি কতখানি বাস্তবসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সে সম্পর্কে দু'-একটি কথা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো। পল্লীবাংলার পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গল্প হ'ল 'সাধনা যুগের' গল্পগুলি। কেননা এই যুগের সাহিত্য-রচনার প্রতি কবিরও পক্ষপাত ছিল এবং এই যুগে গল্পই তাঁর অন্যতম প্রধান রচনা বললে অত্যুক্তি হবে না। এই যুগের গল্প সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "My later stories havenn't got that freshness, that tenderness of earlier stories. I am very susceptible to environment and untill and unless I am in the midst of a certain type of atmosphere I can not produce any artistic work. During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong, and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity. I enjoyed the surrounding scenery and the beauty of rural Bengal. The river system of Bengal, the best part of this province, fascinated me....So when I re-read these short stories of mine.....they bring back to me vividly the beautiful

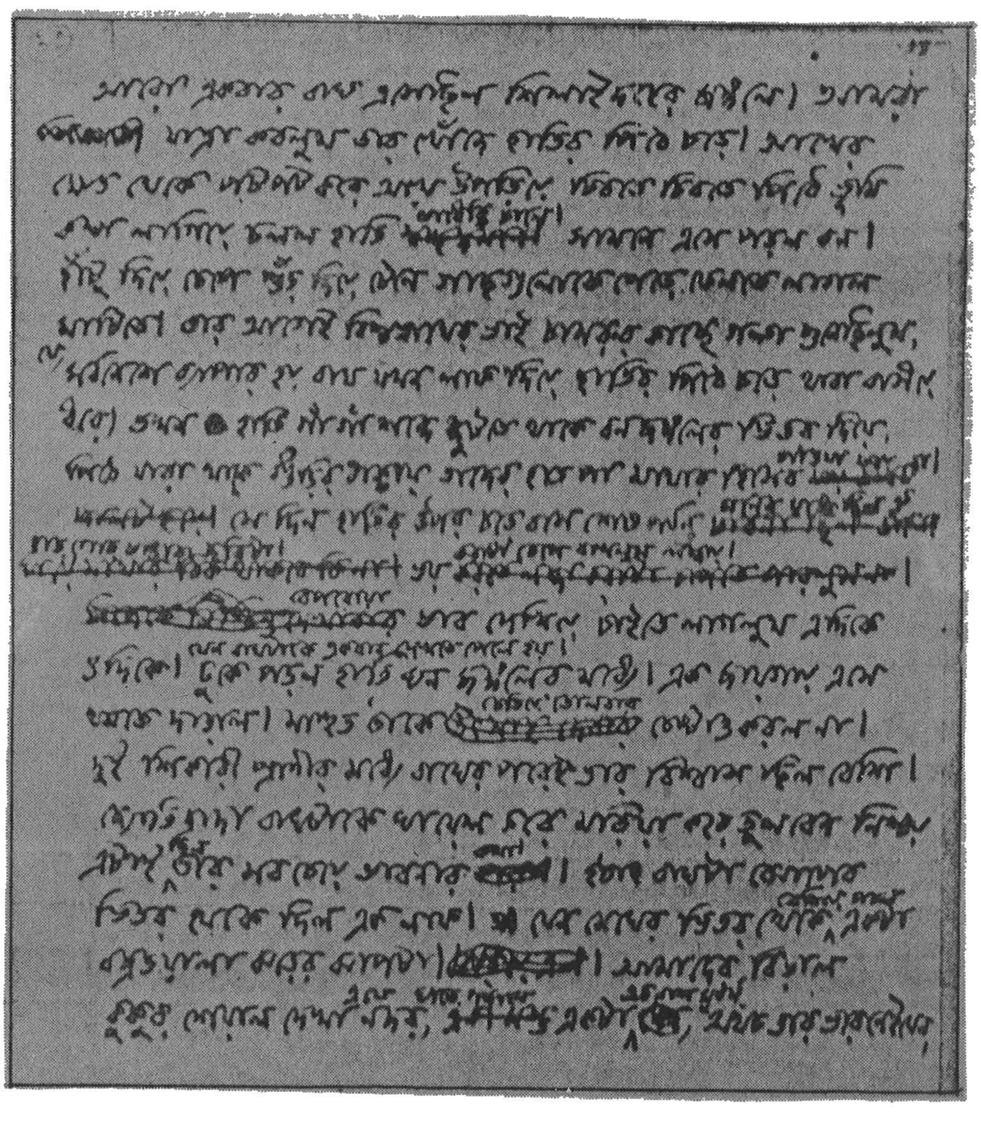


শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

atmosphere of these earlier short stories." রবীন্দ্রনাথের গল্পে পারিপার্শ্বিক হিসেবে প্রকৃতি—'সাধনা যুগে' নদীমাতৃক উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি মস্ত জায়গা জুড়ে আছে। গল্পগুচ্ছের প্রধান ঋতু বর্ষা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তাঁর গানে বর্ষার স্থান সর্বোচ্চ, এই বর্ষার রাজসমারোহ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্য। 'সাধনা যুগের' গল্পে বর্ষা যেখানে একটা বড় স্থান জুড়ে আছে এবং যেহেতু বর্ষার সঙ্গে কৃষকজীবনের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ণ আছে, সেই হেতু এই যুগের গল্পগুলির মধ্যেই কৃষকজীবন ও সমাজকে ব্যাপকভাবে পাবো।

'সাধনা যুগের' কৃষকজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল—পোস্টমাস্টার, মুকুট, মধ্যবর্তিনী, সমস্যাপূরণ, ছুটি, অতিথি, সুভা, মহামায়া, সমাপ্তি, শাস্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জীবিত ও মৃত, একরাত্রি প্রভৃতি। এই পর্বের গল্পগুলিতে সমাজচৈতন্য নেই বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, কবি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, "সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লী-পার্বনে, আপন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়ে।" আবার অন্যত্র গ্রাম্য কৃষকজীবন ও সমাজ প্রসঙ্গে বলেছেন, "যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতালতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট মোটা পা-সরু রুগ্ণ ছেলেমেয়েরা যেখানে-সেখানে জলেকাদায় মাখামাটি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়—তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়।"

এই অভিজ্ঞতাই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার'-এর রতন, 'ছুটি'র ফটিক, 'সুভা'র বোবা মেয়ে সুভা, 'শাস্তি' গল্পের দুখিরাম-ছিদাম-চন্দরা অথবা 'অতিথি'র তারাপদ প্রত্যেকেই কৃষক চরিত্র। রতনকে তিনি যেভাবে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তার পারিবারিক অবস্থান বুঝে নিতে পাঠক হিসেবে আমাদের কোনরকম অসুবিধা হয় না। একথা শুধু রতনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, একথা ফটিক ও সুভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দুখিরাম ও ছিদাম তো জনমজুর হিসেবেই গল্পে এসেছে। এই কৃষকজীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা ও



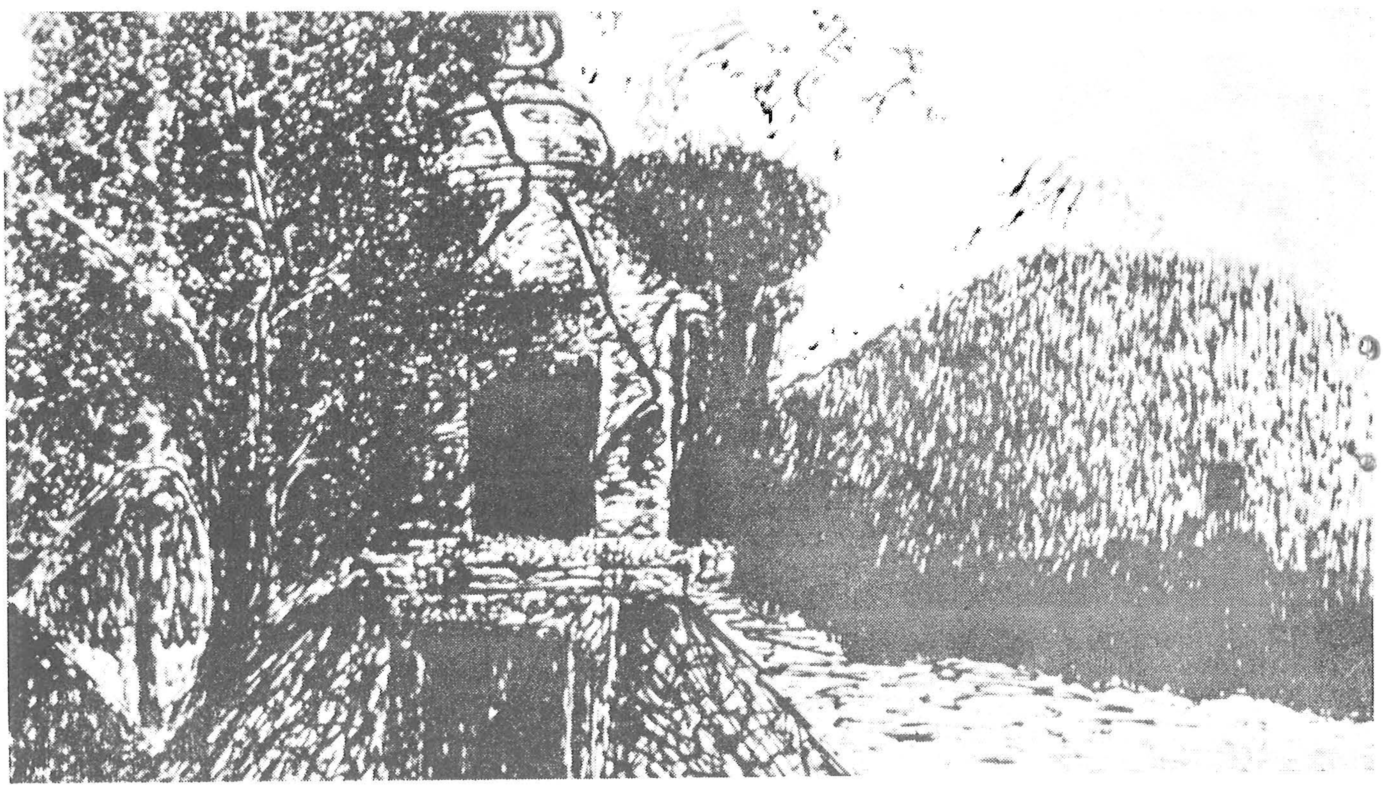
শোষণের অভিজ্ঞতার ছবি কেমন করে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন, সে প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন—"My whole heart went out to the simple village people as I came in close contact with them." শুধু গল্পেই নয়, সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও এই কৃষি ও কৃষক সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ভেবেছিলেন, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। কারণ ভারতবর্ষের সর্বাত্মক কল্যাণ কামনা করতে এ বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিশেষ করে কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও পত্রাবলীতেও এই কৃষকজীবন ও সমাজের ছবি এসেছে। 'সোনার তরী' কাব্যে এর অনেক উদাহরণ আছে। 'গোরা' উপন্যাসেও আছে জমিদারি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ। 'মুক্তধারা' নাটকে বাঁধভাঙার ইঙ্গিত তো শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই। 'রক্তকরবী' নাটকেও একেবারে শেষাংশে কবি আহ্বান করেছেন—

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।"

পত্রাবলীতেও রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবর প্রতিমাদেবীকে এক চিঠিতে লিখেছেন—"আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারিনি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারবে না?" একই বছরে ২১ নভেম্বর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, "জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে।" এখানেই শেষ নয়, শ্রীনিকেতনের উৎসবে 'পল্লীসেবা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।"

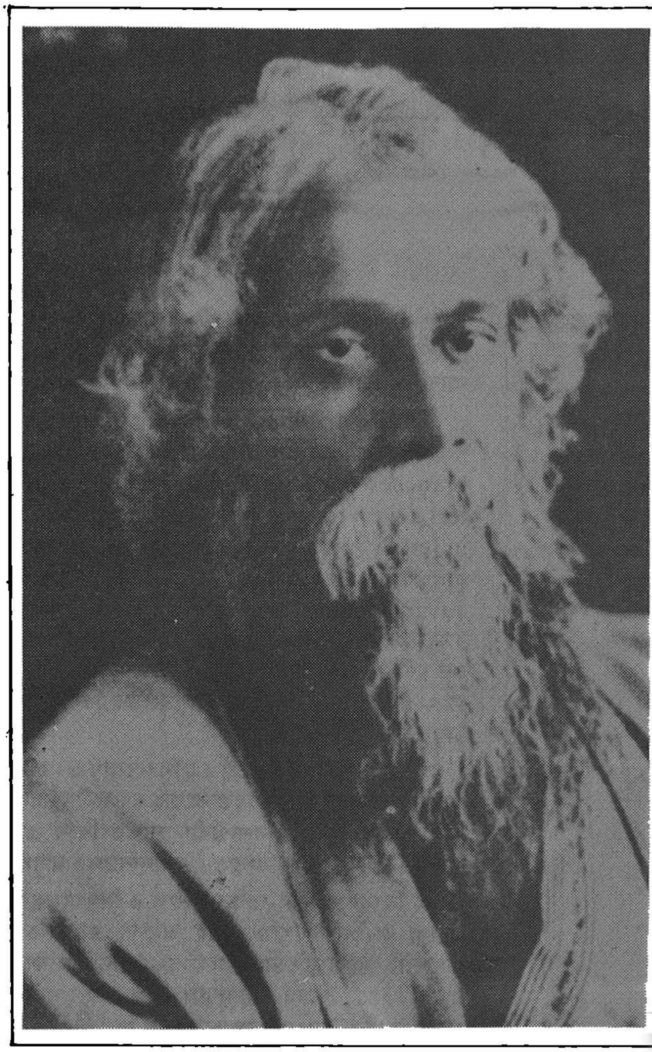
আজ রবীন্দ্রনাথ নেই—আমরা আছি, আমরা বলব, কারণ ইতিমধ্যেই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে তাঁর কৃষক ও কৃষকের জীবনসংক্রান্ত প্রগতিশীল মতবাদ। তারই সঙ্গে আমাদের চেতনায় আছে উজ্জ্বল, সর্বজয়ী বৈজ্ঞানিক দর্শন। জীবনের শেষ অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথই সেই রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে সাগ্রহে বরণ করেছে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি নিরন্ন মানুষ। তাঁরই কাঙ্খিত কৃষি ও কৃষকজীবনের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এই রাজ্যে।



‘রথের রশি’তে টান



জগন্নাথ ঘোষ



॥ প্রাক্ কথা ॥

রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা’ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থখানি তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকেই উৎসর্গ করেন। একখানি পত্রে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

“তোমার জন্মদিন উপলক্ষে, ‘কালের যাত্রা’ নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশাকরি, এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করছেন তার রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।”

‘কালের যাত্রা’ গ্রন্থে দুটি রচনা সন্নিবদ্ধ হয়েছে। একটি ‘রথের রশি’ অন্যটি ‘কবির দীক্ষা’। আশ্চর্যের বিষয়, দুটি রচনা গ্রন্থভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গপত্রে ‘কালের যাত্রা’কে একটি নাটিকা বলে উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব তিনি ‘কবির দীক্ষা’কে নাটকের তালিকায় ফেলতে চাননি। ‘কবির দীক্ষা’ গ্রন্থভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ‘রথের রশি’র প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। পক্ষান্তরে ‘রথের রশি’র নামটিকে গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহার করেন নি। একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হল—‘কালের যাত্রা’। আসলে রথের রশির মধ্যেই আছে যাত্রার মহিমা। বলাবাহুল্য এই যাত্রা মহাকালের। নামকরণের মধ্যে একটি রূপকধর্মিতা আত্মগোপন করে আছে। আমাদের আলোচ্য ‘রথের রশি’।

‘কালের যাত্রা’র প্রথম রচনা ‘রথের রশি’ রবীন্দ্রনাথের ১৯২৩ সালে রচিত ‘রথযাত্রা’ নামের নাটকের পরিবর্তিত নাম। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা ‘কবির দীক্ষা’র পূর্বনাম ছিল ‘শিবের দীক্ষা’। এটির রচনাকাল ১৯২৮। রথযাত্রা রচনার একটি ইতিহাস আছে যা কৌতূহলোদ্দীপক। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র জীবনী’র তৃতীয় খণ্ডে এই ইতিহাস বিবৃত করেছেন। সেই ইতিহাস পাঠে জানা যায় প্রমথনাথ বিশী ‘রথযাত্রা’ নামে একটি নাটক লেখেন।[১] তিনি ‘রথযাত্রা’ নাটক পাঠ করেছিলেন বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অধিবেশনে। এই ‘রথযাত্রা’ রবীন্দ্রনাথকে ‘রথের রশি’ রচনার প্রেরণা যোগায়। পূর্বেই বলা গেছে ‘রথের রশি’ ‘রথযাত্রা’র পরিবর্তিত নাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ‘রথযাত্রা’ গদ্যনাটক, কিন্তু ‘রথের রশি’ গদ্যছন্দে রচিত নাটক। এই দিক থেকে উক্ত রচনা দুটির রচনা রীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটির নাম ‘রথযাত্রা’ না রেখে ‘রথের রশি’ রেখেছেন। ব্যাপারটি খুবই ইঙ্গিতময়। রশির মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রশি দিয়েই রথ টানতে হয়। রশি ঢিলে হলে রথের চাকা অচল হয়। চাকাকে সচল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই রশিতে প্রবল টান। কখনও যদি এই টানে শক্তির ঘাটতি দেখা দেয় তবে, রথ চলে না।

বোঝাই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রথ বলতে সমাজের চলচ্ছক্তির কথাই বলতে চেয়েছেন। সমাজের সচলতায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমবেত সহযোগিতার প্রয়োজন। যদি কখনও সেই সহযোগিতায় ভাঁটা পড়ে বা সব মানুষের অসঙ্কুচিত সংস্পর্শ থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়, তবে সমাজের সুস্থ চলমান বেগ থেমে যায়। ‘কালের যাত্রা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের চলমানতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, শুধু 'রথের রশি'তে নয়, তাঁর ইতিপূর্বে রচিত বিভিন্ন নাটক, গল্প, কবিতাতেও চলমানতার বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের ৮ সংখ্যক কবিতার কথা, যেখানে তিনি বিরাট নদীর নিরন্তর গতিচ্ছন্দের মহিমা ব্যক্ত করেছেন। নদী যদি কোনদিন গতিহীন হয়ে পড়ে তবে সে যে কি ভীষণ অশুভ এক ঘটনা, তারই ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

অতএব 'পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বত' যাতে মাথা তুলতে না পারে সেই জন্য নদীর গতিকে অব্যাহত রাখতেই হবে। এই গতিপ্রবাহই সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর। কেননা এই গতিপ্রবাহই আনে যাত্রার আনন্দ গান। 'বলাকা'র ১৮ সংখ্যক কবিতার কথা ধরা যাক। এই কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ স্থিরতার অভিশাপ যে কত ভয়াবহ ও বীভৎসতার বর্ণনা দিয়ে তার হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যাত্রা গান গাওয়া, তার নন্দিত পরিস্থিতির ছবি উপহার দিয়ে লিখেছেন —

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দ গানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

উদ্ধৃতাংশটিতে আছে যাত্রা, রথ, বিশ্বকবি ও বিশ্বচ্ছন্দের উল্লেখ যা রথের রশিরও প্রধান উপকরণ। তাই রথযাত্রা নয় রথের রশি ধরেই রবীন্দ্রনাথ টান দিয়েছেন। এই টানে সমগ্র সমাজটাই মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চঞ্চলতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন নাট্য মুহূর্ত, যা নাটকের প্রধান অবলম্বন।

'রথের রশি' শুরু হয়েছে নারীকণ্ঠের বিস্মিত জিজ্ঞাসার মাধ্যমে—

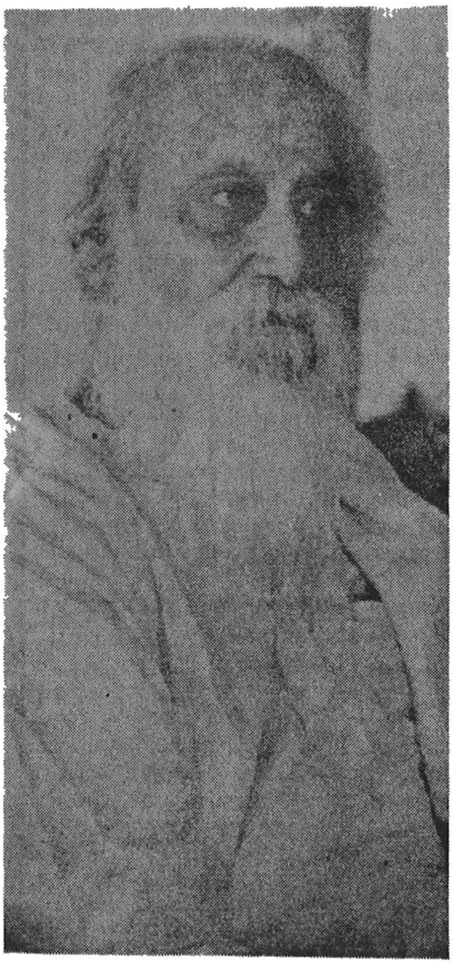
এবার কি হ'ল ভাই!
উঠেছি কোন ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল;
রথের নেই দেখা, চাকার নেই শব্দ।

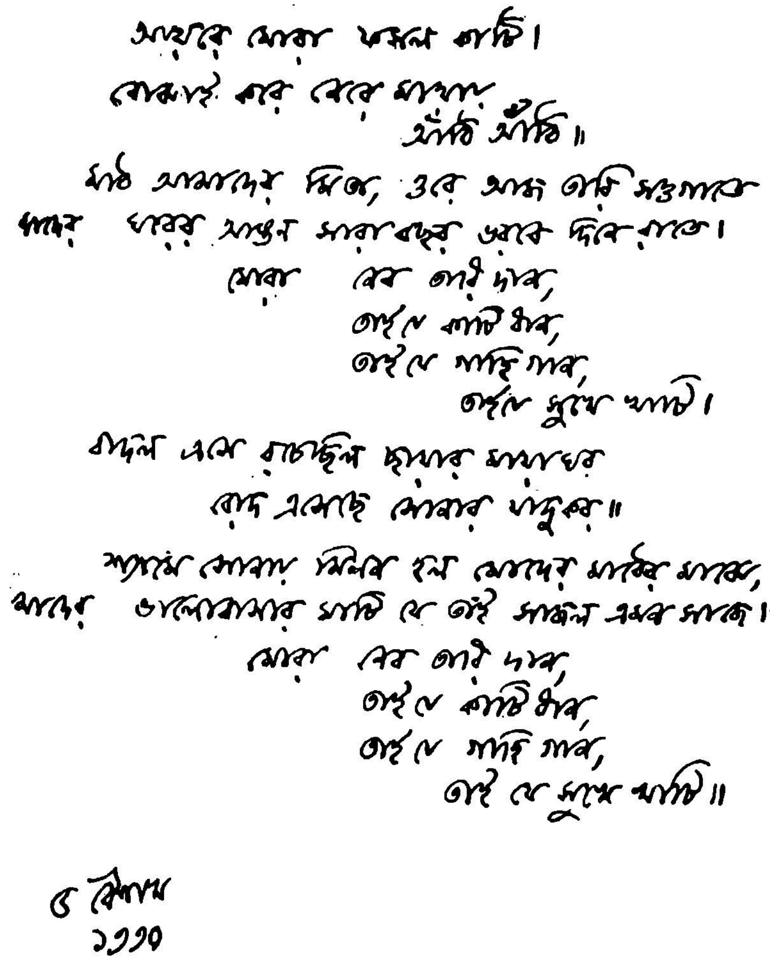
এই উক্তি এক গ্রাম্য নারীর, রথ না চলার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে সে সন্ত্রস্ত। তার সন্ত্রস্ত মনোভাবকে আরো বেশী প্রখর করে তুলছে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া নারী। এমনকি সন্ন্যাসীও আপন জ্ঞানের গরিমায় উক্ত পরিণতির ভয়াবহতাকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে—

সর্বনাশ এল।
বাড়বে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী।
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

সন্ন্যাসীর বাণী যেন অনেকখানি দৈববাণীর মতো। কিন্তু গ্রাম্য নারীদের কাছে এই বাণী হেঁয়ালী ভরা বলে মনে হয়েছে।

গ্রাম্য নারী ও সন্ন্যাসীদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে নাটকের এক দৃশ্য যদিও দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাটকে নেই। গ্রাম্য নারীদের মতো





নাগরিকরাও তাদের আড়ষ্ট মূঢ়তায় রথের রশির অচলতার ব্যাখ্যা করেছে আর ভয়ার্ত শিহরণে বিচলিত হয়েছে। অচল রথের রশি গ্রাম্য নারী ও নাগরিকদের কাছে অজগর সাপ বলে মনে হয়েছে। তারপর একে একে এসেছে সৈন্যদল, পুরোহিত, মন্ত্রী, বণিক প্রভৃতি। তারা নিজেদের মধ্যে ব্যাখ্যা করেছে রথের অচলতার রহস্য। এদের মধ্যে কেবলমাত্র মন্ত্রী জানে উক্ত রহস্য কেমনভাবে উদ্ঘাটন করতে হয়। তাই মন্ত্রীকে যখন চর এসে বলে, 'মন্ত্রীমশাই গোল বেঁধেছে শুদ্র পাড়ায়' তখন মন্ত্রী নির্বিকার কণ্ঠে বলেন—

দল বেঁধে আসছে বনে ; ভয় করিনে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

মন্ত্রীর মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়েছে শূদ্রদলপতির সঙ্গে কথোপকথনে। শূদ্র দলকে রথের রশি ধরতে যখন বারণ করছে পুরোহিত এবং সৈনিকরা, তখন মন্ত্রীই প্রবল হুঁশিয়ারিতে বলেছে—

চুপ করো !
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড় !
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তারপরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

শূদ্রদের হাত লাগানোয় যখন রথ অবশেষে চলতে আরম্ভ করল, তখন ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়েছে পুরোহিত। তার ধারণা, স্বয়ং ঈশ্বর শূদ্রের স্পর্শে জাত খুইয়েছেন। অতএব একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হয়েছে, ঈশ্বরকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—

আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

আর সৈনিকের কাছে রথ চলার ব্যাপারটা ঠেকেছে উল্টাপাল্টার মতো। এই উল্টাপাল্টার অর্থ বিশদ করেছেন কবি—

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নাইলে ছন্দ মেলেনা। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশী,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

কবি আরও বলেছেন—

আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

কবির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন সমাধান করেছেন রথ চলা না-চলাজনিত যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের, তেমনি উদ্ঘাটন করেছেন সমাজ বদলের নিহিতার্থও। শূদ্রজাগরণের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে তারই কণ্ঠে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু একজন মানবপ্রেমিক হিসাবে মানুষের সামাজিক অবস্থানকে চিনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রকৃত মার্কসবাদীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য খুবই কম। রবীন্দ্রনাথ শূদ্র বলতে তাদেরই বুঝিয়েছেন যারা দলিত, নিপীড়িত ও শোষিত। অথচ এদের শ্রমেই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, যাদের দ্বারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, সভ্যতা সচ্ছল হয়েছে, তারাই থাকল পায়ের তলায় অস্পৃশ্য হয়ে। সভ্যতাগর্বী পরশ্রমজীবী তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের কোন মূল্য দিতে চায় না। শূদ্ররা মূল্যহীন হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এরপর থেকে আর তারা পড়ে পড়ে পদদলিত হবে না। তাদের শ্রমেই যখন সমাজ ও সভ্যতা সচলতাপ্রাপ্ত হয়েছে, এখন সমাজ ও সভ্যতাকে চালাবার ভার তারাই স্বহস্তে গ্রহণ করবে। তাই শূদ্র দলপাত মন্ত্রী ও পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে শুনিয়েছে—

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ ;
আমরাই বুনি বস্ত্র তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।।

উদ্ধৃতাংশটিতে 'তোমরা' বলা বাহুল্য স্থিতস্বার্থ তথাকথিত উচ্চবর্গীয়রা। এই 'তোমরা' রা যে দেশের সমাজব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকতা করে, সে দেশ প্রকৃত পক্ষে 'দুর্ভাগা দেশ'। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' রচনার বেশ কিছুকাল পূর্বেই কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্যে এই বলে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন যে,—

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রাখিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের ছবি এঁকেছিলেন, যেখানে অস্পৃশ্যতা থাকবে না। উচ্চবর্ণের গৌরবে যে গোরা আনন্দময়ীর কাছে বায়না ধরেছিল, অস্পৃশ্যা রমণী লছমিয়াকে তাড়িয়ে দিতে, উপন্যাসের সমাপ্তিতে সেই গোরার কণ্ঠে শোনা গেছেঃ "মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"

শূদ্ররা সভ্যতার প্রদীপ জ্বলন্ত রাখে অথচ পরিতাপের কথা সেই শূদ্ররাই হল রবীন্দ্রনাথের মতো 'সভ্যতার পিলসুজ'[২]। তিনি দেখেছিলেন,



রুশভাষায় অনূদিত গীতবিতানঃ শিল্পী

প্রদীপের আলো চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিলসুজকে মলিনতামুক্ত রাখার কথা কেউ ভাবেই নি। শূদ্ররা যখন দেখল তাদের কথা ভাবার লোক কেউ নেই, তখন তাদের কথা ভাবার জন্য তারাই নিল অগ্রণীর ভূমিকা। 'রথের রশি' নাটকে সেই বিষয়ের-ই নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। দলপতি তার সঙ্গীসাথীদের ডেকে বলে—"আয়রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।" আশ্চর্যের ব্যাপার যে রথ এতক্ষণ অনড় ছিল। রশি ছিল অজগর সাপের মতো নিষ্প্রাণ, শূদ্রদের টানে 'দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁছেচে'।

দড়িতে প্রাণ আসার অর্থ সচল হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন রথের গতি কি নিরুদ্দেশ? এক কথায় উত্তর, না। সচল রথ একটি নির্দিষ্ট গতিপথ ধরেই এগোল। প্রথমে সে ধরল রাজপথ। এই পথ ধরে চলতে চলতে "রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই (ধনপতিদের) ভাণ্ডারের মুখে"। তারপরে রথটা গেছে অস্ত্রভাণ্ডারের দিকে।

শূদ্রদের দিয়ে ধনীদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন তো সমাজবিরোধীর কাজ। রবীন্দ্রনাথ এইরকম কাজকে সমর্থন করেন ভাবা যায় না। সত্যিই ব্যাপারটি অভাবনীয়। কিন্তু আমরা যদি তলিয়ে দেখি, তবে বুঝব ধনীরা তাদের ধনভাণ্ডার ভরিয়ে তুলেছে শূদ্রদের শ্রমজাত ফসলের মাধ্যমে। অতএব, এই ধনভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরত্নের প্রকৃত মালিক ধনীরা নয়, শূদ্ররাই। তাই সঙ্গত কারণেই শূদ্ররা আপন অধিকারের সচেতনতায় প্রথমেই হাত বাড়িয়েছে তাদেরই শ্রমজাত সম্পদের দিকে। একে লুণ্ঠন বলা যায় না। এতদিনে সঞ্চিত ধন তার আসল মালিকের হস্তগত হল। অতএব রবীন্দ্রনাথ সমাজবিরোধীদের দুষ্কৃতিকে যে প্রশ্রয় দেন নি, আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আর অস্ত্রভাণ্ডারের অধিকারতো স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে শূদ্রদের। এতদিন যে অস্ত্র শূদ্রদের উপর বর্ষিত হত, শূদ্ররা সেই অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। এই অস্ত্র তারা প্রয়োগ করবে তাদের অত্যাচারীদের প্রতি।

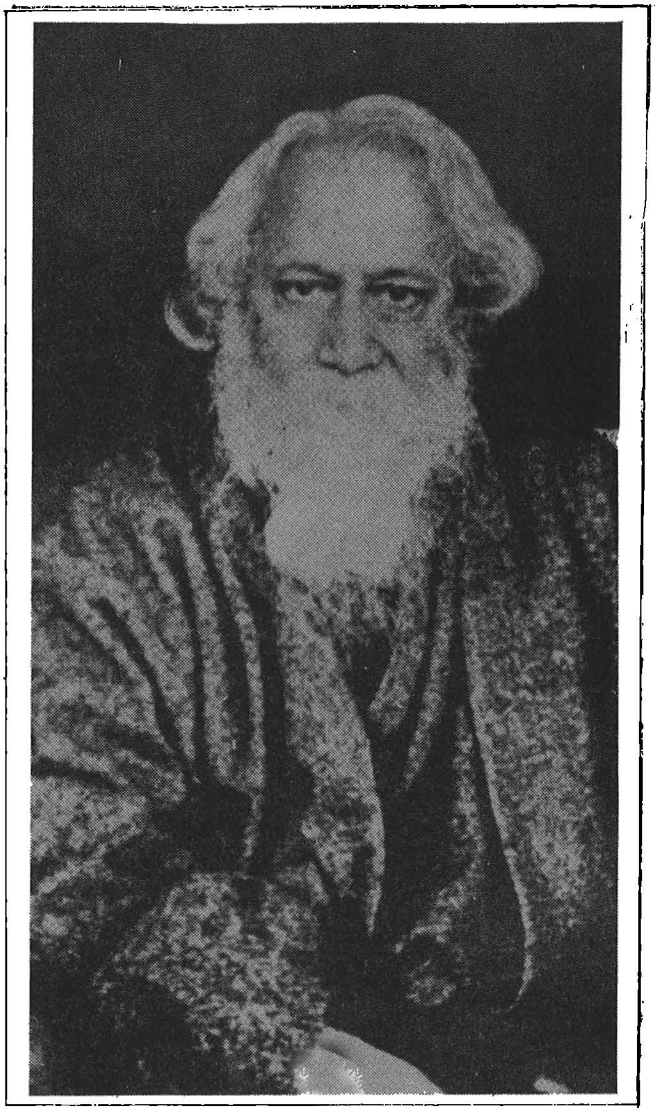
।। কালচক্র যান ।।

'রথের রশি'তে আমরা দেখলাম, অচল রথ শূদ্রদের হস্তস্পর্শে সচল হল শুধু নয়, ধনিকের ধনভাণ্ডারের দিকে তীব্রগতিতে এগোতেও থাকল। রথচলার আনন্দে শূদ্রদল চীৎকার করে মহাকালনাথের জয় ঘোষণা করেছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, নাটকটা তারপরও এগিয়ে গেছে। পাঠকের কৌতূহলাক্রান্ত জিজ্ঞাসা: নাটক আরও কেন অনেক দূর টেনে নেওয়া হল।

মনে রাখতে হবে 'রথের রশি' নাটকে রথচলার ঘটনা মুখ্যস্থান পেলেও রথচলাকে অব্যাহত রাখাই প্রধান বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইজন্যেই রথ চলাবার স্থিত স্বার্থের প্রতিভূ অর্থাৎ ধনিক, নাগরিক, সৈনিক, পুরোহিত, মন্ত্রী ও সন্ন্যাসীদের কার কেমন প্রতিক্রিয়া তার এ বিবরণ জানানোটা নাট্যকার গণনার মধ্যে এনেছেন। এমনকি নারীদের মনোভাব কেমনতরো রূপ ধারণ করেছে সে কথাও জানাতে চেয়েছেন তিনি। রথচলাকে পুরোহিত মেনে নিয়েছেন এই ভেবে সে মহাকাল তাঁর জাত খুইয়েছেন একদিন তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সৈনিক ভেবেছে মহাকালের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। দ্বিতীয় সৈনিকের তো সন্দেহ ঘোচে না এই ভেবে যে—

চেয়ে দেখোনা, ওরাই টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে।

রথ চলতে থাকায় প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া নারীর এত দিনের বিশ্বাসের ভিত্তি টলে উঠেছে। প্রথমার কাছে 'শুদ্দুরের টানে' আর মেলেচ্ছের ছোঁওয়া রথচলা যেন 'ঘেন্নার' ব্যাপার। দ্বিতীয় আর মন্ত্রে বিশ্বাস নেই। তারা এতদিন বৃথাই ঘি, জল আর দুধ দিয়ে রাস্তা পিছল করেছে। আর তৃতীয়ার ধারণা শূদ্রদের নাম উচ্চারণ করাও পাপ। কিন্তু,



দোষ নারীদের নয়। নারীদের সরল বিশ্বাসকে ভুল স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে সমাজপতিরা। দোষ সমাজপতিদেরই।

সমাজের চলচ্ছক্তির প্রকৃত রহস্য একমাত্র জানা আছে কবির। অবশ্য পুরোহিত সেকথা মানতেই চায় না। সৈনিকরা যখন কবির শরণ নিতে যাচ্ছিল, তখন, পুরোহিত বলেছিল—

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে। বুঝবে কবি?
ওরা বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কী।

কবিরা 'বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা' পুরোহিতের এই মন্তব্য অনস্বীকার্য। কিন্তু, তাঁদের বানানো কথার মধ্যেই যে থাকে আসল সত্য, মূঢ় অহমিকায় ভরা পুরোহিত তা জানে না। কেন পুরোহিত ও রাজার হাতে রথ চলল না তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন কবি। তিনি বলেছেন—

ওদের (পুরোহিত ও রাজা) মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামলনা চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

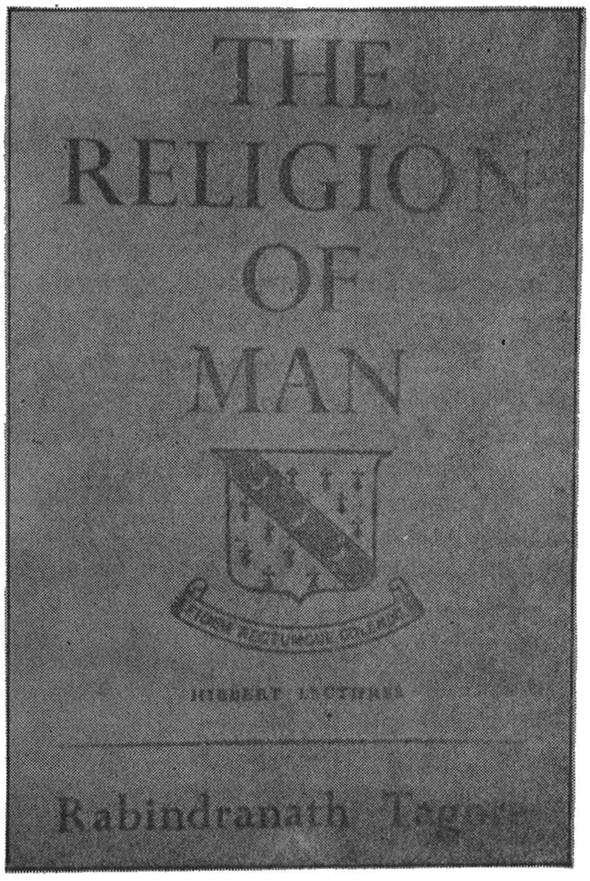
কবিরা সত্যদ্রষ্টা। তাঁদের চোখেই ধরা পড়েছে শূদ্ররা যেভাবে মার খেয়েছে, এমন একদিন আসবে, যখন সংঘবদ্ধ হয়ে তারা দেবে পাল্টা মার। এই পাল্টা মার দেওয়া যে একটি সামাজিক নিয়ম, কবি সে কথা জানেন। কিন্তু, মারের পাল্টা মারই কেবল সামাজিক স্থিতির লক্ষণ নয়। এমন একদিন আসবে যেদিন ক্ষমতার দম্ভে শূদ্ররাও নেমে পড়বে শোষণে ও দমনে। তখনকার শোষিত, দমিত মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সেই শোষণ দমনের প্রতিশোধ তুলবে। এই প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা শোনা যাবে পুরোহিত ও কবির কথোপকথনের মধ্যে। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেছে কবিকে—

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

পুরোহিতের জিজ্ঞাসার উত্তরে কবি বলেছেন—

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

কবির কথায় ধরা পড়েছে হলধরের মাৎলামিতে রথ আবার অচল হবে। সমাজের সর্ব অবস্থাতেই রথ সচল রাখাই প্রধান ব্যাপার। কেবলমাত্র গায়ের জোরেই রথ সচল হয় না এবং থাকে না। রথ সচল করা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি তাকে সচল রাখা জরুরী কর্তব্য। কবি জগতের মানুষের কানে পৌঁছে দেন সেই কর্তব্যের বাণী। বলা বাহুল্য, এই বাণী কোন ফুসমন্তর নয়। রথযাত্রায় কবিরই ডাক পড়ে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজের লোকের ভীড়ে কবি যথাস্থানে এসে পৌঁছাতে পারেন না।



তবু তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে রথ চালানোর ও চালু রাখার রহস্য। কবি বলেন—

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চালচলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান।
যার ভোজন কুৎসিত।
যার ওজন পরিমিত।
আমি মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল মানের উপর নয়।

কবি পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করলেও তাঁর লক্ষ্যপথে কিন্তু শুধু পুরোহিত নয়, আছে সৈনিক, ধনিক, রাজা, অগণিত সাধারণ নরনারী। আর আছে ক্ষমতালাভের গর্বে অভিভূত শূদ্ররাও। সমাজের চলচ্ছক্তির আছে ছন্দ। এই ছন্দের তালে ধরা দেয় সুন্দর। এই সুন্দরের জন্য কবি রচনা করেন তালমানমুক্ত গান। সমাজকে একঝোঁকা রাখলেই সে গানের তাল কেটে যায়। কবির দায়িত্ব হল জগৎবাসীকে তাল বজায় রাখার উপায় সম্বন্ধে অবহিত রাখা। শূদ্রদের সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখতে সেই তাল কেটে গিয়েছিল। রথ চলেনি। শূদ্ররা এসে হাত লাগানোতে রথ সচল হওয়াকে কবি বলেছেন সে কাটা তাল জোড়া লাগল। তিনি বলেছেন—

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলেনা। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশী,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেই খান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটাকে।

কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শূদ্ররা একদিন ক্ষমতাগর্বী হলে, অনুরূপ-ভাবে সুন্দরের উদ্দেশ্যে রচিত গানের তাল কেটে যাবে। সেই ভাবী অমঙ্গলের কথা স্মরণ করে কবি বলেছেন—

তারপরে কোন এক যুগে কোন একদিন
আসবে উলটো রথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

এইভাবে 'মহাকালযান' তাঁর 'কালচক্রযান' সচল রাখেন যুগের পর যুগ। তাই কবির কথায় আশ্বস্ত হয়ে সন্ন্যাসী বলে উঠেছেন—"জয়, মহাকালনাথের জয়।"

রবীন্দ্রনাথ বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ চান। এই প্রথা মানবসমাজের প্রগতিকে বিনাশ করে। উচ্চবর্ণীয়রা তাদের অর্থ, বিদ্যা ও আভিজাত্য দ্বারা তৈরী করে নিম্নবর্ণীয় মানব। এই নিম্নবর্ণীয়রাই হল শূদ্র। শূদ্ররা পদদলিত হতে হতে একদিন দলনকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরফলে, শূদ্ররা ক্ষমতার আসনে বসে। এইভাবে ক্ষমতার স্বাদ তাকেও নিয়ে যায় উচ্চবর্ণের স্থানে, আর এতদিন যারা উচ্চবর্ণে ছিল, তারা ক্ষমতা হারিয়ে এসে দাঁড়ায় নিম্নবর্ণের স্থানে। এইভাবে বর্ণভেদ কখনও দূর হবে না পৃথিবী থেকে। রবীন্দ্রনাথ চান সম্পূর্ণভাবে বর্ণভেদ দূর হোক। কবির কণ্ঠে উল্টোরথের পালার উল্লেখে তার আভাস মিলবে।

একদা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে আমরা শূদ্রজাগরণের কথা শুনেছিলাম। তিনি নিজ কণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি একজন 'সোস্যালিস্ট'। তিনি 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে লিখেছেন—

"এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ

করিতেছে, তাহা নহে শূদ্রধর্মকর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

বিবেকানন্দ সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো ঘোষণা করেছিলেন, শূদ্রবিপ্লব ঘটবে রাশিয়া বা চীনে। বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে সিষ্টার ক্রিস্টিনকে লেখা একখানি চিঠিতে এই ঘোষণা করেছিলেন।[৩]

১৯০১ সালে স্বামীজী ঢাকায় যান। সেখানে তিনি বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অনুরূপ ঘোষণা করেছিলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে হেমচন্দ্র একখানি পত্রের মাধ্যমে স্বামীজীর উক্ত ঘোষণার কথা জানিয়েছিলেন। ডঃ দত্ত সেই চিঠির উল্লেখ করেছেন তাঁর স্বামীজী বিষয়ক গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একখানি চিঠি[৪]-রও উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি লিখেছেন—

"এসো মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর।"

'রথের রশি'র পুরোহিতকেও রবীন্দ্রনাথ 'মস্তিষ্কহীন' করেই এঁকেছেন। স্বামীজী সেখানে শূদ্র জাগরণের মাধ্যমে পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিনাশ চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শুধুমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিনাশই চাননি। চেয়েছেন সর্ব বর্ণের মানুষের সমবেত ভাবে সমাজ চালানোর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিতে। এই কারণেই কলির ভূমিকাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। কলির ভূমিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দের 'জগন্নাথের রথ' পুস্তিকার কথা মনে পড়ে। এই পুস্তিকায় ঋষি অরবিন্দ রথের মহিমা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"আদর্শ সমাজ মনুষ্য সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য, স্বাধীনতা, জ্ঞান, শান্তি—সেই রথের চারি চক্র।"

রথ কোনদিন চলবে, তার কাল নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন—

"যেদিন জ্ঞান, কর্ম ও ভাবের সামঞ্জস্য ও একীকরণে আত্মগত ঐক্যে দেখা দিবে, সমষ্টিতে বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে।"

রথচলার প্রতীকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের চলমানতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চলমানতার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তিসমষ্টির উপরে ন্যস্ত নয়, সমগ্র সমাজের উপরেই দায়িত্ব অর্পিত। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির একক প্রয়াসে সমাজের রথ কিছুদূর পর্যন্ত সচল থাকে, তারপরে তা অচল হয়। এই সচলতাকে অব্যাহত রাখাবার উপায় ব্যক্ত হয়েছে রথের রশিতে।

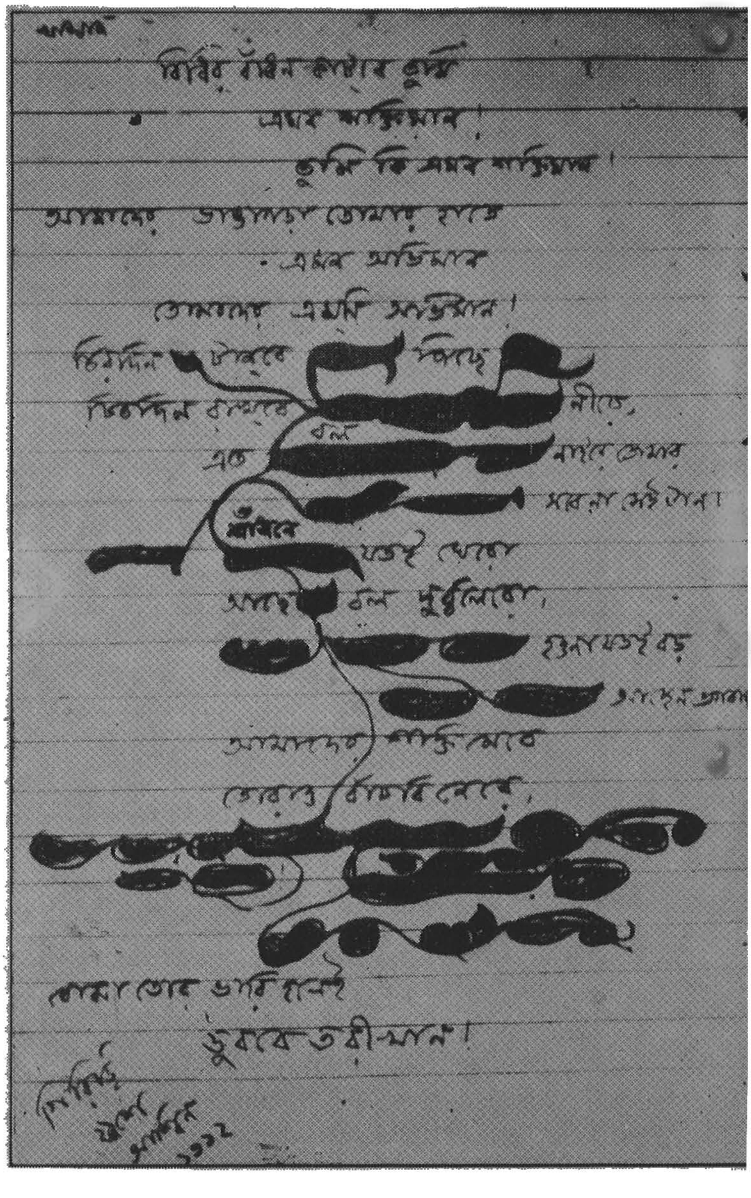
সমাজপ্রগতির ধারায় আমরা এক উল্লেখযোগ্য সংঘাত প্রত্যক্ষ করি। মার্কসীয় দর্শনে ডায়ালেকটিকস্ বা দ্বন্দ্বনীতি হল একমাত্র ভিত্তি। দুই বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ থেকে ঐক্যের ভূমি আবিষ্কৃত হয়। আর এইভাবে বিরোধের মধ্যে থেকে জন্ম নেয় সমন্বয়। দার্শনিক হেগেল এইভাবেই দেখিয়েছিলেন দ্বন্দ্ববাদকে। এই দ্বন্দ্বনীতিকে কার্লমার্কস বলেছেন দ্বান্দ্বিক ভাববাদ (dialectical idealism) এই দ্বান্দ্বিক ভাববাদকে মার্কস রূপান্তরিত করেছেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে(dialectical materialism)। বস্তুজগতে নিত্যই চলেছে স্থিত(thesis)ও প্রতিস্থিতের (anti-thesis) মধ্যে সংঘর্ষ; এই সংঘর্ষ জন্ম দিচ্ছে সংশ্লেষের (synthesis)। বস্তুজগতের এই সংঘর্ষের ফলে মনোজগতে ঘটছে বিপ্লব। তার জন্য পুরাতন ধ্যান-ধারণা, বিচার প্রণালী, ন্যায়নীতিবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। নতুন চেতনার উদ্বোধনের ফলে বস্তুময়ী পৃথিবী চরম সার্থকরূপ লাভ করবে। মার্কস যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে তার আগমন বার্তা ঘোষিত হয়। সেই আদর্শ সমাজতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষই পাবে মর্যাদা। মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটবে একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মার্কসীয় চিন্তার ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। দ্বন্দ্ববাদ রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। এই দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ তিনি করেছেন তাঁর মতো করে। উচ্চবর্ণ যদি হত স্থিত (thesis) তবে শূদ্ররা প্রতিস্থিত (anti-thesis) শূদ্র আধিপত্য বিস্তারকে সংশ্লেষ (synthesis) ধরা হলে, এই সংশ্লেষ খুব শীঘ্রই স্থিতে পরিণত হবে। তখন অন্য বর্ণীয়রা প্রতিস্থিতরূপ ধারণ করবে। তখন দেখা দেবে পুনরায় সংঘাত। কবির উক্তিতে সেই সংঘাতের উল্লেখ লক্ষিত হবে—

> তারপরে কোন একযুগে কোন এক দিনে
> আসবে উল্টোরথের পালা।
> তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

রবীন্দ্রনাথ 'বোঝাপড়ার' উল্লেখ করেই তাঁর সমাজসচলতার কথা ব্যক্ত করেছেন। মার্কসীয় দর্শনের রবীন্দ্রভাবনার এইটুকুই যা পার্থক্য। সার্থক সমাজ পরিবর্তনের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতা, গল্প, নাটক প্রভৃতিতে। রথের রশি সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল নাম।

।। চলার আনন্দ বেগে ।।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ নাট্য রচনায় অভিনব পন্থা আবিষ্কারে ছিলেন সদাতৎপর। প্রচলিত নাট্যপ্রকরণ সম্পর্কে তিনি তাঁর



আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। প্রচলিত নাট্য প্রকরণের বড় দিক হল দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট কেমন করে বাদ দেওয়া যায়, সেদিকেই তিনি সচেতন তা অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশ দেখি তাঁরই লেখা 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯০২ সাল। সেখানে তিনি প্রথম ঘোষণা করলেন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ'। এরপর ১৯০৮ সাল থেকে তিনি রচনা করতে থাকেন নতুন রীতির নাটক । নাটকটিতে কোন দৃশ্যবিভাজন নেই। শুধু তাই নয়, সমাজের চলমানতাকে দেখানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে রথের মেলার পরিবেশ, সেখানে বহু নারী-পুরুষের একত্র মিলন, আগমন ও প্রস্থান দেখা সম্ভব।

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন রীতির নাটক লিখতে শুরু করেন, তাতে জনগণের অন্তহীন চলার বেগকে প্রাধান্য দেবার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন পথ, গৃহপ্রাঙ্গণ, গ্রামীণ মেলা ও উৎসবের পরিবেশকে। শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী নাটকগুলির দিকে তাকালে আমরা তার প্রমাণ পাব। 'রথের রশি' উল্লিখিত তালিকার এক বিশিষ্ট নাটক।

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত প্রোসেনিয়াম মঞ্চের ফ্রেমে আঁটা পরিবেশকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। ফ্রেমে আঁটা মঞ্চের ঘেরাটোপে জীবনের চলমানতা ফোটানোয় বাধা আসে। অতএব মঞ্চমুক্তির ভাবনা তাঁকে গ্রাস করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে, সালের হিসাবে ১৮৯৬ সাল থেকে। এই সময় তাঁর প্রচলিত ধারার শেষ নাটক 'মালিনী'। এরপর দীর্ঘ বারো বছর রবীন্দ্রনাথ কোন নাটক রচনা করেন নি। কারণ, নাট্যকর্মের অভিনব প্রকাশ ঘটে নাট্যভাবনার স্ফুরণের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাটকে প্রাধান্য পেয়েছিল ব্যক্তির সংকট। কিন্তু বিংশ শতাব্দী থেকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সংকট অপেক্ষা সম্মিলিত মানবসমাজের সংকটে শিহরিত হচ্ছিলেন। মানবসমাজ কেমন করে সেই সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে তার নাট্যরূপ দানের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল। সেই ঘনীভূত আকাঙ্ক্ষার নাট্যরূপ যেমন শারদোৎসব, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তেমন 'রথের রশি'ও, এখানেও মানবমুক্তি ও মঞ্চমুক্তি একবিন্দুতে মিশে গেছে। তাই দেখতে পাব এই নাটকে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ নেই, মঞ্চনির্দেশ নেই। আছে কেবল রথের মেলায় অগণিত নারী-পুরুষের আগমন ও প্রস্থান আর সেই সঙ্গে অচল রথের চাকা শূদ্রদলের হস্তস্পর্শে সচল হবার ঘটনার বিবরণ । এই সহজ চালের গতিচ্ছন্দ স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যবহৃত গদ্যছন্দের কথা 'রথের রশি'র সমকালীন কাব্য 'পুনশ্চ' র (১৯৩২) কবিতাগুলিও গদ্যছন্দে রচিত, যে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন নিতান্তই সহজ ও সাধারণ বিষয়। যার তালিকায় আছে ছেলেটা, গুবরে পোকা, নেড়ীকুকুর, সাধারণ মেয়ে, সাঁওতাল রমণী, কোপাই নদী প্রভৃতি। গদ্যে লেখা 'রথযাত্রা' নাটক যখন ১৯৩২ সালে 'রথের রশি' নামে পুনর্লিখিত হল, তখন রবীন্দ্রনাথ গদ্যের পরিবর্তে গদ্যছন্দ ব্যবহার করলেন তাঁর সংলাপে। ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গদ্যছন্দের তালে ঘনীভূত হয়েছে বিপুল জনসমাজের সংকট ও সেই সংকট থেকে ত্রাণের উপায়। সমাজবদলের ডাক সার্থক হয় 'ছন্দের জোরে'। কবির সংলাপে উল্লিখিত ছন্দ, বলা বাহুল্য গদ্যছন্দ। তাই গদ্য অপেক্ষা গদ্যছন্দের দিকে রবীন্দ্রনাথের নজর তীক্ষ্ণ হয়। নাটকটির নামবদলের মাহাত্ম্য এখানেও উপলব্ধি করা যায়।

গ্রীক নাট্যশাস্ত্রে ত্রয়ী ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। এই ত্রয়ী ঐক্য হল—ঘটনাগত ঐক্য, কালগত ঐক্য ও স্থানগত ঐক্য। এই তিন ঐক্যের সমাহার আমরা দেখতে পাব 'রথের রশি'তেই। নাটকটির শুরু সকালবেলায় এবং সমাপ্তি ঘটেছে দিনাবসানে,—যা যুগাবসানের দ্যোতকা। শুরুতে প্রথমা নারীর সংলাপে ধরা পড়েছে ভোরবেলার উল্লেখ—

> এবার কি হল ভাই!
> উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকেনি।

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশের পরে দ্বিতীয় সৈনিক ধনিকদের হাতে হীরে বসানো আংটির ঝলমলানি দেখে বলেছিল—

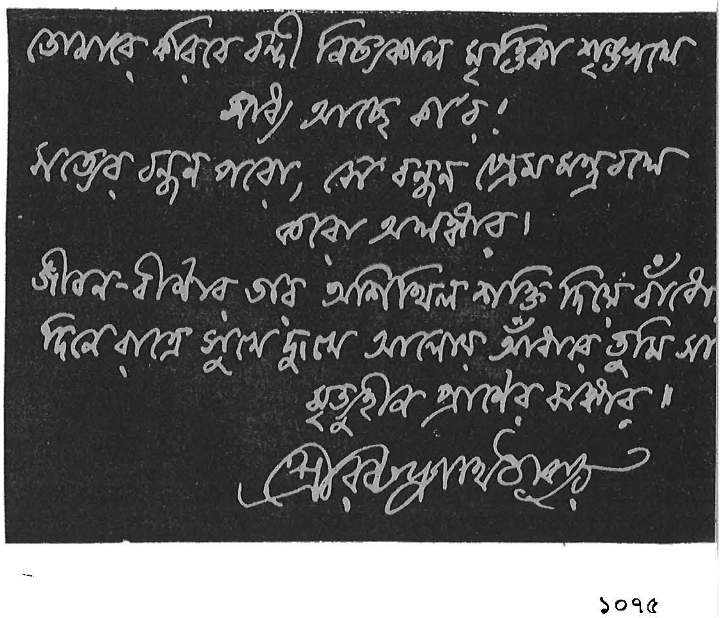
> আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
> লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

এই 'আলোর উচ্চিংড়ে'র উল্লেখে বোঝা গেল আকাশে তখন দ্বিপ্রহরের সূচনা। মেয়েদের দ্বিতীয়বার প্রবেশের পর দ্বিতীয়ার সংলাপে একবার 'ঠিক দুক্ষুরবেলা' আর একবার 'বেলা হয়ে গেল' উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল বিকেল প্রায় এসে গেল, তবুও উদ্বেগ দূর হল না মেলায় আগত নরনারীর।

নাটকটির দিগন্ত ঘোষিত হয়েছে সৈনিকের সংলাপধৃত 'কী ধুলোই উড়ল—পৃথিবী নিঃশ্বাস ছাড়ছে'—উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে। এমনকি কবির ছন্দমহিমায়, বর্ণনায় ক্লান্ত হয়ে সৈনিকের কণ্ঠে উদ্বিগ্ন সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে—

> তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চল্‌লে।
> ওদিকে যে লাগল আগুন।

সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে দেখা দেয় আগুনরঙা মেঘ। এই আগুনের মাধ্যমে যে সন্ধ্যার আসন্নতা ব্যক্ত হয়েছে তেমনি, শূদ্র জাগরণ যে সম্পূর্ণ হল তারও আভাস পাওয়া গেল। পূর্বেই বলা গেছে দিনাবসান এই নাটকে যুগাবসানের ইঙ্গিত এনেছে। এর ফলে নাট্যঘটনা সমাপ্ত হয়েছে একটি দিনের শুরু থেকে সন্ধ্যার সীমিত পরিসরের মধ্যে। এই ঘটনা ও কাল একটি বিশিষ্ট রথের মেলার প্রাঙ্গণকে ঘিরেই ঘনীভূত হয়েছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ত্রয়ী ঐক্যের দুর্লভ সমনিপাত ঘটিয়েছেন। এই সমনিপাত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-তেও। এইরকম একটি অসামান্য নাট্যরচনা তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াতে কেন যে শরৎচন্দ্র অভিমান প্রকাশ করেছিলেন তার কারণ বোঝা গেল না। শরৎচন্দ্র যত গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, ততখানি সুগভীর স্নেহ তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বর্ষণ করেন নি, এই ছিল শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ। এই ক্ষোভ আরও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়, যখন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন 'কালের যাত্রা'।[৫] শরৎচন্দ্র কালের যাত্রার ক্ষুদ্রাকৃতিতে খুশি হননি। কিন্তু



এই ক্ষুদ্রাকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে যে বৃহৎ ভাবনার কুণ্ডলী তা তিনি বিস্মৃত হলেন কেমন করে, তাই বিস্ময় জাগায়! তবে, শরৎচন্দ্রের অভিমান ক্ষুব্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ যে কালের যাত্রা নামের এক কম পরিচিত নাটক তাতে অবশ্য কোন ভুল নেই। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর প্রযোজনায় তাঁর অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনি সেই সব প্রযোজনায় অংশও নিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বহুখ্যাতি নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেন নি।[৬] শরৎচন্দ্রের মতে অখ্যাত নাটক 'কালের যাত্রা' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৩২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল আবৃত্তিকারের।

সাধারণ রঙ্গালয়ে কালের যাত্রার অভিনয় সংবাদ মেলে না। বিভিন্ন 'গ্রুপ থিয়েটার' কর্তৃক কালের যাত্রা অভিনয় হয়। অবশ্য 'রথের রশি'র অভিনয় (কালের যাত্রার অন্তর্ভুক্ত) প্রযোজনায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (রাজাবাজার শাখা, কলকাতা শাখা ও বারুইপুর শাখা) রবিচক্র, চারণ সাহিত্য ও নটরাজ। 'রথের রশি'র প্রথম প্রযোজনা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজাবাজার শাখার। এই প্রযোজনা ১৯৫৯ সালে সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কলকাতা ও বারুইপুর শাখার প্রযোজনায় 'রথের রশি' মঞ্চস্থ হয়। রবিচক্রের প্রযোজনায় 'রথের রশি' মঞ্চস্থ হয় ১৯৬১ সালের মার্চে জোড়াসাঁকোয়। যুগ্ম পরিচালনায় ছিলেন দুর্গাপদ তরফদার ও শ্যামল মুখোপাধ্যায়। করুণা রায়ের পরিচালনায় মধ্যমগ্রামের চারণ সাহিত্যচক্রের প্রযোজনায় 'রথের রশি' মঞ্চস্থ হয় ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪। নটরাজ নাট্যগোষ্ঠী বিশ্বজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'রথের রশি' মঞ্চস্থ করে। ১৪ই আগষ্ট, ১৯৭২ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। 'কালের যাত্রা' প্রযোজনা করেন লিটল থিয়েটার গ্রুপ, ভারতীয় শিল্পীসংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অভিযাত্রী সংঘ ও রূপকার। লিটল থিয়েটার গ্রুপ উৎপল দত্তের পরিচালনায় ক্লেমব্রাউন ইনষ্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় করেন ১৯৫৫ সালে ভারতীয় শিল্পী সংঘের দ্বারা 'কালের যাত্রা' মঞ্চস্থ হয় ৮ই মে, ১৯৫৬। অভিযাত্রী সংঘ ১৯৬১ সালে মঞ্চস্থ করে নাটকটি। রূপকার নাট্যগোষ্ঠী সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় কালের যাত্রা মঞ্চস্থ করেন মুক্ত অঙ্গনে। অভিনয় তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২। 'কালের যাত্রা' অখ্যাত নাটক নয়, অভিনয় তালিকাই তার প্রমাণ।

নির্দেশিকা

(১) প্রমথনাথ তাঁর 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে 'রথযাত্রা'র কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন —

একদিন আমরা বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলাম সুপুর গ্রামটিতে। সেদিন ছিল রথযাত্রার টান। গিয়ে দেখি উঁচু একটা খড়ের ঘরের মধ্যে ভারী একটা রথ দণ্ডায়মান। আর সবাই মিলে তাকে দড়ি ধরে টানছে। রথ নড়ে না। শেষে আমরাও হাত লাগালাম, তবুও রথ অনড়। গাঁয়ের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। একি রথ চলে না কেন? এতে তো গাঁয়ের অমঙ্গল সূচিত হচ্ছে। এমন সময় সকলে দেখল ধানের কলের কাজ শেষ করে সাঁওতাল নরনারী আসছে। তখন আমার মনে হঠাৎ চমক লেগে গেল, যে, এদের দিয়ে রথের দড়ি টানলে কেমন হয়?

আমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করলাম। সন্দেহ হল গাঁয়ের লোকের পছন্দ হবে কি না! তারা তো পরিত্রাণের পথ পেয়ে তখনি রাজী হয়ে গেল। সাঁওতালদের কাছে প্রস্তাবটা করা মাত্র তারা তখনি রাজী হল, আর হাসতে হাসতে রথের দড়ি ধরে টান শুরু করল। রথ ঘড়ঘড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরে ছুটল।—কয়েকদিন পর একটা নাটক লিখলাম। যার নাম দিয়েছিলাম রথযাত্রা। সেটি বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের সভায় পড়লাম।

(২) রাশিয়ার চিঠি।

(৩) চিঠিখানির হদিস দিয়েছেন মনীষী রোঁমারোঁলা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে।

(৪) ইংরেজীতে এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১০ই জুলাই, ১৮৯৩ ইয়োকোহামার ওরিয়েন্টাল হোটেল থেকে আলাসিঙ্গা বালাজী প্রভৃতি স্বামীজীর মাদ্রাজী বন্ধুদের।

(৫) গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন —

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করে 'আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি' বললেও শরৎচন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ দানকে তাঁর প্রতি কবির যোগ্যদান বলে মোটেই গ্রহণ করতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎদাকে উৎসর্গ করলে শরৎদা খুশি না হয়ে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, কবি এই নাটকটি আমাকে উৎসর্গ করলেন, যার নাম অনেকেই জানে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর যে-কোন একটি ভাল বই আমার নামে উৎসর্গ করতে পারতেন।" (পৃঃ ৮৭-৮৮)

(৬) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে কলকাতায় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৪ সালের ৬ই এপ্রিল। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সম্ভবতঃ আগামী সোম কিংবা মঙ্গলবারে কলকাতা অভিমুখে যাব। সেখানে আমার আত্মীয়বর্গ রক্তকরবী অভিনয়ে প্রবৃত্ত, তাদেরই আহ্বানে আমাকে যেতে হচ্ছে। কর্তব্য সমাধা হলেই ফিরে আসতে হবে।" চিঠির তারিখ ২৯।৩।১৯৩৪।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪ তারিখে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তার আগের দিন তিনি রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রান্ত মনে ক্লান্ত দেহে জোড়াসাঁকোতে ফিরেছেন। এই অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন The Tagore Dramatic Group। এই গ্রুপের প্রযোজনায় রক্তকরবী মঞ্চস্থ হয় নাট্য নিকেতনে।

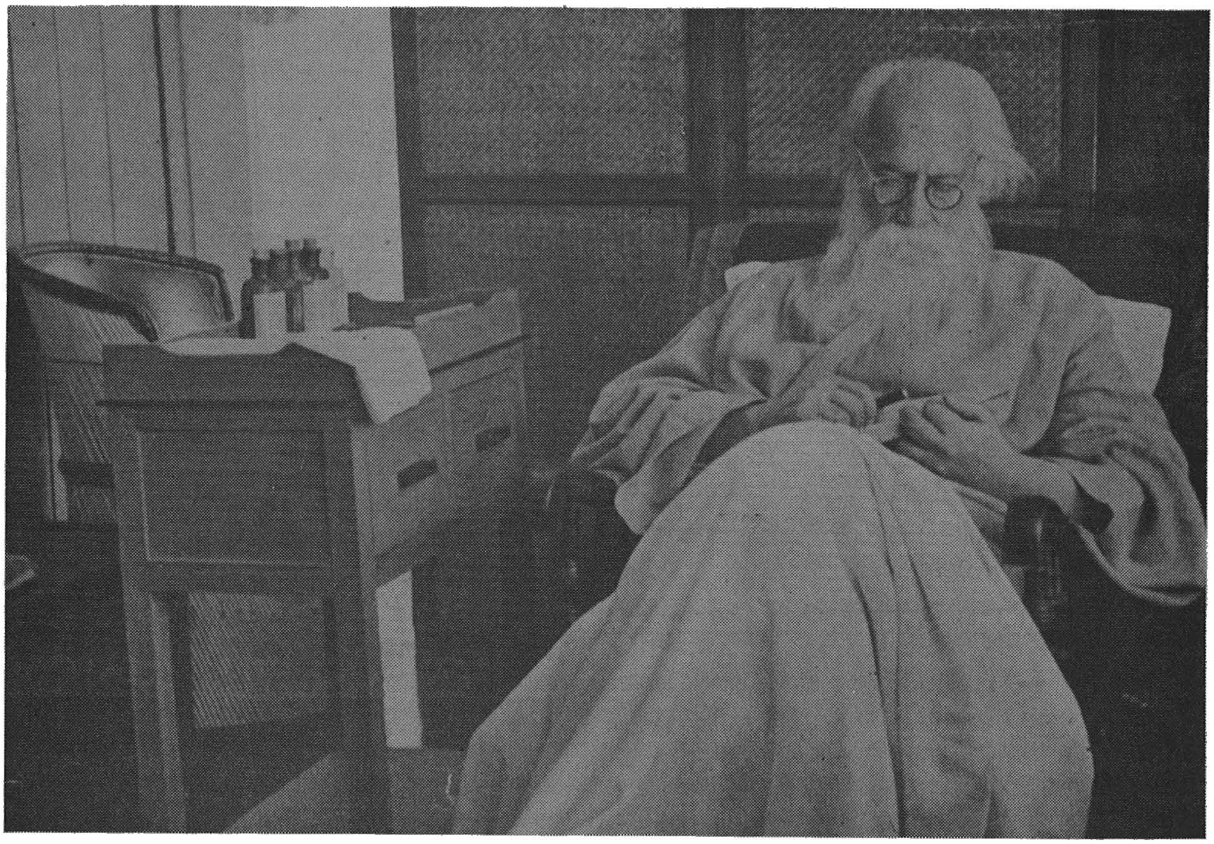




রবীন্দ্রনাথ ঃ
পূর্ব ইউরোপে—পশ্চিম ইউরোপে

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

"রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম এত বর্ণাঢ্য, এত সূক্ষ্ম আবেগমণ্ডিত এবং প্রকৃত মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ যে তা এখন মানবসংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।"
—আনাতোলি লুনাচারস্কি



॥ এক ॥

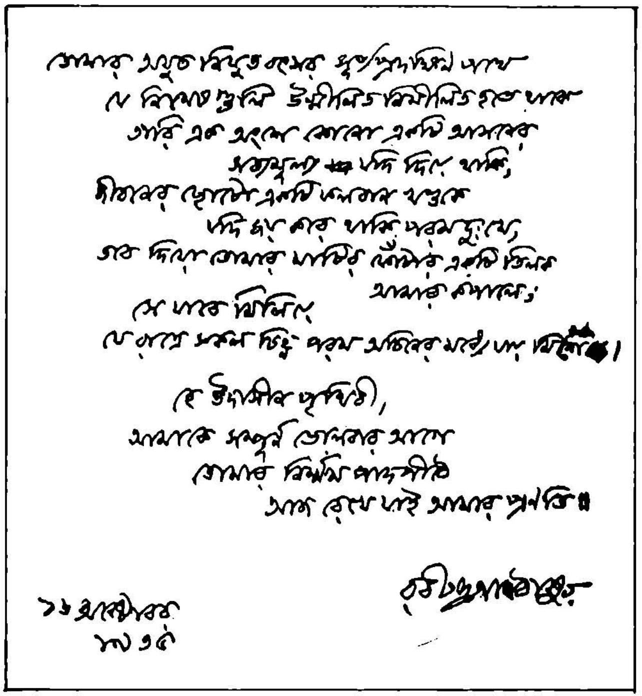
সোভিয়েতে রবীন্দ্রচর্চাকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। প্রথম স্তরে রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুবাদ এবং দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ক নানা গ্রন্থ ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা। আবার দ্বিতীয় স্তরের রচনাকে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পরে, তাঁর 'গীতাঞ্জলি' রুশভাষায় অনুবাদিত হয় এবং রুশী জনগণ প্রাচ্যের মহান মানবদরদী কবিকে আবিষ্কার করে। এর পর থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্রুত অনুবাদ হতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্যের যে লেখকের রচনার অনুবাদ ১৬৩ বার ২৩টি জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তিনি রবীন্দ্রনাথঠাকুর। তাঁর রচনার মুদ্রণসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনিই সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় কবি।

১৯১৪-এ, 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেন ল. খাভাকিনা। পরে আর একজন অনুবাদক-কবি ভ. লেবেদেভ 'গীতাঞ্জলির' অনুবাদ করেন। ১৯১৪-১৭-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'দ্য গার্ডনার', দ্য ক্রিসেন্ট মুন', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'চিত্রা', এবং 'সাধনা' রুশ ভাষায় অনুবাদিত হয়। ১৯১৮-তে ই. বুনিন সম্পাদিত এবং ন. পুশেশনিকভ অনূদিত

'গীতাঞ্জলির' চতুর্থ সংস্করণ মস্কোয় প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প সংকলনের অনুবাদ প্রকাশ করেন ম. তুবিয়ানস্কি। বাংলা থেকে রবীন্দ্র রচনা প্রথম রুশ ভাষায় তিনিই অনুবাদ করেন। এই কারণে তাঁকে 'সোভিয়েতে রবীন্দ্র-গবেষণার স্থাপয়িতা' বলা হয়েছে। এর আগে ১৯২৫-এ তুবিয়ানস্কি 'গীতাঞ্জলির' ১৩টি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৪-এ মস্কোয় রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতির' অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে স্টেট খুদোঝেস্তভেনায়া লিতায়েতুয়া পাবলিশার্স আট খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলী বাংলা থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করে। এতে আছে 'রাশিয়ার চিঠি', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি। এর আগে ১৯৫০ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাস, কয়েকটি ছোটগল্প, কবিতা ও নাটক পৃথক পৃথকভাবে অনূদিত হয়।' ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে বারোখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।


তোমার সমুচ্চ বিপুল বক্ষের ধূলিপ্রদক্ষিণ পথে
যে বিস্ময়গুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারি এক অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে,
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক
আমার কপালে;
সে যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিলিয়ে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ অক্টোবর
১৯৩৫

শুধু যে মূল রুশ ভূখণ্ডেই রবীন্দ্ররচনাবলী অনূদিত হয়েছে তাই নয়, লাতাভিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যত্র ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-রচনাবলী অনূদিত হয়েছে এবং এখন সোভিয়েত ভূমির অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রচর্চার প্রাথমিক স্তররূপে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অনুবাদ আছে। প্রসঙ্গত, লাতাভিয়ার প্রথম ভারতবিদ্ কারলিস্ ইয়েগ্লের নাম স্মরণ্য যিনি ১৯১৭-তে একটি সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'দ্য গার্ডনার' থেকে নির্বাচিত কতকগুলি কবিতার অনুবাদ লাতাভিয় ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯২০-তে 'দ্য গার্ডনার'-এর আরও কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—তারও অনুবাদক ছিলেন কারলিস্ ইয়েগ্ল। ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্প, 'ডাকঘর' নাটক আর 'দ্য গার্ডনার' সম্পূর্ণভাবে লাতাভিয় ভাষায় অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

কারলিস্ ইয়েগ্ল এবং তার বন্ধু রিখাদ রুয়াজিতিসের অক্লান্ত পরিশ্রমে লাতাভিয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বিদেশীয় লেখকদের মধ্যে বহুপঠিত লেখকরূপে পরিগণিত হন। একমাত্র ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথের 'দি গার্ডনার'-এর ৩০ হাজার কপি, 'নৌকাডুবি'র ২০ হাজার ও 'গল্পগুচ্ছে'র ৩০ হাজার কপি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ভিক্টর ইওবুলিস 'আশা' ও 'ঝুলন' কবিতাদুটি মূল বাংলা থেকে লাতাভিয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনাবলীর ২৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

।। দুই ।।

রবীন্দ্ররচনাবলীর মূল বাংলা থেকে অনুবাদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণা-প্রবন্ধের আলোচনায় রত হলে সুনির্দিষ্ট সূত্র আমাদের মেনে চলতে হবে—রবীন্দ্রকেন্দ্রিক আলোচনা গ্রন্থ ও গবেষণা-নিবন্ধকে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে। সোভিয়েতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনার যাঁরা সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ভি. লেবেদেভ, কবি ও সাংবাদিক ই. শ্‌খলোভস্কি, সমালোচক ভি. ক্রানিকফেল্ড প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লিখিত কবি-সমালোচকদের মন্তব্য পরবর্তী অংশে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করা যাবে।

১৯১৫-তে অর্থাৎ প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় রবীন্দরনাথ সম্পর্কিত গবেষণার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব জ. ভেনগেয়েভা—তিনিই প্রথম 'সোভয়েমোনিক' পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ধারার অনুসরণে সচেষ্ট হন ও সফলতা অর্জন করেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পর আ. ভরোনস্কি, আনাতোলি লুনাচারস্কি, ক. ত্রোয়োনোভস্কি আ. কাইগোরোদভ, ভ. তানরোগোয়াজ প্রমুখ রবীন্দ্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে লুনাচারস্কির 'ভারতীয় তলস্তয়' ভ. ত্রোয়োনোভস্কির 'ভারতীয় তলস্তয়' এবং কাইগোরদভের 'আর টেগোর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২-এ ম. তুবিয়ানস্কি 'জীবনস্মৃতির' ভূমিকায় চিন্তাসমৃদ্ধ রবীন্দ্রচর্চার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব ও ইংরাজী রোমান্টিক গীতিকবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ১৯২০ সালের কিছু পরে তাঁর 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়।

১৯৩০-এর দশকে খ্যাতকীর্তি সোভিয়েত পণ্ডিতবৃন্দ রবীন্দ্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আকাদেমিসিয়ান ওলদেন্‌বার্গ যারান্নিকভ, রীতার প্রমুখ মনস্বী সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। সোভিয়েত ভারতবিদ্ ন. স. গোলদ্‌বার্গের রচিত 'মহান ভারতীয় লেখক' প্রবন্ধটি আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে প্রাচ্য গবেষণা ইনস্টিট্যুট থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত ও ভারতীয় লেখকদের রচনার সংকলন সোভিয়েতে রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত করলো। আলোচ্য সংকলনে যে সকল সোভিয়েত লেখক অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় যথাক্রমে গ্নাত্যুক দানিলচুক (রবীন্দ্র-সাহিত্য)/তোভ্‌স্তিখ এবং চিচেয়োভ (রবীন্দ্র রচনায় ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতিফলন) বীকোভা (রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা)/ নোভিকোভা এবং গামায়ুনভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনা)/ পেত্রভ (রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি)/ লিতমান (রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্য)। এছাড়া দানিলচুকের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আরো কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়—ওয়াই চেলিশেভের লেখা 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রচর্চা', 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার', লিতমানের 'রবীন্দ্রনাথের উপর সোভিয়েত সফরের প্রভাব', গ্নাত্যুক দানিলচুকের 'রুশ বিপ্লবের বাণী' সারাবিশ্বেরই বাণী'; ইভবুলিসের 'রাশিয়ার চিঠি প্রসঙ্গে,' 'মার মাকসেস্তিয়ান রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর্মেনীয় সাহিত্য,' রাপিনেস্কায়ার 'সোভিয়েত মঞ্চ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'; ফিওদার পেত্রভের 'রবীন্দ্রসান্নিধ্যে' ও 'রবীন্দ্রসকাশে'।

সম্প্রতি সোভিয়েতের রবীন্দ্র-গবেষকবৃন্দ কবির জীবন ও কর্ম বিষয়ে দু'খণ্ডের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ সংকলন প্রায় সমাপ্ত করেছেন।— এই সংকলনের অধ্যায়গুলি যথাক্রমে—'রবীন্দ্রজীবনী এবং সর্জনশীল জীবন'—গ্রাত্যুক দানিলচুক/ 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম'—ইভবুলিস এবং ব্রোসালিনা/ 'শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান'— মরোজোভা এবং তিউলিয়ায়েভ/ 'নাট্যকর্ম'—ফোতোভস্কায়া/ 'শিক্ষা সংক্রান্ত মতবাদ'—সূচকভ/ 'নান্দনিক, দৃষ্টিভঙ্গী'— ওয়াই চেলিশেভ/ 'রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতামত'—লিতমান/ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা'—কামায়ভ।

।। তিন ।।

সোভিয়েতের রবীন্দ্রচর্চা থেকে পশ্চিমী জগতের রবীন্দ্রচর্চা ও মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি ফেরালে উভয় দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ধারণার সুবিপুল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ওদেৎ অসলেস্ত নামে একজন ফরাসী বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠককে বাস্তব জীবনবোধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মেক্সিকোর ফরদেরো আমাদোরের মতে, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাকলাকে গীতাঞ্জলির আলোকে অনুশীলন করা উচিত। কেন না, এর ফলে লেখকের অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাধারা সহজে উপলব্ধি করা যায়। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে সুবিখ্যাত মার্কিনী পণ্ডিত এডওয়ার্ড ডিমক তাঁর রবীন্দ্র-মূল্যায়নে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও কাব্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংযোগগত তাৎপর্যকে বাড়িয়ে দেখান এবং ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেন না। আর্থার শুরিগ তাঁর একটি গ্রন্থে (১৯২১) রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক চিন্তাকে বিপজ্জনক আখ্যায় অভিহিত করে পাঠককে রবীন্দ্র-চিন্তা সম্পর্কে সাবধান হতে বলেছেন। আঁরি মাসিস ১৯২৫-এ প্রকাশিত 'প্রাচ্যের প্রতিরক্ষায়' গ্রন্থে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ লেখক আলেকজান্ডার অ্যারনসন 'পশ্চিমীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়ে সফরের উল্লেখ করেন নি এবং এর জন্য কবি অমিয় চক্রবর্তী কর্তৃক তিনি সমালোচিত হয়েছেন। অপর একজন আমেরিকান পণ্ডিত স্টিফেন হে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক মূল্যবোধের প্রতি মনোভাবকে কমিউনিজমের প্রতি অমিত্রজনোচিত বলে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিশীল শিবিরের বিরোধীপক্ষে রাখতে চেয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার মনোভাব, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থ নয় এবং এই জাতীয় মূল্যায়ন ভ্রান্ত মননের ও ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। এর বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মনোভাবের প্রবণতা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে তাঁদের ভূমিকাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা যায়।

।। চার ।।

'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্‌, কবি সমালোচক ও অনুবাদকবৃন্দ যে মতামত প্রদান ও মূল্যায়ন করেছেন তার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো—

(ক) 'আধ্যাত্মিক জীবনানন্দের মহান স্তবগান'।— ভি. লেবেদেভ। [গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রসঙ্গে]।

(খ) 'মহাবিশ্বের ধ্যানে অনুপ্রাণিত জীবন, প্রেম এবং আনন্দের সঙ্গীতকার'।— ই.শখলোভস্কি।



(গ) 'রবীন্দ্রনাথ প্রতীকীবাদের ধ্যানধারণা, এর অলীক, প্রতারণা ধ্বংস করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'—সমালোলক ভ. ক্রানিখফেল্ড।

(ঘ) 'তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সন্তান, উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সংস্কৃতির যেমন বায়রণ, রাশিয়ান সংস্কৃতির যেমন পুশ্‌কিন।' ভ.তায়দভ।

(ঙ) 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অনবদ্য, প্রাণবান এবং জীবনসত্যের চিত্ররাজি। বাস্তবতায়, ব্যাপকতায় এবং মানবাত্মার রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্পগুলি মহামতি তলস্তয়ের গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।'—আ.ফ. শ্লুৎস্কি। [রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম অনুবাদক]।

(চ) 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের শেখায় দুঃখ যন্ত্রণার মুহূর্তে জীবনকে ভালবাসতে'।—আ. ভরোনস্কি।

(ছ) 'মানবজাতির সত্তায় তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, এরই মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিকতার উপাদান।'—ব্রোয়োনোভস্কি।

(জ) 'চিন্তার স্বাধীনতা এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি হিন্দুর হৃদয়ে জীবন্ত এবং ভারতের জাতীয় কবি এই মনোভাবের অংশীদার না হয়ে পারেন না।'—কাইগোরোদভ।

(ঝ) 'রবীন্দ্রনাথ ভারতের সংস্কৃতি বিকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক'।— ন.স. গোলদ্‌বার্গ।

(ঞ) 'মানবিকতায় আপ্লুত রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ভারতপ্রেম ভারত প্রেম উদ্বোধিত করে, যে প্রেম জাত-পাত বা ধর্মীয় সংকীর্ণতা, উৎকট স্বদেশপ্রেমের প্রতিবন্ধকতায় অনুরঞ্জিত ছিল না'।— রেইস্‌নার ও গোল্‌দবার্গ।

(ট) 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জনগণের মনের চালক'।—কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি।

(ঠ) 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন সর্বজনস্বীকৃত পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরও অন্যতম যাঁরা স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।'—ওয়াই চেলিশেভ

(ড) 'সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সমাজকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং বুর্জোয়া, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের নিন্দা করেছিলেন।...বুর্জোয়া সভ্যতাসম্পর্কে তাঁর হতাশা তিনি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছিলেন।'— গ্নাত্যুক দানিলচুক।

(ঢ) 'আমরা লিথুয়ানীয়ারাও এগুলি হাতে পাবার সুযোগ পেয়েছি এবং রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিতা পড়েছি মুগ্ধ বিস্ময়ে। রবীন্দ্রনাথই বলতে গেলে আমাদের ভারতীয় কবিতার নতুন আর মহান জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।"— এদুয়াদার্স মিয়েঝেলাইতিস।

বিপ্লব-পূর্ববর্তী রবীন্দ্রচর্চায় নন্দনতাত্ত্বিকতার যে প্রাধান্য ছিল, বিপ্লব পরবর্তী রবীন্দ্রচর্চায় তার সঙ্গে যুক্ত হল সৃষ্টিকর্মের মানবতাবাদী মূল্যায়ন। 'ভারতের জাতীয় আত্মচেতনা জাগরণের আলোকে এবং মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে জানা শুরু হলো'। —বলেছেন অধ্যাপক চেলিশেভ। সোভিয়েতে রবীন্দ্রচচার মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক চেলিশেভের মূল্যায়নই যথার্থ—"সোভিয়েত গবেষকদের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের উদ্‌ঘাটন, তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নিরূপণ, রবীন্দ্রসাহিত্যে লৌকিক ভাবধারার অনুসন্ধান, তাঁর নান্দনিক এবং দার্শনিক মতামতের স্বরূপ বিচার, তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য ও নবপ্রবর্তনের প্রশ্নালোচনা, এই অনন্য কবি, গদ্যকার, নাট্যকার, শিল্পী এবং সঙ্গীত রচয়িতা অসাধারণ দক্ষতার রহস্য আবিষ্কার, বর্তমান ভারতে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিকাশ অনুসরণ এবং এই মহান ভারতীয় লেখকের সৃষ্টিকর্ম যে বিশ্বসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা দেখানো।"

।। পাঁচ ।।

সোভিয়েত নাট্যশালাতে রবীন্দ্রনাথের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকে উজবেক নাট্যশালায় প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র নাট্যরূপ 'জাহ্নবীকন্যা'র প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে উজবেক নাট্যশালা ভারত অভিমুখী হয়। উজবেক নাট্যশালার পরিচালক বাখাদির ইউলদালেভের বক্তব্য থেকে এ তথ্য জানা যায়। ১৯৬১-তে উজবেক নাট্যশালায় 'ডাকঘর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটির মঞ্চায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নাটকটিকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে দর্শকদের রবীন্দ্রনাথের নাটকের গভীর নৈতিক ও দার্শনিক



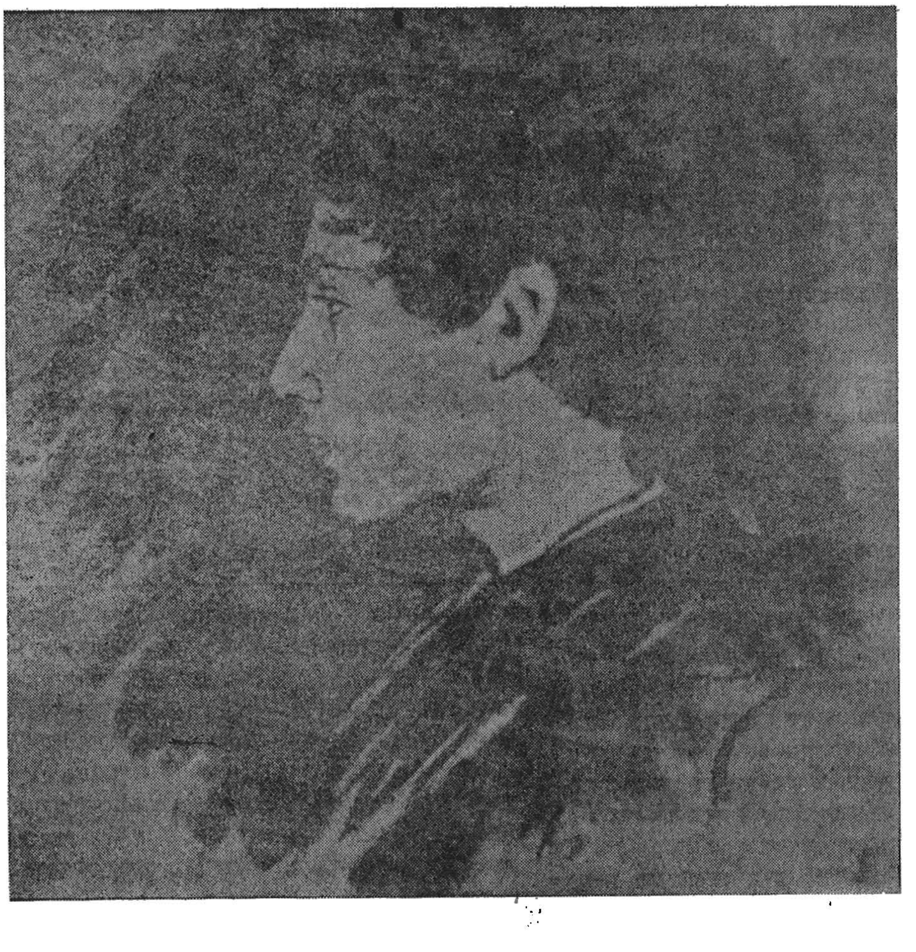
১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মস্কোয় বৈদেশিক সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর এফ পেত্রভের সঙ্গে মিলিত হন।

অর্থ উপলব্ধি করার ব্যাপারে, আর সেই সঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রকৃতিকে আরো ভালো করে বোঝবার ব্যাপারে সাহায্য হয়'। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ক্রেমলিন থিয়েটারে 'চিত্রা' অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদ মঞ্চস্থ হয়। ব্যালে নৃত্যের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদ রূপায়িত হয় এবং দর্শকগণ অর্জুনের নৃত্যের উচ্চ প্রশংসা করে। আজেরবাইজান ব্যালে দলও চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করে। ১৯৬২-তে পিপলস্ ফ্রেন্ডশিপ্ ইউনিভার্সিটি 'তাসের দেশ' ও 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত নাটক অনূদিত হয় সেগুলি হলো— (ক) বিসর্জন, সন্ন্যাসী— এম.এ.আদ্রিয়ানভ কর্তৃক অনূদিত ও ভি জি ন যোগেরাজ কর্তৃক সম্পাদিত। (খ) প্লেজ এন্ড পোয়েমস্ ইনপ্রোজ— ভে.গ্রিপ্লিয়ান, ভি আর নোসোভিচ, ইয়াতিলিন কর্তৃক অনূদিত এবং কে ঢুকোভস্কি ও এম. ভোলাস্কি কর্তৃক সম্পাদিত। রাজা, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকও অনূদিত হয়েছে।

।। ছয় ।।

১৯১৪ সালে 'গীতাঞ্জলি'র রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হলে রুশীরা রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির মাধ্যমে আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের অনুবাদ শুরু হয়। বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ায় রবীন্দ্র-রচনার রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক আলোচনার সূত্রপাত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব-পূর্ববর্তী আলোচনা বিপ্লব-পরবর্তী আলোচনা থেকে ভিন্নধর্মী ছিল। প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হতেন একান্ত ব্যক্তিগত, ভিন্ন মতাদর্শ বা নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষিত হতেন মিষ্টিক, আধ্যাত্মিক, প্রতীকীবাদী ইত্যাদি অভিধায়। 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদক কবি ভি. লেবেদভ উক্ত কাব্যের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন—'আধ্যাত্মিক জীবনানন্দের সুমহান স্তবগান।' রবীন্দ্রসাহিত্যের আর এক অনুবাদক, সাংবাদিক ও কবি ই. শ্‌খলোভস্কি লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ, মহাবিশ্বের ধ্যানে অনুপ্রাণিত জীবন, প্রেম ও আনন্দের সঙ্গীতকার'। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় রবীন্দ্র-গবেষণা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয় অনুসন্ধানের সূত্র ধরে। কিন্তু অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার পরে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় নবতম মাত্রা সংযোজিত হলো। রবীন্দ্রনাথকে জানা শুরু হল ভারতীয় আত্মজাগরণের পটভূমিকায় ও মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণায়। সোভিয়েত সাহিত্য গবেষক আ. ভরোনস্কি রবীন্দ্রসাহিত্যে বুর্জোয়া অত্যাচারের সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য দুঃখযন্ত্রণার মুহূর্তে জীবনকে ভালবাসতে শেখায় এবং রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারের প্রতিবাদকারী বলেই নবপ্রবর্তকের আসনে তাঁর অধিষ্ঠান। আনাতোলি লুনাচারস্কি তাঁর 'ভারতীয় তলস্তয়' প্রবন্ধে প্রথম রবীন্দ্রনাথের মহান সাহিত্যের সার্থক ভূমিকা সম্পর্কে সেই স্মরণীয় বাক্য উচ্চারণ করলেন—'রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম এত বর্ণাঢ্য, এত সূক্ষ্ম আবেগমণ্ডিত এবং প্রকৃত মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ যে তা এখন মানব-সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।'

প্রসঙ্গত, আমাদের স্মরণ করতে হয়, লাতাভিয়ার প্রথম ভারতবিদ্ কারলিস ইয়েগ্‌লের কথা। ১৯১৭ সালে তিনি একটি সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'দি গার্ডনার' থেকে নির্বাচিত কতকগুলি কবিতার অনুবাদ করেন লাতাভিয় ভাষায়। কারলিস ইয়েগ্‌ল ও তাঁর বন্ধু রিয়ার্দরুয়াজিতিস ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা অনুবাদ করেন। অনূদিত রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রত্যেকটি খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জী ও টীকাভাষ্য ইয়েগ্‌লের রচনা। রবীন্দ্রনাথ এবং কারলিস ইয়েগ্‌লের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কারলিস ইয়েগ্‌লকে ৫ এপ্রিল ১৯৩৬-এ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'প্রতীচ্যে আপনাদের মতো এমন কিছু দীপ্তমনা ব্যক্তি আছেন যাঁরা যন্ত্রসভ্যতার লৌহমুষ্টির মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক এবং প্রাচ্যের দর্শন ও সংস্কৃতির প্রেরণাময় উৎস থেকে আলোকের সন্ধানে রত। আমার কবিতা ও অন্যান্য রচনা যে আপনাদের কিছুটা আশা ও কিছুটা শান্তি দিয়েছে, একথা জেনে আমি আনন্দিত।' কারলিস



রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

ইয়েগ্‌লকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিশনের (১৯৬১) চেয়ারম্যান বিশিষ্ট লেখক নিকোলাই তিখোনাভ যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, সেই বাণীতে রবীন্দ্র-সাধনায় কারলিস ইয়েগ্‌লের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। উক্ত অভিনন্দন বাণীতে তিনি লিখেছিলেন, 'ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক ও দার্শনিক উত্তরাধিকারকে অনুবাদ ও জনগণের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে আপনার বহুবর্ষব্যাপী ক্রিয়াকলাপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ও ভারতের জনগণের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে বিকশিত ও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দান রেখেছে।' ১৯৬৭-তে কারলিস ইয়েগ্‌লের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সংস্কৃত ভাষায় একটি কবিতা রচনা করেন। ঐ কবিতার দুটি ছত্র ছিল—

—'ঋষেঃ শ্রীমদরবীন্দ্রস্য ভারতস্য মহাকবিঃ।
কৃতির্যস্য হৃদিস্থিত যস্য প্রীতিরণর্গলা।।'

[ভারতের মহাকবি ঋষি রবীন্দ্রের সুকৃতিসমূহ তাঁর হৃদয়ে অপরিসীম প্রীতিসহ সতত বিরাজমানা]।

অধ্যাপক ফিওদোর পেত্রভ রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় এক আশ্চর্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্র-সকাশে' প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) স্বপ্ন দেখতেন, এমন একটা সময় আসবে যখন যুদ্ধ হয়েছে চিরনির্বাসিত, শান্তি বিরাজ করছে সারা পৃথিবীজুড়ে ভাস্বর মহিমায়, মানুষ তার সর্বশক্তি ও মেধা নিয়োগ করেছে জীবনের উৎকর্ষসাধনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে যা ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়।'

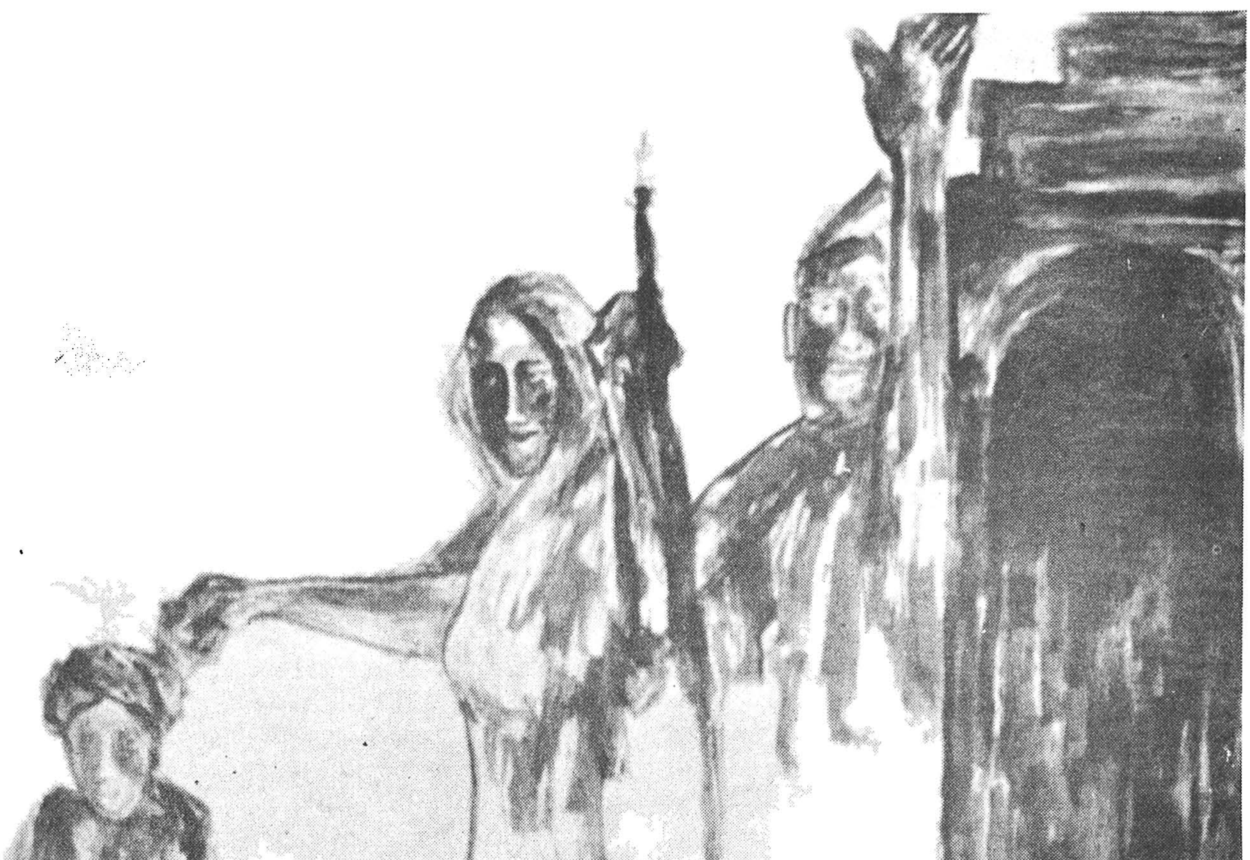
অধ্যাপক চেলিশেভ রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক প্রতিভার পরিচয় দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক চেলিশেভ আধুনিক ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অবদানের কথা আবেগসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে পাঠকের কাছে উৎসারিত করেন—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাঁর চেয়ে কেউ মহত্তর ও সর্বাঙ্গীণ অবদান রাখেন নি। ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকার, দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষক, অশিক্ষা কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার কাজে ব্রতী, চিত্রকর, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক হিসেবেও নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন সর্বজনস্বীকৃত পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরও অন্যতম যাঁরা স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।' আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রবন্ধ সূচনার প্রথম বাক্যটি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো কি অতলান্ত ব্যঞ্জনায় প্রাবন্ধিক চেলিশেভ উচ্চারণ করলেন—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'! বাক্য সমাপ্তিতে বিস্ময় চিহ্নের ব্যবহার পাঠককে সচেতন করে রবীন্দ্রনাথের বিপুল ঐশ্বর্য সম্পর্কে, আর মুগ্ধ করায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপকতায় ও সার্থক ব্যবহারে। চেলিশেভের আলোচ্য প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত সংহত; এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদী সত্তা অপেক্ষা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই সত্তা যে সত্তা বিশ্বাস করতো চেলিশেভের ভাষায়—'কৃষির আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়েই ভারতের চাষীদের উন্নতির সমাধান হবে।' রবীন্দ্রনাথ শুধু যে 'গজদন্তমিনারবাসী' শিল্পী ছিলেন না বা রোমান্টিক ভাবালুতার শিশিরসিক্ত পদে পদচারণ করেন নি তা অধ্যাপক চেলিশেভের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে ধরা পড়েছে—'অনন্যসাধারণ শিল্পীর চরিত্রোচিত বিরল স্বচ্ছ দৃষ্টি এই ভারতীয় চিন্তানায়ককে সোভিয়েত জনজীবনের বহুদিকের মর্ম অবধারণ করতে এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব যে চিন্তাধারার আগমনবার্তা বহন করে এনেছিল তার মহত্ত্ব ও ফলপ্রসূতার প্রশংসা করতে সক্ষম করে তুলেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকেও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন—যে বিপ্লব সারা পৃথিবীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল।' ১৯৪০-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি সমগ্র মানবসভ্যতার উদ্‌ভ্রান্তির কালে একটি ঐতিহাসিক দলিল। আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পর্কে অধ্যাপক চেলিশেভের মন্তব্য অনন্ত তাৎপর্যময়তায় বিধৃত—'সভ্যতার সংকটকে যেন তাঁর জটিল বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার স্বীকৃতি, একটি রাজনৈতিক জবানবন্দী বলে মনে হয়, যাতে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিন্দা করেছেন আর উদ্ধত পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অসংখ্য সৃজনশীল অনুসন্ধানের পর প্রায় সত্তর বছর বয়সে সোভিয়েত ভ্রমণ করেন। তাঁর এই ভ্রমণের ক্রমিক অভিজ্ঞতার উন্মোচনের ইতিহাস আছে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ছিলেন, অথবা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে তাঁর আস্থা অবিচল হয়েছে ১৯৩০-এ সোভিয়েত ভ্রমণের পর এমন চিন্তা আদৌ সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্ বা রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচকের মাথায় আসেনি। অধ্যাপক পেত্রভ বলেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি যা কিছু দেখেছেন তার সবকিছুই তাঁর পছন্দ হয়েছিল এমনও নয়।' এই সূত্রটিকে আরও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করলেন লিতম্যান তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপর সোভিয়েত সফরের প্রভাব' প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'বিপুল পাণ্ডিত্য ও শিল্পীজনোচিত অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও পৃথিবীর অনেক জাতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নিজদেশের জনগণের ভবিতব্যের অংশীদার হওয়ার মনোভাব, ঘৃণ্য ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের নিঃস্বার্থ সংগ্রামে অংশগ্রহণ এ সবই মূর্ত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জটিল, কিছুটা বিতর্কিত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিশ্ববীক্ষায়। সুতরাং কেউ এটা আশা করতে পারেন না যে আমাদের দেশে তাঁর সফর তাঁর মূলগত ভাববাদী-দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে নাড়া দেবে।'

'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণের ও সোভিয়েত সম্পর্কিত ধারণার প্রামাণ্য দলিল। 'রাশিয়ার চিঠি-'তে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রবন্ধকার আবার বলেছেন—'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ যা যা দেখেছেন তার প্রভাবে যে সব সমস্যা আজীবন তাঁর মনকে তোলপাড় করেছে—যেমন, মানব জাতির ও জাতিতে জাতিতে ঐক্যের সমস্যা—সেই সব সমস্যাকে তিনি নতুনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সোভিয়েত মানুষের ঐক্যের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মানব জাতির ঐক্যের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ—যার ভিত্তি সোভিয়েত বাস্তবতাজাত এক নতুন চেতনা।' সোভিয়েত ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে যে কতখানি সচেতন হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে লিতমানের উক্তিতে—'যেসব বিষয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিন্তাধারা পুনঃপর্যালোচনা করার পথে পরিচালিত করেছিল তার মধ্যে একটি হল স্বাধীনতার প্রশ্ন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়মে স্বচক্ষে এটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন যে সেখানে নারী, পুরুষ, ধর্ম প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।' 'রাশিয়ার চিঠি'-র ৮ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ যেখানে লিখেছেন—'শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে। এখানে তাই হ'ল। দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী।' রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত দেখে যে অভিভূত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে 'রাশিয়ার চিঠি'-তে; আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, সমালোচকরা যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির

পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। নবভারত গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যে অবিস্মরণীয় এ সত্য লিতম্যান বিস্মৃত হতে পারেন নি—'ভারতের জনগণ এক সার্বভৌম ও শান্তিকামী প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলেছেন এবং তাঁদের হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা হয়ে থাকবে এই মহাকবির পবিত্র ভাবমূর্তি যিনি সর্বান্তঃকরণে এই নির্মাণকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার বাসনা পোষণ করতেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'-র তৃতীয় পত্রে বলেছেন—'এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।' অন্যতম সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্ ও রবীন্দ্র-সমালোচক এই বক্তব্যেরই রূপান্তরীকরণ করে বলেছেন— 'রুশ বিপ্লবের বাণী সারা বিশ্বেরই বাণী'। এই ভারততত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রসমালোচক হলেন গ্রাত্যুক দানিলচুক—যিনি 'রাশিয়ার চিঠি' পাঠ করে রবীন্দ্র-মানসিকতার দুটি অসাধারণ সূত্র নির্দেশ করেছেন—(১) 'সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সমাজকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং বুর্জোয়া পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের নিন্দা করেছিলেন।' (২) 'বুর্জোয়া সভ্যতা' সম্পর্কে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) হতাশা তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছিলেন।' এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সেই বিখ্যাত কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন—'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে/অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে/অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী/ভয়ংকরী।' সোভিয়েত সফরের ফলে রবীন্দ্রনাথের মন যে ক্রমশ নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে ঝুঁকছিল দানিলচুক তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন ব্যক্তিত্বকে বিশ্ববাণীর সামনে তুলে ধরেছেন—'ভারতের এই মহান মানবতাবাদীর উপনিবেশবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং কার্যত বুর্জোয়াবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশেরই যুক্তিসংগত পরিণতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে যা-কিছু দেখেছেন তাতেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে সমরবাদ, ফ্যাসীবাদ ও উপনিবেশবাদের কালো শক্তিগুলির বিরোধিতা করেছেন।'

আর একটি মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখে সোভিয়েতে রবীন্দ্রচর্চার আলোচনার সমাপ্তি টানা হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সোভিয়েত সাহিত্যিক, সমালোচক, ইতিহাসবিদ, নন্দনতাত্ত্বিকেরা রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক, আধ্যাত্মিক বা পলায়নপন্থী মনোভাবের প্রসঙ্গ তোলেন না, যেটা পশ্চিম ইউরোপের রবীন্দ্র-সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি যখন রবীন্দ্রনাথের গল্প বা নাটকের আলোচনা করা হয় তখনও রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সোভিয়েত রবীন্দ্র-সাহিত্য গবেষকদের কয়েকটি রচনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন—'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ', 'রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি ও তাঁর শিল্পপদ্ধতি', 'ভারতীয় সাহিত্যে নতুন ধারা ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। ডঃ ভ্লাদিমির নানকিন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ দিক্‌নির্দেশক সূত্র তুলে ধরেছেন—'রবীন্দ্রনাথের বাণী তাঁর স্বদেশের লৌকিক জীবন থেকে উৎসারিত হয়েও বিশ্ববাণী।..... সে বাণী হ'ল নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তির বাণী। যে মুক্তি যেমন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম ও উত্থানে, তেমনি তা যা-কিছু মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, বিকৃত ভাবাদর্শ, সামাজিক শোষণ ও ব্যক্তিমানবের অবমাননার বিরুদ্ধে জাগরণের মুক্তির বাণী।' বিশিষ্ট সোভিয়েত কলাসমালোচিকা শ্রীমতী ই. ব্রোশালিনা তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্যকলায় মানবতাবাদ' প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন সেই উক্তিতে সাহিত্য সমালোচনায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। উক্তিটি হল—'মানুষের অন্তর্জগতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমাজের ও মানবচরিত্রের বৈপরীত্য এবং সেই সঙ্গে মানুষের মৌলিক শুভ মানবতাবোধকে উন্মুক্ত করে ধরেছে।' রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য কেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে সম্ভবত আলোচ্য উক্তিটি প্রযুক্ত হতে পারে—কেননা এ দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যথার্থ সমালোচনা।





রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে

সংকলক ঃ-প্রভাস দাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রতি বছর বাংলা ভাষায় সাহিত্য বিষয়ক রচনা, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাংলা ব্যতীত অন্য কো ন ভাষায় রচিত পুস্তক এই তিনটি বিভাগের প্রতিটির জন্য একটি করে "রবীন্দ্র পুরস্কার" প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতিটি পুরস্কারের আর্থিক সম্মানমূল্য ১৫,০০০ টাকা। বিগত পাঁচটি ক্যালেণ্ডার বছরের মধ্যে প্রকাশিত বই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়। পাণ্ডুলিপির আকারে প্রকাশিত কোন বই, শিক্ষাগত ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণামূলক রচনা, দু'জনের বেশি লেখকের লেখা কোন বই, গত দশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সাহিত্য অকাদেমি অথবা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত লেখকের কোনো বই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয় কোনো গ্রন্থকে। সেই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে গ্রন্থকারকে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়।

"রবীন্দ্র পুরস্কার" প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯৫০ সালে, তৎকালীন পুরস্কার প্রদান পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে সংশোধন করা হয়। পুরস্কারের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত এবং গণতন্ত্রসম্মত করার উদ্দেশ্যেই পূর্বের নিয়মাবলীর সংশোধন করে বর্তমানে সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

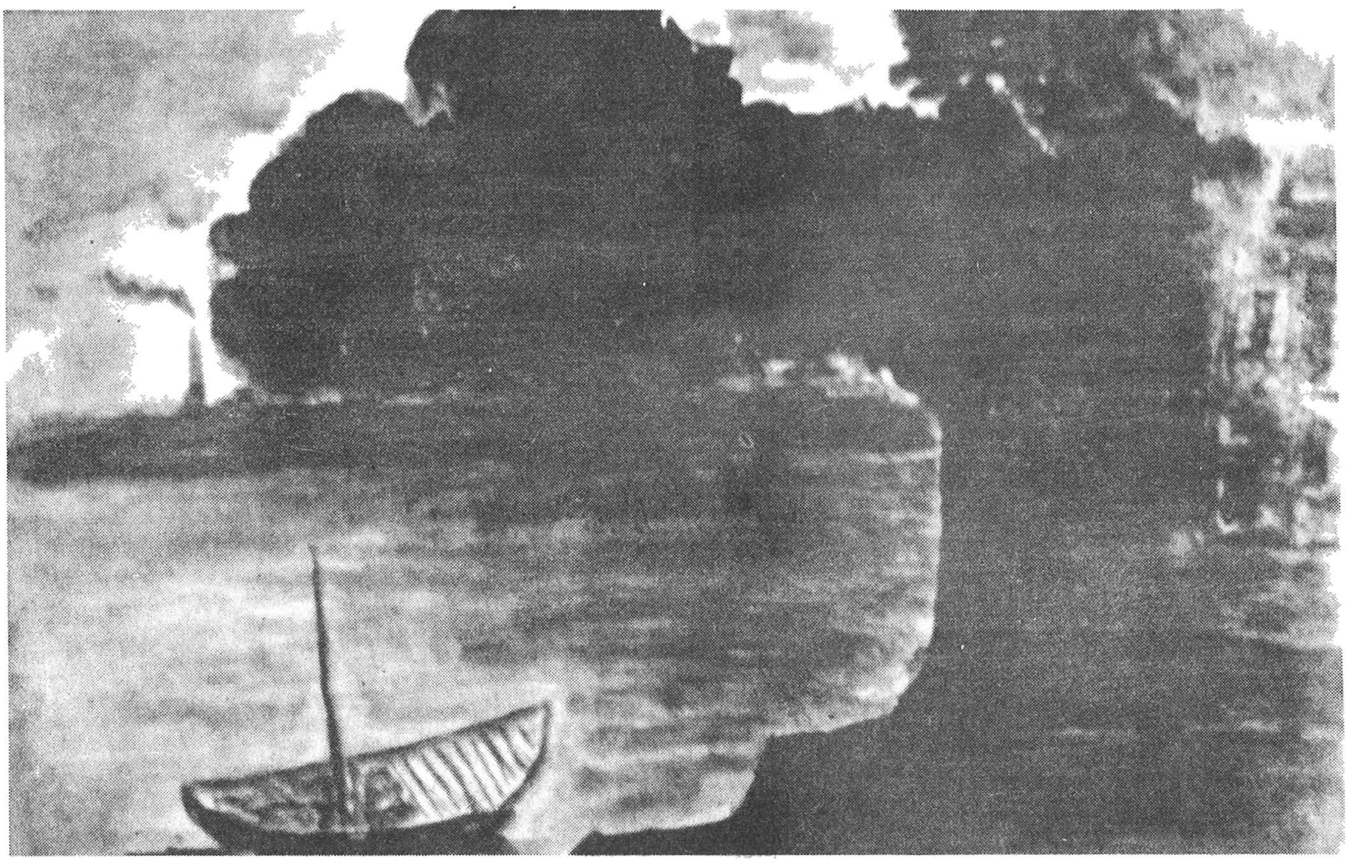
বর্তমান সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে এই রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থাৎ কলিকাতা, রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, বিশ্বভারতী, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং অন্য ভাষা এই তিনটি বিভাগের জন্য এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগের জন্য প্রাথমিক নির্বাচক হিসেবে প্রতি বিভাগের জন্য সর্বাধিক দশ জন করে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির নাম চাওয়া হয়। বিগত বছরগুলিতে যাঁরা রবীন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর এবং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য সাহিত্য অকাদেমি এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা আপনা থেকেই প্রাথমিক নির্বাচক হিসেবে গণ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সুপারিশকৃত ব্যক্তিগণ এবং উপরে উক্ত পুরস্কার বিজয়ীগণকে নিয়ে প্রতি বিভাগের জন্য একটি করে প্রাথমিক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। ঐ প্রাথমিক নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য এমন একটি করে বইয়ের নাম সুপারিশ করার অনুরোধ করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য অকাদেমি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (কেবল মাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগের জন্য) এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলা গ্রন্থাগারগুলির কাছেও অনুরূপভাবে বইয়ের নাম সুপারিশের অনুরোধ করা হয়। এছাড়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য পুস্তক আহ্বান করা হয়।

চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিগণকে নিয়ে তিনটি বিভাগের প্রতি বিভাগের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সাত অথবা নয়জন সদস্যের একটি করে বিচারকমণ্ডলী বা পুরস্কার নির্ধারণ কমিটি সরকার কর্তৃক গঠন করা হয়। সুপারিশকৃত কোন বইয়ের লেখক ঐ পুরস্কার নির্ধারণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। সুপারিশকৃত এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গৃহীত সকল বই সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের মতামতের জন্য তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত দিনে প্রতি বিভাগের পুরস্কার নির্ধারণ কমিটির সদস্যগণ একটি যুক্ত আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে তাঁদের কাছে প্রেরিত বইগুলি থেকে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বই নির্বাচন করেন। পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বই নির্বাচনে যদি তাঁরা কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারেন তবে ঐ কমিটির সর্বাধিক সদস্যের সুপারিশকৃত বইটি পুরস্কার পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত বইটির জন্য সেই বইয়ের লেখককে সেই বছরের "রবীন্দ্র পুরস্কার" প্রদান করা হয়।

"রবীন্দ্র পুরস্কার" বিজয়ীদের তালিকা

সাল	বইয়ের নাম	লেখক/লেখিকার নাম
১৯৫০	জাগরী	সতীনাথ ভাদুড়ী
	বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
১৯৫১	ইছামতী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	Ancient Indian life	আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
১৯৫২	সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বাংলা সাময়িকপত্র ইত্যাদি	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	ভারতের বনৌষধি	ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ
১৯৫৩	বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা)	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৯৫৪	পূর্ণকুম্ভ	শ্রীমতী রানী চন্দ
১৯৫৫	আরোগ্য নিকেতন	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প	রাজশেখর বসু
১৯৫৬	বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	সমরেন্দ্রনাথ সেন
১৯৫৭	রবীন্দ্র জীবনী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
	The History and Culture of the Indian people	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
১৯৫৮	সাগর থেকে ফেরা	প্রেমেন্দ্র মিত্র
	পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি	বিনয় ঘোষ
	Latterature Mediavalie & Moderne Del sub Continete Indiana (লাতিন ভাষা)	ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৯৫৯	বাংলার বাউল ও বাউল গান	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
	Origin of the National Education Movement	হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়
১৯৬০	কেরী সাহেবের মুন্সী	প্রমথনাথ বিশী
	গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন	রাধাগোবিন্দ নাথ
১৯৬১	মহাভারত (অনুবাদ ও টীকা)	মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
	Historical Development of Indian Music	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৯৬২	হাটেবাজারে	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
	পঞ্চোপাসনা	জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৩	রম্যাণী বীক্ষ্য	সুবোধকুমার চক্রবর্তী
	স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী	ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৪	কড়ি দিয়ে কিনলাম	বিমল মিত্র
	ভারতের সাধক	প্রমথনাথ ভট্টাচার্য
	আকাশ ও পৃথিবী	ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১৯৬৫	পৌষফাগুনের পালা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
	প্রাগৈতিহাসিক মানুষ	শচীন্দ্রনাথ বসু
	ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস	ডঃ সুকুমার সেন
১৯৬৬	প্রথম প্রতিশ্রুতি	শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী
	বেদ মীমাংসা	অনির্বাণ
	বাঙ্গালী হিন্দুয়োকা উর্দু খিদমৎ	শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য
১৯৬৭	তুঙ্গভদ্রার তীরে	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
	রাজস্থানের কাহিনী	কালিকারঞ্জন কানুনগো
	Tagore on Literature and Asthetics	ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী
১৯৬৮	পূর্ণাহুতি	কালিদাস রায়
	হিমালয়	সুকুমার বসু
	The Rajbansi of North Bengal	ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল
১৯৬৯	আর কোনখানে	শ্রীমতী লীলা মজুমদার
	অপরূপা অজন্তা	নারায়ণ সান্যাল
	বাঙ্গলার লৌকিক দেবতা	গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
১৯৭০	রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা	আবু সঈদ আইয়ুব
	মানব কল্যাণে রসায়ন	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
	Bankimchandra— His Life and Creations (রুশ ভাষায়)	শ্রীমতী ভেরা আলেকনেন্দ্রাভনা নোভিকভা
	ভারতবর্ষের অভিবাসীর পরিচয়	ননীমাধব চৌধুরী
১৯৭১	এখনই	রমাপদ চৌধুরী
	মহাকাশ পরিচয়	জিতেন্দ্রকুমার গুহ
	A study of Women in Bengal	শঙ্কর সেনগুপ্ত

সাল	বইয়ের নাম	লেখক/লেখিকার নাম
১৯৭২	এবার প্রিয়ংবদা	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
	করুণাসাগর বিদ্যাসাগর	ইন্দ্রমিত্র
	সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ	পরেশচন্দ্র মজুমদার
১৯৭৩	সোনা রূপা নয়	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী
	অপরাধ জগতের ভাষা	ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
	রাঢ়ের সংস্কৃতি ধর্মঠাকুর	ডঃ অমলেন্দু মিত্র
	লেট মেডিয়েভ্যাল টেমপ্‌ল অফ বেঙ্গল	ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন
১৯৭৪	স্বাগত বিদায়	বুদ্ধদেব বসু
	প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
	পরমাণু জিজ্ঞাসা	শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
	Music of Eastern India	সুকুমার রায়
	বেঙ্গলিশ মেরখেন আউস ইন্ডিয়েন উন্ড বাংলাদেশ (ভারত ও বাংলাদেশের লোকগল্প জার্মান ভাষায়)	ডঃ হাইন্‌ৎস মোদে ও অরুণকুমার রায়
১৯৭৫	উত্তরায়ণ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
	বাংলার কীটপতঙ্গ	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৯৭৬	নাট্যকার	সতীকান্ত গুহ
	প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান	অরূপরতন ভট্টাচার্য
	Shadow of the cross—Christianity and Hinduism in Colonial Situation,	ডঃ শিশিরকুমার দাস
	A Bengal Jaminder : Jai Krishna Mukherjee of Uttarpara and his times	ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়



সাল	বইয়ের নাম	লেখক/লেখিকার নাম
১৯৭৮	ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ	নেপাল মজুমদার
	*	*
	History of Bengali Literature	ডুসান জাবিটেল
১৯৭৯	শুধু রাতের শব্দ নয়	অরুণ মিত্র
	চিরঞ্জীব বনৌষধি	ডঃ শিবকালী ভট্টাচার্য
	Positivism in Bengali Literature	শ্রীমতী জি এইচ ফরবেশ
১৯৮০	রূপনারায়ণের কূলে	গোপাল হালদার
	পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য ?	ডঃ তারকমোহন দাস
	*	*
১৯৮১	চিত্রকর	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
	*	*
	On Bengali Renaissance	সুশোভন সরকার
১৯৮২	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	ইলেকট্রনিক্স	ডঃ অনাদিনাথ দাঁ
	Dwarakanath Tagore A forgotten pioneer—A life	কৃষ্ণ কৃপালনী
১৯৮৩	রাম গেছে বনবাসে	দিনেশ দাস
	ভূ-তাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা	সঙ্কর্ষণ রায়
	*	*
১৯৮৪	বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
	রামমোহন সমীক্ষা	দিলীপকুমার বিশ্বাস
	মেডিক্যাল অভিধান	অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
	The Story of the Calcutta Theatre (1753-1940)	সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৮৫	সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ	সুখময় ভট্টাচার্য
	ক্যানসার	ডঃ অমিয় কুমার হাটি
	Marxist Cultural Movement in India Vol. II	ডঃ সুধী প্রধান
১৯৮৬	অপরাজিতা রচনাবলী	শ্রীমতী রাধারানী দেবী
	রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ	ডঃ শচীন্দ্রনাথ সাহানা
	Nazrul Ensoru Manidan (Tamil)	S. Krishnamurty
১৯৮৭	ব্রহ্মা ও পুঁতির মউরি	রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী
	সুখাসনে সুখাহার	রমেন মজুমদার
	The Artist in Chains	ডঃ শিশিরকুমার দাস
১৯৮৮	ধ্বনি থেকে কবিতা	শ্রীমতী সন্‌জিদা খাতুন
	কৈশোর ও তার সমস্যা	ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
	Calcutta—the profile of a City	ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়
১৯৮৯	ধূম লেগেছে হৃদ্‌কমলে	শঙ্খ ঘোষ
	এক গুচ্ছ কাব্যনাট্য	রাম বসু
	সুরা শরীর সর্বনাশা	ভবানীপ্রসাদ সাহু
	Europe Reconsidered	তপন রায়চৌধুরী
১৯৯০	নির্বাচিত কবিতা	কিরণশংকর সেনগুপ্ত
	কন্যা, জায়া ও জননী	ডাঃ অরুণকুমার মিত্র
	*	*

* কোন পুরস্কার দেওয়া হয়নি

রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব
কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ডাঃ অরুণকুমার মিত্র

বর্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন—সাহিত্য বিভাগে প্রবীণ কবি ও সু-সাহিত্যিক শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং বিজ্ঞান বিভাগে প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীঅরুণকুমার মিত্র। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর নির্বাচিত কবিতা সংকলনের জন্য এবং ডাঃ অরুণকুমার মিত্র এই পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অনন্য উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত গ্রন্থ 'কন্যা জায়া জননীর' লেখক হিসাবে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে—এ বছর বিদেশী ভাষায় বা প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত কোন বই এর লেখককে এই সম্মান প্রদান করা সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপকদের প্রতিবছর রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্র পুরস্কারের সাম্মানিক অর্থ ১৫,০০০ টাকা এবং সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে।

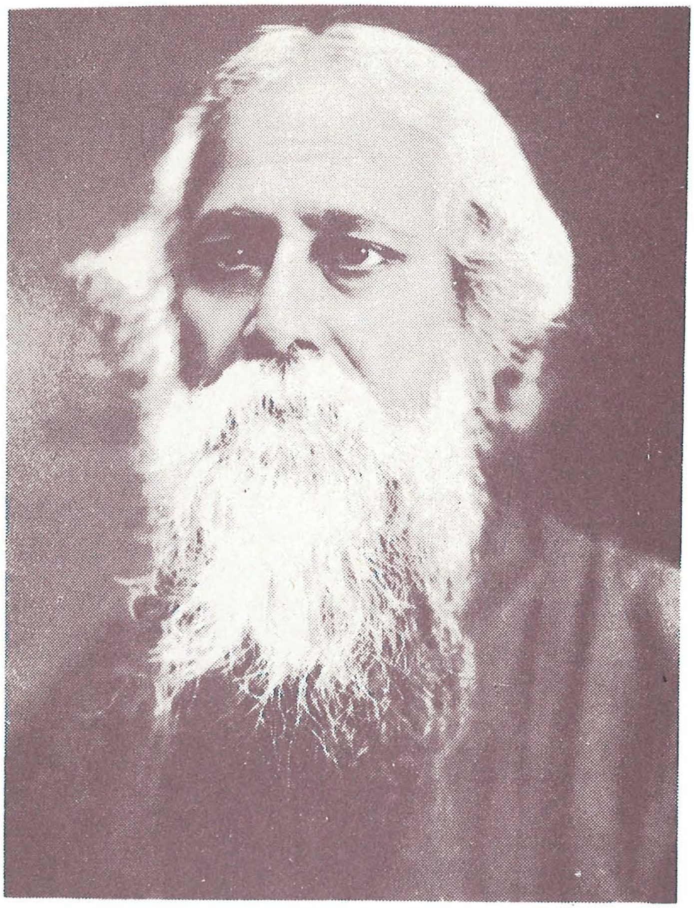
কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ—১৯১৮ সালে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। পিতা ছিলেন সু-চিকিৎসক। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা ঢাকাতেই। প্রথম প্রকাশিত মুদ্রিত কবিতা ১৯৩৬ সালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কবিতায়—'শত্রু' আর 'দৃষ্টান্ত'। ঐ বছরেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তৃতীয় কবিতা 'অধ্যায়'। তরুণ বয়সেই এইভাবে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকার লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ। পত্রিকা দু'টির নিয়মিত লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মনীষ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি লাভ। ১৯৪৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আয়ুব সম্পাদিত আধুনিক যে 'বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় সেখানে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনেও কবিতাটি স্থান পেয়েছে। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্ব থেকেই এভাবে নানা পত্র-পত্রিকার সংগঠক লেখক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কেও তার সুগভীর জ্ঞান রয়েছে। সোমেন সুহৃদ মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এই কবির মানস পটভূমি তৈরীতে যেসব প্রগতিশীল সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন—তাদের মধ্যে উল্লেখ্য রণেশ দাশগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী ও সোমেন চন্দের নাম করা যেতে পারে। ১৯৩৯ সালে সোমেন চন্দের অনুরোধেই তিনি প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য হন। শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার পরিপোষক 'ক্রান্তি' পত্রিকার একজন সংগঠক ও লেখক ছিলেন। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ও চাকুরীর পাশাপাশি কবিতা লেখার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় নানা ধরনের লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও সক্রিয়ভাবে লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে 'সাহিত্য চিন্তা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত আছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যেসব উজ্জ্বল মনীষী তাকে সাহিত্য-কর্মে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে-গর্কি, র‍্যালফ ফক্স, আদ্রমাল্টো ফডওয়েল, কর্ণফোর্ড, বেশট্ প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ্য। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থঃ স্বপ্ন কামনা (১৯৩৮), স্বর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৩), দিনযাপন (১৯৬২), এই এক সময় (১৯৭২), বৃষ্টি এলে (১৯৭৩), রুক্ষ দিনের কবিতা (১৯৮৩), মানুষ জানে (১৯৮৫), সমালোচনা গ্রন্থঃ সময় ও সাহিত্য (১৯৫১), মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল (১৯৬৪), কবিতার রূপ ও রূপান্তর (১৯৮২)। সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে—১৯৬৯), রজনীকান্ত গুপ্ত; ব্যক্তিত্ব ও মনীষা (১৯৭৬), সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প (১৯৮৩)।

ডাঃ অরুন কুমার মিত্র ঃ—

ডাঃ অরুন কুমার মিত্র প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, সুচিকিৎসক এবং অধ্যাপক। ছাত্রজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ১৯৪৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের অধিক সময় ধরে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, প্রসূতি পরিচর্যা, শল্যকর্ম এবং অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাঃ মিত্র ডি জি ও এবং মাষ্টার অব অবস্ট্রেটিকস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। পরে ইংলণ্ড থেকে এফ আর সি ও জি এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গাইনোকোলজিক্যাল ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে পি এইচ ডি লাভ করেন। ডাঃ অরুণ কুমার মিত্রের 'কন্যা জায়র ও জননী' সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফসল। যুগ ও জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে আমাদের সমাজে মেয়েদের যে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রয়োজন কিন্তু তার অভাব থেকেই যাচ্ছে—এই অভাব দুর করার জন্যই ডাঃ মিত্রের এই প্রয়াস। এই বই-এ ডাঃ অরুণ কুমার মিত্র জন্ম থেকে নারী জীবনের বিভিন্ন বিভিন্ন বিবর্তন কিভাবে ঘটে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। শৈশব থেকে শারীরিক লক্ষণের ভিন্নতা, শৈশবের পর বয়ঃসন্ধিতে পদার্পন, যৌবনপ্রাপ্ত, বিবাহ, মাতৃত্ব, সন্তান লাভ, শিশু পরিচর্যা ও পরিপালন, পৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া, ঋতু-নিবৃত্তি ও প্রজনন পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ইত্যাদি পর্ব নিয়ে গুরুত্ব পীর্ণ আলোচনা করেছেন।

প্রতিবেদক মুকুলেশ বিশ্বাস





"যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো ।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ/ ১৫ /২০/B



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী করপোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।